شرح (مسائل الجاهلية لمحمد بن عبد الوهاب)

মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব (রহিমাহুল্লাহ) রচিত

‘মাসাইলুল জাহিলিয়্যাহ’

এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ

تأليف الشيخ الدكتور العلامة/صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان

লেখক: শাইখ ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান

ترجمة:مظفر بن مقسط

অনুবাদ: মোজাফফার বিন মুকসেদ

مُراجعة :عبد العليم بن كوثر

সম্পাদনা: আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

الناشر: مكتبة السنة

প্রকাশনায় : মাকতাবাতুস সুন্নাহ

الناشر: مكتبة السنة

كاتاخالي، راجشاهي، بنغلاديش.

Mobile : +8801912-005121

প্রকাশনায়: মাকতাবাতুস সুন্নাহ
কাটাখালী (দেওয়ানপাড়া মাদ্রাসা মোড়),
রাজশাহী, বাংলাদেশ।
যোগাযোগ: ০১৯১২-০০৫১২১

প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারী ২০১৮ ঈসায়ী

বিনিময় মূল্য: ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

○ ভূমিকা... ...০৯

○ অনুবাদকের কথা.. ১০

○ জাহিলী বিষয়সমূহের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ ও মারাত্মক বিষয়......১১

○ মাসাইলুল জাহিলিয়্যাহ দ্বারা উদ্দেশ্য......................................১২

○ কিতাবী দ্বারা উদ্দেশ্য...১২

○ উম্মি বা নিরক্ষর দ্বারা উদ্দেশ্য..১৩

○ জাহিলীয়্যাহ দ্বারা উদ্দেশ্য..১৪

১. আওলিয়া ও নেককারদের নিকট দু‘আ করা................................২৩

কাফিরদের সাথে আমাদের আবশ্যকীয় নীতি ৩৮

২. জাহিল সম্প্রদায় তাদের ইবাদত ও দীনের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ নয় ৪০

○ ফিক্বহী মাস‘আলায় মতানৈক্য অথবা বিরোধপূর্ণ বিষয়ে আমাদের করণীয়। কারণ ফিক্বহী বিষয়ে মতানৈক্য বর্তমানেও চালু আছে, এটা কি নিকৃষ্ট হিসাবে গণ্য?.. ৫৩

৩. শাসকের বিরোধিতাকে মর্যাদাকর গণ্য করা এবং তার আনুগত্যকে লাঞ্ছনাকর মনে করা..৫৯

○ কেউ ফাসিক কিন্তু শক্তিশালী। আর কেউ সৎ তবে দুর্বল। উভয়ের মধ্যে কে নের্তৃত্বের উপযুক্ত?..৬১

○ শাসক ও নেতাদের বিরোধিতাকারীদের অবস্থা যা ইতিহাসের বর্ণনায় পাওয়া যায়?...৬২

○ শাসকের আনুগত্যের ব্যাপারে জাহিল এবং মুসলিমদের মাঝে পার্থক্য...৬৩

৪. তাক্বলীদ (অন্ধ অনুকরণ) ক্ষতিকর...৬৭

৫. দলীলের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে অধিকাংশের নিয়ম-নীতি-আমলকে দলীল হিসাবে উপস্থাপন করা...৭৩

৬. দলীলের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে পূর্ববর্তীদের নিয়ম-নীতি-আমলকে দলীল হিসাবে পেশ করা...৭৬
৭. শক্তিশালী গোষ্ঠীর রীতিকে হক্ব মনে করে তা দলীল হিসাবে গ্রহণ করা...৮০
৮. দুর্বলরা যে নীতির উপর রয়েছে, সেটাকে হক্ব মনে না করা ৮৮
৯. ফাসিক আলিম ও মুর্খ ইবাদতকারীদের অনুসরণ করা....................৯১
১০. দীনদারদেরকে অহেতুক বুঝের স্বল্পতা এবং মুখস্থ না করার দোষে দোষী করা ৯৫
১১-১২. বাতিল ক্বিয়াসের উপর নির্ভর করা ও ছহীহ ক্বিয়াসকে প্রত্যাখ্যান করা...৯৬
১৩. বিদ্বান ও নেক লোকদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা.......................১০১
১৪. হক্ব অস্বীকার করা এবং বাতিল সাব্যস্ত করা............................১০৫
১৫. মিথ্যা অজুহাত পেশ করে হক্ব গ্রহণ না করা............................১০৭
১৬. ইয়াহূদী কর্তৃক তাওরাতের পরিবর্তে যাদুর পুস্তক গ্রহণ করা..........১১০
১৭. নাবী-রসূলগণের দিকে বাতিল সম্বন্ধিত করা............................১১৩
১৮. নাবী-রসূলগণের বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও তাদের দিকে নিজেদেরকে সম্বন্ধিত করা...১১৫
১৯. নেককারদের সাথে সম্বন্ধকারীদের কর্মকাণ্ড দ্বারা নেককারদের দোষারোপ করা...১১৬
২০. যাদুকর্ম ও ভাগ্য গণনাকে অলী-আওলিয়ার কারামাত গণ্য করে তা বিশ্বাস করা...১১৮
২১. শিষ দেয়া ও করতালির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করা....১২০
২২. দীনকে খেল-তামাশা হিসাবে গ্রহণ করা................................১২১
২৩. দুনিয়ার মাধ্যমে ধোঁকায় পড়া..১২২
২৪. যখন দুর্বলরা হক্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, তখন জাহিল কর্তৃক হক্ব প্রত্যাখ্যান করা...১২৫
২৫. কোন বিষয়ে দুর্বলদের অগ্রগামিতার কারণে সেটাকে বাতিল বলে প্রমাণ করা...১২৬

২৬. কু-প্রবৃত্তির অনুসরণের কারণে আসমানী কিতাবের প্রমাণাদি জানার পরও তা বিকৃত করা..১২৮
২৭. বাতিল কিতাবাদি রচনা করে সেগুলো আল্লাহর দিকে সম্বন্ধিত করা..১৩১
২৮. অপরের নিকট বিদ্যমান হক্ব বর্জন করা...............................১৩২
২৯. তারা (ইয়াহূদীরা) যাদের অনুসরণ করে বলে ধারণা করে, তাদের বক্তব্য অনুযায়ীও আমল করে না...১৩৫
৩০. বিভক্ত হওয়া ও ঐক্য বিনষ্ট করা..১৩৭
৩১. সঠিক দীনের প্রতি জাহিলদের শত্রুতা আর বাতিল দীনের প্রতি তাদের ভালোবাসা...১৩৯
৩২. হক্ব অস্বীকার করা যখন তা অপ্রিয় কারো কাছে থাকে...............১৪৩
৩৩. তাদের স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতির মধ্যে বৈপরীত্য.........................১৪৬
৩৪. প্রত্যেক দল অন্যদের ব্যতিরেকে শুধু নিজেদেরকে হক্ব মনে করে...১৪৮
৩৫. হারাম কাজের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করা...........১৫১
৩৬. হালালকে হারাম ও হারামকে হালালে পরিণত করার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশা করা...১৫৫
৩৭. আল্লাহ তা‘আলা ব্যতীত ধর্মগুরু ও সংসারবিরাগীদেরকে রব হিসাবে গ্রহণ করা...১৫৭
৩৮. আল্লাহ তা‘আলার নাম ও গুণাবলী অবিশ্বাস করা.....................১৫৯
৩৯. আল্লাহ তা‘আলার নামসমূহ অবিশ্বাস করা.............................১৬২
৪০. মহান পবিত্র রবকে অস্বীকার করা.......................................১৬৬
৪১. আল্লাহকে অপূর্ণাঙ্গ ও ত্রুটিপূর্ণ গুণে গুণান্বিত করা....................১৬৮
৪২. মালিকানায় শিরক...১৭০
৪৩. আল্লাহ তা‘আলার তাক্বদীরকে অস্বীকার করা.........................১৭১
৪৪. আল্লাহ তা‘আলা ভাগ্যে কুফরী নির্ধারণ করেছেন বলে অজুহাত পেশ করা..১৭৭
৪৫. আল্লাহ তা‘আলার শরী‘আত ও তাক্বদীরের মাঝে বৈপরীত্যের অভিযোগ করা..১৭৯

৪৬. ঘটমান দুর্ঘটনাকে সময় ও যুগের দিকে সম্বন্ধিত করা এবং তাকে গালি দেয়া...১৮১
৪৭. আল্লাহ তা'আলার নি'আমত অস্বীকার করা..........................১৮৩
৪৮. আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহ অস্বীকার করা.........................১৮৫
৪৯. আল্লাহর কতিপয় আয়াতকে অস্বীকার করা।..........................১৮৭
৫০. রসূলগণের উপর কিতাব নাযিল হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করা.....১৮৯
৫১. কুরআনকে মানুষের কথা মনে করা....................................১৯০
৫২. আল্লাহ তা'আলার কর্মের প্রজ্ঞা অস্বীকার করা.........................১৯২
৫৩. আল্লাহর শরী'আত বাতিল করণে ফন্দি-ফিকির ও ষড়যন্ত্র করা.....১৯৫
৫৪. হক্ব প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে হক্বের স্বীকৃতি প্রদান.....................১৯৯
৫৫. তারা যে বাতিলের উপর রয়েছে, তার প্রতি অন্ধভক্তি................২০০
৫৬. তাওহীদকে শিরক গণ্য করা...২০২
৫৭-৫৮. আল্লাহর কিতাবের ভাষা বিকৃতি ও পরিবর্তন করা.............২০৪
৫৯. হক্বপন্থীদেরকে মন্দ উপাধি দেয়া.....................................২০৬
৬০-৬১. আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করা এবং হক্বকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা...২০৭
৬২. হক্বপন্থীদের বিরুদ্ধে শাসক শ্রেণীকে ক্ষেপিয়ে তোলা................২১০
৬৩-৬৭. নির্দোষ হক্বপন্থীদেরকে অপবাদ দেয়া...........................২১৩
৬৮. নিজেদেরকে এমন বিষয়ে প্রশংসা করা, যা তাদের মাঝে নেই......২১৯
৬৯-৭০. আল্লাহর বিধিবদ্ধ ইবাদত কম-বেশি করা........................২২২
৭১. আল্লাহভীতির দোহাই দিয়ে আল্লাহ্‌র ওয়াজিব বিষয়গুলো বর্জন করা...২২৪
৭২-৭৩. পবিত্র রিযিক্ব ও সাজ-সজ্জা বর্জন করে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে চাওয়া..২২৬
৭৪. মানুষকে ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করা..................................২২৯
৭৫. জেনে-বুঝে কুফরীর দিকে মানুষকে দা'ওয়াত দেয়া..................২৩১
৭৬. শিরক প্রতিষ্ঠিত করতে ও হক্ব দমনে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকা....২৩৩
৭৭. আদর্শহীন ব্যক্তির অনুসরণ করা..২৩৫

৭৮. আল্লাহর ভালোবাসায় বৈপরীত্য সৃষ্টি করা ২৩৯
৭৯. মিথ্যা আকাঙ্খার উপর নির্ভর করা..২৪২
৮০. ব্যক্তিকেন্দ্রিক বাড়াবাড়ি ২৪৫
৮১. নাবীগণের নিদর্শন নিয়ে বাড়িবাড়ি করা.................................২৪৮
৮২. শিরকের নানা মাধ্যম অবলম্বন করা.....................................২৫১
৮৩. কবরকে আঁকড়ে থাকা..২৫৩
৮৪. কবরের কাছে যবেহের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে চাওয়া...২৫৬
৮৫-৮৬. সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের নিদর্শন সংরক্ষণ করা......................২৫৭
৮৭-৯০. এ উম্মতের মধ্যে বিদ্যমান কতিপয় জাহিলী স্বভাব.............২৫৯
৯১. সীমালঙ্ঘন করা...২৬৩
৯২. সত্য বা মিথ্যা নিয়ে অহংকার করা.......................................২৬৫
৯৩. ঘৃণ্য গোঁড়ামি ও অন্ধভক্তি দেখানো.......................................২৬৭
৯৪. অন্যের অপরাধে নিরপরাধকে শাস্তি দেয়া.............................২৭০
৯৫. কাউকে অন্যের দোষ-ক্রুটি তুলে ধরে গালমন্দ করা..................২৭২
৯৬. ভালকাজ করে অহংকার করা..২৭৩
৯৭. নেকলোকদের বিরোধিতা করা সত্ত্বেও তাদের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করে অহংকার করা...২৭৫
৯৮. নিজেদের পেশা নিয়ে অন্যদের উপর গর্ব-অহংকার করা.............২৭৮
৯৯. দুনিয়া নিয়েই আনন্দে থাকা...২৭৯
১০০. আল্লাহর বিধান সংশোধন করা ও কর্তৃত্ব লাভ করতে চাওয়া.......২৮১
১০১. অভাবগ্রস্তদেরকে অবজ্ঞা করা ২৮৩
১০২. নিয়্যাত ও উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে ঈমানদারকে অপবাদ দেয়া..... ২৮৫
১০৩-১০৮. ঈমানের মূলনীতিসমূহ অস্বীকার করা ২৮৭
১০৯. রসূলগণ যা নিয়ে এসেছেন, তার কিছু অংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা...২৮৮
১১০. হক্বপন্থী দাঈ (আল্লাহর পথে আহ্বানকারী) এর সাথে শত্রুতা করা ২৯১

১১১. বাতিল-মিথ্যা বিশ্বাস করা ২৯২
১১২. ঈমানের উপর কুফরীকে প্রাধান্য দেওয়া ২৯৫
১১৩. বাতিল গ্রহণের উদ্দেশ্যে মিথ্যার সাথে সত্যের মিশ্রণ ঘটানো......২৯৫
১১৪. জেনে-বুঝে হক্ব গোপন করা..২৯৬
১১৫. জ্ঞান ছাড়াই আল্লাহর বিরুদ্ধে কথা বলা ৩০০
১১৬. বক্তব্য একটি অপরটির বিরোধী ৩০৩
১১৭. আল্লাহর নাযিলকৃত আংশিক বিধানের প্রতি ঈমান আনা ৩০৫
১১৮. কতিপয় রসূলের প্রতি ঈমান আনা এবং কতিপয়ের প্রতি ঈমান না আনা..৩০৭
১১৯. অজানা বিষয় নিয়ে বিতর্ক করা ৩১০
১২০. অন্যদের অনুসরণে বৈপরীত্য সৃষ্টি করা ৩১১
১২১. আল্লাহর রাস্তায় বাধা দান ৩১৩
১২২. কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করা.. ....৩১৫
১২৩-১২৮: কুসংস্কারের উপর নির্ভর করা...................................৩১৬
○ মাকতাবাতুস সুন্নাহ প্রকাশিত বই সমূহ................................৩১৯

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার জন্য। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার পরিবারবর্গ ও ছাহাবীগণের উপর।

আমি মাসজিদে কতিপয় বিষয়ের উপর পাঠদান করেছিলাম, সেগুলোর মধ্যে শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব রহিমাহুল্লাহ বিরচিত 'মাসাইলুল জাহিলিয়্যাহ'ও ছিল। কয়েকজন ছাত্র ঐ পাঠগুলো ক্যাসেটে রেকর্ড করে। আরো কয়েকজন ছাত্র রেকর্ড থেকে পাঠগুলো কাগজে লিপিবদ্ধ করে আমার নিকট পেশ করে। আমি তা পড়ার পর কিছু ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও তা মুদ্রণ ও প্রকাশনার পরামর্শ দেই, যাতে এর মাধ্যমে ব্যাপক উপকার লাভ হয়। কারণ কথায় বলে, নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল। পাঠকের নিকট আমি আশা করবো, ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে সংশোধনের জন্য তারা আমাকে সে বিষয়ে অবহিত করবেন। আল্লাহ তা'আলা সকলকে উপকারী জ্ঞানার্জন ও ভাল আমল করার তাওফীক্ব দান করুন। আল্লাহ আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর ছ্বলাত ও সালাম বর্ষণ করুন।

লেখক: ড.ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল-ফাওযান

অনুবাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি সারা বিশ্বের প্রতিপালক। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক নাবী মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তার পরিবারবর্গ ও ছাহাবীগণের উপর। আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে মনোনিত জীবন-বিধান হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। ইসলামের প্রতিটি বিধান ও মূলনীতি দলীলসহ স্পষ্ট। তাই এখানে কুসংস্কার, জাহিলিয়্যাত-মূর্খতা, শিরক-বিদ'আত ও মস্তিস্ক প্রসূত রীতি-নীতির কোন স্থান নেই। ইসলাম আর্বিভাবের পূর্বাপর কিছু জাহিলিয়্যাত এখনও মানুষের মাঝে বিদ্যমান। ফলতঃ ইসলামের বিধান দলীলসহ না বুঝার কারণে মানুষ ভ্রান্ত মতবাদ লিপ্ত রয়েছে। তাই প্রকৃত ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ এবং তাদের অবস্থার সংশোধন সম্ভব নয়। এহেন অবস্থায় জাহিলীয়্যাত-মূর্খতা সম্পর্কে বিভ্রান্ত সমাজের অবগতির জন্য ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আব্দুল্লাহ আল ফাওযান বিরচিত **শারহু মাসাইলিল জাহিলিয়্যাহ** নামক গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ করি। এতে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো সাবলীল ও প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছি। এসত্ত্বেও পাঠক সমাজের নিকট ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে সংশোধনের লক্ষ্যে তা অবগতির জন্য অনুরোধ রইল। সর্বপরি খড়-কুটা তুল্য সামান্য এ খেদমতের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করছি।

বিনীত

মোজাফ্‌ফার বিন মুকসেদ

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম করুনাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার জন্য। নাবী মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দরূদ, সালাম ও বরকত বর্ষিত হোক, তার পরিবারবর্গ ও ছাহাবীগণের উপরও শান্তি বর্ষিত হোক।

শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব রহিমাহুল্লাহ তার 'মাসাইলুল জাহিলিয়্যাহ' নামীয় পুস্তিকার ভূমিকায় বলেন, 'এ মাস'আলাগুলোতে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাহিল (অজ্ঞ) আহলে কিতাব ও উম্মি (নিরক্ষর) লোকদের বিরোধিতা করেছেন। সুতরাং এসব বিষয়ে কোন মুসলিম অজ্ঞ থাকতে পারে না।

মন্দের বিপরীত বিষয় দ্বারা ভালোটা প্রকাশ পায় এবং বিপরীতমুখী বিষয় দ্বারা বিভিন্ন বিষয় স্পষ্ট হয়।

জাহিলী বিষয়সমূহের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ ও মারাত্মক বিষয়

সবচেয়ে ভয়াবহ ও মারাত্মক জাহিলিয়্যাত হচ্ছে, অন্তরে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর নাযিলকৃত ওহীর প্রতি বিশ্বাস না রাখা। এর সাথে যদি জাহিলরা যে নীতি অবলম্বন করতো, তা যুক্ত হয়, তাহলে ক্ষতি পূর্ণতা লাভ করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [سورة العنكبوت: 52]

'যারা বাতিলে বিশ্বাস করে ও আল্লাহকে অস্বীকার করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত' *(সূরা আল আনকাবূত ২৯:৫২)।*

....

ব্যাখ্যা: এটি মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব রহিমাহুল্লাহ এর একটি গবেষণা কর্ম, যার নাম মাসাইলুল জাহিলিয়্যাহ, যে ব্যাপারে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাহিলদের বিরোধিতা করেছেন। মাসাইলুল জাহিলিয়্যাহ গ্রন্থে ১২৮ (একশত আটাশ) টি বিষয় উল্লেখ আছে। লেখক কুরআন-সুন্নাহ ও বিদ্বানদের কথা থেকে সেগুলো চয়ন করেছেন।

মাসাইলুল জাহিলিয়্যাহ দ্বারা উদ্দেশ্য

জাহিলী সমস্যা সম্পর্কে মুসলিমদের সতর্ক করা, যাতে তারা সেগুলো থেকে বিরত থাকতে পারে। কেননা সেগুলো মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে। যে সব বিষয় বা সমস্যার ব্যাপারে জাহিল কিতাবধারী ও উম্মি বা নিরক্ষরদের রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিরোধিতা করেছেন, তা লেখক রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন।

কিতাবী দ্বারা উদ্দেশ্য

কিতাবী দ্বারা আহলে কিতাব তথা ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টান উদ্দেশ্য। কেননা, ইয়াহূদীদের নিকট ছিল তাওরাত, যা মূসা আলাইহিস সালাম-এর উপর নাযিল হয়। আর খ্রিষ্টানদের নিকট ছিল ইনজীল, যা ঈসা আলাইহিস সালাম সালাম-এর উপর নাযিল হয়। এ কারণে তারা আহলে কিতাব নামে অভিহিত। তারা বর্তমানে তাওরাতকে প্রাচীন অঙ্গিকার (ওল্ডটেস্টামেন্ট) অথবা প্রাচীন গ্রন্থ বলে থাকে। আর ইনজিলকে বলে নতুন অঙ্গিকারের পুস্তক (নিউটেস্টামেন্ট)। এসব তাদের পরিভাষা মাত্র।

এ দু'টি মর্যাদা সম্পন্ন মহাগ্রন্থ, আল্লাহ তা'আলা দু'জন সম্মানিত নাবীর উপর নাযিল করেন; তারা হলেন ঈসা ও মূসা আলাইহিমাস সালাম। বিশেষ করে তাওরাত একটি বড় আসমানী কিতাব আর ইনজিল হলো তাওরাতের পরিপূরক ও সত্যায়নকারী গ্রন্থ। এজন্য তাদেরকে আহলে কিতাব বলা হয়। সুতরাং আহলে কিতাব ও অন্যদের মাঝে পার্থক্য হচ্ছে অন্যদের কিতাব দেয়া হয়নি।

উম্মি বা নিরক্ষর দ্বারা উদ্দেশ্য

আরবের যে সব লোক দীনের (তাওরাত বা ইনজিল) উপর ছিল না, তারা উম্মি (أميين) নামে পরিচিত। (الأُمِّيُّون) উম্মিউনা শব্দটি (أمّي) উম্মি এর বহুবচন। শব্দটি (الأم) আল-উম্ম এর দিকে সম্বন্ধিত। আর উম্মি তারা, যারা লিখতে ও পড়তে জানে না। কারণ, তারা (আরবরা) এমন সম্প্রদায়, যাদের অধিকাংশই লেখা পড়া জানতো না। পবিত্র কুরআন নাযিল হওয়ার পূর্বে তাদের নিকট কোন কিতাব ছিল না। একারণে তাদেরকে উম্মি বলা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ﴾ [الجمعة: 2]

তিনিই উম্মীদের মাঝে একজন রসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য থেকে *(সূরা আল জুমু'আহ ৬২:২)*। তিনি আরো বলেন,

﴿وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ﴾ [سبأ: 44]

আমি তাদেরকে কোন কিতাব দেইনি যা তারা অধ্যয়ন করত এবং তোমার পূর্বে তাদের প্রতি আর কোন সতর্ককারীও প্রেরণ করিনি *(সূরা সাবা ৩৪:৪৪)*। তিনি আরোও বলেন,

﴿لِتُنْذِرَ قَوْماً مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ﴾ [يس: 6]

যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক কর, যাদের পিতৃপুরুষদেরকে সতর্ক করা হয়নি, কাজেই তারা উদাসীন *(সূরা ইয়াসিন ৩৬:৬)*।

নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ তা'আলা উম্মি বলেছেন। যেমন–

﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْأِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [الأعراف: 157]

যারা অনুসরণ করে রসূলের যে উম্মী নাবী; যার গুণাবলী তারা নিজেদের কাছে তাওরাত ও ইঞ্জিলে লিখিত পায়, যে তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে *(সূরা আল 'আরাফ ৭:১৫৭)।*

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে উম্মি বলার কারণ হলো, তিনি পড়তে ও লিখতে জানতেন না। মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লেখাপড়া না জানা সত্ত্বেও এ মহাগ্রন্থ নিয়ে আসাই প্রমাণ করে, তার রিসালাত (অহী বার্তা) সত্য এবং এতে তার জন্য মু'জিযাও রয়েছে। অতএব, আরবরা ছিল উম্মি, তাদের নাবীও ছিলেন উম্মি, এটাই উম্মির অর্থ।

জাহিলিয়্যাহ দ্বারা উদ্দেশ্য

(الجاهلية) আল-জাহিলিয়্যাহ শব্দটি (الجهل) আল-জাহ্ল থেকে এসেছে। জাহ্ল অর্থ হলো জ্ঞানহীনতা, জ্ঞানশূন্যতা। আর জাহিলিয়্যাহ বলা হয় সেই সময়কে, যখন কোন রসূল ও কিতাব ছিল না। এখানে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রেরিত হওয়ার পূর্বের অবস্থাকে জাহিলিয়্যাহ বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ [الأحزاب: 33]

তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাক জাহেলী যুগের মত সৌন্দর্য প্রদর্শন করো না *(সূরা আল আহযাব ৩৩:৩৩)।*

এখানে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রেরিত হওয়ার পূর্বের অবস্থাকে বুঝানো হয়েছে। কেননা তখন গোটা মানবজাতি ভ্রষ্টতা, কুফরী ও নাস্তিকতায় ডুবে ছিল। কারণ কুরআনের পূর্বের রিসালাত বা আসমানী কিতাব নিশ্চিহ্ন হয়েছিল। ইয়াহূদীরা তাদের কিতাব তাওরাতকে বিকৃত

করে। তারা তাতে অনেক কুফরী, ভ্রষ্টতা ও নোংরা কথা সংযোজন করে। এমনিভাবে খ্রিষ্টানরাও ঈসা আলাইহিস সালাম-এর উপর ইনজিল নাযিল হওয়ার সময় তা যে অবস্থায় ছিল, সে অবস্থা থেকে পরিবর্তন করে। ইনজিল পরিবর্তনকারী ব্যক্তির নাম (بلس) বালাস/বুলাস অথবা (شاول) শাবিল। সে ছিল ইয়াহূদী এবং নাবী ঈসা আলাইহিস সালাম এর প্রতি বিদ্বেষী। এ লোক ষড়যন্ত্র ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে ঈসা আলাইহিস সালাম এর দীনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। সে ঈসা আলাইহিস সালাম এর উপর ঈমান আনার ভাব দেখায়। সে প্রকাশ করে যে, সে ঈসা আলাইহিস সালাম এর সাথে পূর্ব শক্রুতার জন্য অনুতপ্ত। তার দাবী অনুযায়ী সে একটি স্বপ্ন দেখার পর ঈসা আলাইহিস সালাম এর উপর ঈমান আনে। খ্রিষ্টানরা তার কথাকে সত্যায়ন করল। অতঃপর সে ঈসা আলাইহিস সালাম এর উপর অবতীর্ণ ইনজিল নিল। তারপর সে ইনজিল কিতাবে পৌত্তলিকতা, শিরক ও কুফরী ঢুকিয়ে দেয়। এমনকি তাতে ত্রিত্ববাদও উল্লেখ করে অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তিন উপাস্যের একজন (না'ঊযুবিল্লাহ)। আর ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর পুত্র অথবা তিনি আল্লাহ (নাউযুবিল্লাহ)। সে তাতে ক্রুশের ইবাদতের বিষয়টি প্রবেশ করায়। এছাড়া আরো অন্যান্য ঘৃণ্য কুফরী সে তাতে প্রবেশ করায়। আর খ্রিষ্টানরা তাকে আলিম এবং ইনজীলে বিশ্বাসী মনে করে এসব ব্যাপারে তার কথার সত্যায়ন করে। তাদের দাবি অনুযায়ী, তারা তাকে বালাস অথবা ঈসা আলাইহিস সালাম এর দূত (রসূল) বলে গণ্য করে । ঈসা আলাইহিস সালাম এর দীনে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দেয়াই তার লক্ষ্য ছিল। তার ইচ্ছা পূরণ হয়। পৌত্তলিকতা, ত্রিত্ববাদ এবং ঈসা আলাইহিস সালাম কে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করার আক্বীদা অথবা তিনি তিন জনের একজন, এসবের মাধ্যমে সে ঈসা আলাইহিস সালাম এর দীনকে নষ্ট করে। সে তাতে অনেক পৌত্তলিকতার অনুপ্রবেশ ঘটায় এবং খ্রিষ্টানরাও তাকে মেনে নেয়। নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রেরিত হওয়ার পূর্বে এটা ছিল আহলে কিতাবদের অবস্থা। তবে তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক সঠিক দীনের উপর ছিল। তাদের অধিকাংশই কুফরী ও আল্লাহর দীনের পরিবর্তনের উপর ছিল।

আরবরা দু'ভাগে বিভক্ত:

(১) পূর্ববর্তী দীনের অনুসারী। যেমন-ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান ও অগ্নিপূজক

(২) একনিষ্ঠ দীনে বিশ্বাসী। ইবরাহীম ও ইসমাঈল আলাইহিমাস সালাম এর দীনে বিশ্বাসীরা। বিশেষত হিজায ও মক্কা অঞ্চলে।

তাদের মাঝে একজন লোক ছিল, তার নাম আমর ইবনু লুহাই আল-খুযাঈ। তিনি হিজাযের শাসক ছিলেন। তিনি ইবাদত, ন্যায়নিষ্ঠতা ও যথাযথ ধার্মিকতা প্রকাশ করতো। তিনি চিকিৎসার জন্য সিরিয়া গমন করেন। সেখানে সিরিয়াবাসীকে মূর্তিপূজায় লিপ্ত দেখে তা ভাল মনে করেন। এ কারণে চিকিৎসা শেষে সিরিয়া থেকে কিছু মূর্তি নিয়ে ফিরে আসেন। তিনি ঐসব মূর্তি খুঁজতে থাকেন, যা নুহ আলাইহিস সালাম এর যুগের পর ভেঙ্গে মাটির সাথে মিশে যায়।

মূর্তিগুলো হলো: ওয়াদ, সূয়া, ইয়াগূস, ইয়াউক্ব, নাসর ইত্যাদি। তুফানে মূর্তিগুলো ভেঙ্গে যায়। তারপর শয়তান এসে ঐ সব মূর্তির জায়গাসমূহ দেখিয়ে দেয়। এরপর সে মূর্তি খুঁজে বের করে। তারপর আরবের বিভিন্ন গোত্রের মাঝে মূর্তিগুলো বণ্টন করে দেয় এবং সেগুলোর ইবাদতের আদেশ করে। আরববাসীরা তার নিকট থেকে মূর্তিগুলো গ্রহণ করে। এভাবে হিজায ও আরবের অন্যান্য এলাকায় শিরকের বিস্তার ঘটে। তারা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর দীনকে পরিবর্তন করে। আর তারা ঐ সব মূর্তিগুলোর নামে চতুষ্পদ জন্তু ছেড়ে দেয়।

এজন্য নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমরকে জাহান্নামে হাড় টানাটানি করতে দেখেন অর্থাৎ সে তার নাড়িভূড়ি টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছিল। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে মানুষ স্পষ্ট ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত ছিল। কিতাবধারী, উম্মি (নিরক্ষর) ও অন্যান্য সবাই পথভ্রষ্ট ছিল। তবে কতিপয় আহলে কিতাব সঠিক দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু তারা নবুওয়াতের পূর্বে শেষ হয়েছে। ফলে, যমীনে অন্ধকার ভরে যায়। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীবাসীর প্রতি দৃষ্টি ফিরালেন। অতঃপর আরব-অনারব সবার প্রতি

ঘৃণা প্রকাশ করলেন অর্থাৎ ক্রোধ দেখালেন। তবে কতিপয় আহলে কিতাব ব্যতীত।[১]

এই ঘোর অমানিশা, চূড়ান্ত জাহিলিয়্যাত, পথহারা পরিবেশ এবং আসমানী রিসালাত ও কিতাবের অনুপস্থিতিতে মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে পথ দেখানোর জন্য আল্লাহ তা‘আলা নাবী মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ} [آل عمران: 164]

অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের উপর অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের মধ্য থেকে তাদের প্রতি একজন রসূল পাঠিয়েছেন, যে তাদের কাছে তার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে আর তাদেরকে কিতাব ও হিক্বমাত শিক্ষা দেয়। যদিও তারা ইতঃপূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিল। *(সূরা আলে ইমরান ৩:১৬৪)*।

তারা পূর্বে স্পষ্ট ভ্রষ্টতায় ছিল অর্থাৎ নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে ভ্রষ্ট ছিল

পূর্বে জাহিলিয়্যাহ (الجاهلية) শব্দের বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, এটি (الجهل) থেকে এসেছে, যার অর্থ হলো জ্ঞানশূন্যতা, মূর্খতা। আর যা কিছু জাহিলিয়্যাতের দিকে সম্বন্ধিত, তা-ই নিন্দনীয়। এ জন্য আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾

তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাক জাহেলী যুগের মত সৌন্দর্য প্রদর্শন করো না *(সূরা আল আহযাব ৩৩:৩৩)*।

আল্লাহ তা‘আলা নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রীদেরকে সৌন্দর্য প্রকাশ করতে নিষেধ করেন। এখানে সৌন্দর্য প্রকাশের অর্থ হলো,

---

১. ছহীহ: মুসনাদে আহমাদ ১৭৪৮৪।

হাট-বাজার ও মানুষের সামনে সৌন্দর্য প্রকাশ করা। কেননা, জাহিলী যুগের মহিলারা সৌন্দর্য প্রকাশ করতো; বরং গোপন অঙ্গও প্রকাশ করে দিতো। যেমন-কাবা তাওয়াফের সময়ও মহিলারা অহংকারবশত সৌন্দর্য প্রকাশ করতো। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ} [الفتح: 26]

যখন কাফিররা তাদের অন্তরে আত্ম-অহমিকা পোষণ করেছিল, জাহেলী যুগের আহমিকা *(সূরা আল ফাতাহ ৪৮:২৬)।*

এখানে নিন্দা অর্থে এটি ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ জাহিলী অহমিকা প্রদর্শন নিকৃষ্ট কাজের অন্তর্ভুক্ত। কোন এক যুদ্ধে আনসার ও মুহাজির দু'জন লোকের মাঝে দ্বন্দ্ব হয়। তারা উভয়ে নিজ নিজ গোত্রের লোকদেরকে সাহায্যের জন্য ডাকতে থাকেন। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংবাদ পেয়ে তাদেরকে বললেন,

"أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟! دعوها فإنها منتنة"

'তোমরা কি জাহিলদের মত ডাকাডাকি শুরু করেছ? অথচ আমি তোমাদের মাঝে বিদ্যমান। এ ধরণের হাঁকডাক ছেড়ে দাও, কেননা তা নিকৃষ্ট কাজ।[২]

অর্থাৎ গোত্র নিয়ে দ্বন্দ্ব খারাপ কাজ। মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। আনসার ও মুহাজিরের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। বিভিন্ন গোত্রের মাঝেও কোন পার্থক্য নেই। বিশ্বাসগতভাবে তারা ভাই ভাই এবং একটি দেহ ও নির্মিত ভবনের মত, যার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরস্পর সম্পৃক্ত। মুসলিমদের উপর আবশ্যক হলো, আরব ও অনারব এবং বিভিন্ন বর্ণ গোত্রের মাঝে তাক্বওয়া (আল্লাহ ভীরুতা) ছাড়া পার্থক্য সৃষ্টি না করা। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: 13]

২.ছ্বহীহ বুখারী ৩৫১৮, ৪৯০৫; মুসলিম ২৫৮৪।

আল্লাহর কাছে সেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়া সম্পন্ন *(সূরা আল হুজরাত ৪৯:১৩)*। তিনি আরো বলেন,

{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} [الحجرات: 10]

নিশ্চয় মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। কাজেই তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপোষ মীমাংসা করে দাও *(সূরা আল হুজরাত ৪৯:১০)*।

অতএব, বংশ ও গোত্রের অহমিকা জাহিলী কাজ। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية

'যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলো, অথচ তার কাঁধে আনুগত্যের বাই'আত নেই, সে জাহিলিয়্যাতের উপর মৃত্যুবরণ করলো'।[৩]

কারণ, জাহিল জাতি হলো নৈরাজ্যবাদী। তারা কোন আমীর-শাসক বা সুলতান-সম্রাটকে পরোয়া করে না। এ হলো জাহিলীদের অবস্থা।

সারকথা হলো, জাহিলী সব কর্মকাণ্ড নিকৃষ্ট ও নিন্দনীয়। জাহিলদের মতো কর্মকাণ্ড করতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পর জাহিলী যুগের সমাপ্তি হয়। নবুওয়াতের পর সাধারণ জাহিলিয়্যাতের অবসান হয়। মানুষের মাঝে দীনের জ্ঞান চর্চা ও ঈমান ফিরে আসে। কুরআন-সুন্নাহ নাযিল হয়, জ্ঞানচর্চা চলতে থাকে। ফলে জাহিলিয়্যাত তথা অজ্ঞতা দূরীভূত হয়। কেননা যতক্ষণ কুরআন, হাদীছ এবং বিদ্বানদের কথা চর্চা হয়, ততক্ষণ জাহিলিয়্যাত থাকতে পারে না। ঐ সময় সাধারণ জাহিলিয়্যাতের অবসান হয়। তবে কিছু মানুষ অথবা গোত্র অথবা কিছু অঞ্চলে জাহিলিয়্যাত থাকতে পারে অর্থাৎ আংশিক জাহিলিয়্যাত থাকতে পারে।

এক ব্যক্তি তার ভাইকে 'হে কালোর বেটা!' বলে গালমন্দ করছিলেন, তখন নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন,

---

৩. ছহীহ মুসলিম ১৮৫০।

أعيّرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية

'তুমি কি তার মায়ের নাম ধরে গালি দিলে? তুমিতো এমন লোক, যার মাঝে এখনও জাহিলিয়্যাত আছে'।[4]

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم

আমার উম্মাতের মাঝে চারটি জাহিলিয়্যাতের রীতি চালু থাকবে, যা তারা পরিত্যাগ করবে না: গোত্রের গৌরব করা। বংশ মর্যাদার খোঁটা দেয়া। মৃতের জন্য কান্না-বিলাপ করা। তারকারাজীর মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করা'।[5]

হাদীছটি প্রমাণ করে, কিছু মানুষের মাঝে এ নিকৃষ্ট জাহিলী রীতি চালু থাকবে। তবে এসবের মাধ্যমে তারা কাফির হবে না। আল্লাহর রহমতে সাধারণ জাহিলিয়্যাত দূরীভূত হয়েছে। এ জন্য বলা বৈধ নয় যে, মানুষ জাহিলিয়্যাতের মধ্যে আছে অথবা জাহিলী জগত। কেননা এভাবে বলা রিসালাত ও কুরআন-সুন্নাহকে অস্বীকার করার অন্তর্ভুক্ত। তাই এটা বলা বৈধ নয়।

বরং এভাবে বলতে হবে যে, কিছু মানুষের মাঝে জাহিলিয়্যাত আছে অথবা কিছু ব্যক্তি জাহিলী স্বভাবের। অথবা জাহিলী স্বভাবের কিছু অংশ বিদ্যমান। এভাবে বললে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওয়াত লাভের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের মাঝে পার্থক্য সূচিত হবে।

কিছু মানুষ বলতে পারে, জাহিলিয়্যাত যেহেতু শেষ হয়েছে, তাহলে জাহিলী বিষয়সমূহ আলোচনার প্রয়োজন কি? আমরা তো মুসলিম। প্রশংসা আল্লাহরই।

জবাব হলো, জাহিলী সমস্যা থেকে বেঁচে থাকা। এ বিষয়ে জ্ঞানার্জন করে মানুষ সতর্ক হবে। তা না হলে মানুষ বুঝবে না। তখন সে তাতে জড়িয়ে

---

৪. ছ্বহীহ বুখারী ৩০, ২৫৪৫, ৬০৫০।

৫. ছ্বহীহ বুখারী, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৯৩৪।

যেতে পারে। জাহিলী কর্ম থেকে সতর্ক ও বিরত থাকার জন্য এ সম্পর্কে আলোচনা ও গবেষণা হওয়া দরকার।

কবি বলেন: আমি জেনেছি মন্দ, প্রয়োগের জন্য নয়, যেন তাতে সদা সতর্কতা রয়, যে জানেনি তাহা, ডুবে রবে সেথায়।

জাহিলী সমস্যা সম্পর্কে জানার এটি প্রথম দিক। আর দ্বিতীয় দিক হলো যখন জাহিলিয়্যাত সম্পর্কে জ্ঞানার্জন হবে তখন ইসলামের মর্যাদা বুঝা যাবে। কবি বলেন:

মন্দের বিপরীতে ভাল প্রকাশ পায়। বিপরীতমুখী বিষয় দ্বারা অনেক কিছু জানা যায়।

উমার ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية

‘ইসলামের রশি একটা একটা করে ছিড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তখনই, যখন কেউ ইসলামের ছায়ায় বড় হয়েও জাহিলিয়্যাত সম্পর্কে জানবে না’। সুতরাং জাহিলী বিষয়ে মানুষ অজ্ঞ হলে জাহিলী কর্মে লিপ্ত হতে পারে। কেননা শয়তান জাহিলী কর্ম ভুলে যায়নি এবং সে অসচেতনও নয়, বরং সে জাহিলী কাজ কর্মের দিকেই মানুষকে ডাকে।

শয়তান ও তার অনুসারীরা ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বানকারী, জাহিলী কর্ম উজ্জীবিত করা, শিরক, বিদ‘আত, কুসংস্কার ও প্রাচীনত্বের দিকে তারা ডাকতেই থাকে। এসবের উদ্দেশ্য হলো: ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করা ও মানুষকে জাহিলিয়্যাতের দিকে ডাকা। সুতরাং জাহিলিয়্যাত থেকে বিরত ও দূরে থাকার জন্য এ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানার্জন আবশ্যক।

শাইখ রহিমাহুল্লাহ বলেন, ‘সবচেয়ে ভয়াবহ ও মারাত্মক জাহিলিয়্যাত হচ্ছে, অন্তরে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর নাযিলকৃত ওহীর প্রতি বিশ্বাস না রাখা’। কেননা জাহিলরা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং তাকে বিশ্বাস করে না। আর তারা আল্লাহ তা‘আলার পথ নির্দেশনা গ্রহণ করে না, যা তিনি নিয়ে

এসেছেন। শাইখ রহিমাহুল্লাহ বলেন: ‘এর সাথে যদি জাহিলরা যে নীতি অবলম্বন করতো, তা যুক্ত হয়, তাহলে ক্ষতি পূর্ণতা লাভ করবে’। অর্থাৎ প্রকাশ্য ও গোপনে ফাসাদ (বিশৃঙ্খলা) ছড়িয়ে পড়বে।

গোপন ফাসাদ হচ্ছে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন, তার প্রতি বিশ্বাস না থাকা। আর প্রকাশ্য ফাসাদ হচ্ছে জাহিলী বিষয়সমূহকে ভাল মনে করে পালন করা। এভাবে প্রকাশ্য ও গোপন বিষয় ধ্বংস হলে তখন ক্ষতি পূর্ণতা পায়। আমরা এ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

এটাই হলো জাহিলিয়্যাত সম্পর্কে না জানার কুফল। সুতরাং জাহিলরা যেসব কুনীতির উপর ছিল, তাকে ভাল মনে করা বৈধ নয়। বরং আবশ্যক হলো, এটাকে অস্বীকার করা ও তা জঘন্য মনে করা। সেজন্য, যারা জাহিলী কর্মকে ভাল মনে করে, তারা তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। এ বিষয়ে শাইখের দলীল:

{وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} [العنكبوت: 52]

যারা বাতিলে বিশ্বাস করে ও আল্লাহকে অস্বীকার করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত *(সূরা আল আনকাবূত ২৯:৫২)*।

বাতিলের প্রতি ঈমান এনেছে অর্থাৎ বাতিলকে বিশ্বাস করেছে। বাতিল হলো হক্বের বিপরীত। কোন বিষয় হক্বের বিরোধী হলে তা বাতিল বলে গণ্য। বাতিল হলো উদ্ভূত ধ্বংসশীল বিষয়, যাতে কোন উপকার নেই। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ} [يونس: 32]

অতঃপর সত্যের পর ভ্রষ্টতা ছাড়া কী থাকে? অতএব কোথায় তোমাদেরকে ফেরানো হচ্ছে? *(সূরা ইউনূস ১০:৩২)*।

১. আওলিয়া ও নেককারদের নিকট দু'আ করা

জাহেলী যুগে আরবের লোকেরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা এবং ইবাদত করার সময় নেককার লোকদের শরীক করতো। এর মাধ্যমে তারা আল্লাহর নিকট তাদের সুপারিশ (শাফা'আত) কামনা করতো। তারা ধারণা করতো যে, আল্লাহ তা'আলা এমনটি পছন্দ করেন এবং নেককার লোকেরাও তা পছন্দ করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ} [يونس: 18]

আর তারা আল্লাহ ব্যতীত এমন কিছুর ইবাদত করছে, যা তাদের ক্ষতি করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না। আর তারা বলে, এরা আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী *(সূরা ইউনুছ ১০:১৮)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى} [الزمر: 3]

আর যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করে তারা বলে, 'আমরা কেবল এজন্যই তাদের 'ইবাদত করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে' *(সূরা আয যুমার ৩৯:৩)*।

এটিই ছিল সব চেয়ে বড় বিষয়, যে ব্যাপারে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফিরদের বিরোধিতা করেছেন। তিনি একনিষ্ঠতা (ইখলাস) বর্ণনা করলেন এবং লোকদের জানিয়ে দিলেন যে, এটাই হচ্ছে আল্লাহর দীন, যে দীন দিয়ে তিনি সকল রসূলকে পাঠিয়েছেন এবং তিনি একনিষ্ঠ আমল ছাড়া অন্য কোন আমল গ্রহণ করেন না। তিনি আরো বললেন যে, যারা তাদের প্রবৃত্তি অনুযায়ী আমল করবে, আল্লাহ তাদের উপর জান্নাতকে হারাম করে দিবেন এবং তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

এ বিষয়টার কারণেই মানব জাতি ‘মুসলিম’ ও ‘কাফির’ দু’ভাগে বিভক্ত হয়েছে। এর কারণেই শত্রুতা সৃষ্টি হয়েছে এবং জিহাদ বিধিবদ্ধ হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} [الأنفال: 39]

আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যতক্ষণ না ফিৎনার অবসান হয় এবং দীন পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায় *(সূরা আল আনফাল ৮:৩৯)।*

....

ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات:56]

আর আমি জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে তারা আমার ‘ইবাদত করবে *(সূরা আয যারিয়াত ৫১:৫৬)।*

‘ইবাদত একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার অধিকার। তার সাথে অন্য কাউকে অংশীদার স্থাপন করে তার ইবাদত করা বৈধ নয়, সে যেই হোক না কেন। জাহিলরা এ নির্দেশটি উল্টিয়ে দেয়। তারা আল্লাহ তা‘আলার ইবাদত ছেড়ে দেয় অথচ এজন্যই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তারা আল্লাহ তা‘আলাকে বাদ দিয়ে মূর্তি, গাছ, পাথর, ফেরেশতা, জিন, আওলীয়া ও নেককার লোকদের ইবাদত করে। এভাবে তারা আল্লাহ তা‘আলা ছাড়া অন্যের জন্য ইবাদত করে।

জাহিলদের মধ্যে কেউ কেউ আদৌ আল্লাহর ইবাদত করে না; আর তারা হচ্ছে, কাফির ও বস্তুবাদী নাস্তিক। আবার কেউ কেউ আল্লাহ্‌র ইবাদত করে, তবে তার সাথে অন্যের ইবাদতও করে। মূলতঃ তাদের বিধানও কাফির-নাস্তিকদের মতই। যারা আল্লাহর সাথে অন্যের ইবাদত করে, তারা ঐ লোকদের মত, যারা আদৌ আল্লাহর ইবাদত করে না। কেননা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত বাতিল। আর আল্লাহ তা‘আলা তার সাথে অংশীদারিত্ব পছন্দ করেন না। আরেকটা বিষয় হচ্ছে, আমল শরী‘আত সম্মত হওয়া আবশ্যক। আল্লাহ তা‘আলা বিদ‘আতী আমল কবুল করেন

না, অনুরূপভাবে তিনি শিরকযুক্ত আমলও গ্রহণ করেন না। সেজন্য, সবচেয়ে মারাত্মক ও ভয়াবহ জাহিলিয়্যাত হচ্ছে, আল্লাহর সাথে শরীক করা এবং বিদ‘ধাতী কাজ করা।

শাইখ রহিমাহুল্লাহ এ বিষয় দিয়ে তার আলোচনা শুরু করেছেন। কেননা জাহিলী বিষয়সমূহের মধ্যে তা সবচেয়ে মারাত্মক। এজন্য রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বিষয়কে অস্বীকার করা এবং তা মানুষকে ছেড়ে দেয়ার আহ্বান জানাতেন। অন্যান্য নাবী-রসূলগণের মত রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তা‘আলার ইবাদতের নির্দেশ দিতেন। আর আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত ছেড়ে দিতে বলতেন। এটা ছিল রসূলগণের দাওয়াতের সূচনা। কেননা তাওহীদ সকল আমলের মূল ভিত্তি। এটা বিনষ্ট হলে আমল মূল্যহীন বলে গণ্য হয়। তাওহীদ ব্যতীত ছ্বলাত, সিয়াম, হাজ্জ, যাকাত ও অন্যান্য সকল প্রকার ইবাদত মূল্যহীন। যেহেতু মূলভিত্তি তথা তাওহীদ বিনষ্ট হয়েছে, তাই কোন আমলই মূল্যায়ন যোগ্য নয়। শিরকের কারণে আমল বিনষ্ট ও বাতিল বলে গণ্য হয়।

জাহিলীযুগে আল্লাহ তা‘আলার ইবাদতের সাথে বিভিন্ন বস্তুর ইবাদত করা হতো। যেমন- আওলীয়া ও নেক লোকদের ইবাদত করা: নূহ আলাইহিস সালাম এর জাতি সৎ লোকদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে- যেমন-ওয়াদ, সূয়া, ইয়াগুস ও নসর আল্লাহ তা‘আলার ইবাদত ব্যতীত তারা এসব লোকদের কবর পূজা করতো। তারা মনে করতো এসকল ব্যক্তি সৎ, তারা আমাদেরকে আল্লাহ তা‘আলার নিকটবর্তী করে দিবে এবং আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবে। তারা এর উপর ভিত্তি করে আওলীয়া, নেকলোক ও ফিরিস্তাদের ইবাদত করতো। তারা বলে: তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দিবে এ কারণে তাদের ইবাদত করি। তাদের কথা: তারাই আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করবে। তারা আওলীয়া, নেকলোক ও ফিরিস্তাদেরকে আল্লাহর শরীক মনে করতো না। বরং তারা বলতো, আমাদের জন্য তারা আল্লাহর নিকটে পৌছার মাধ্যম এবং তারা আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য সুপারিশ করবে। তারা আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম। তাদের কাজকর্মকে তারা শিরক মনে করে না। কেননা শয়তান এভাবে তাদের কর্মকে সৌন্দর্য মন্ডিত করে যে, এটা শিরক নয়।

বরং এটা নেক লোকদের ওসীলা বা মাধ্যম ও সুপারিশ মাত্র। তারা বলে যে, নাম দিয়ে উপকার পাওয়া হয় না। বাস্তবতার মধ্যে দিয়ে উপকার লাভ করতে হয়। যদিও তারা সুপারিশ ও নৈকট্য লাভ করার জন্য নাম ব্যবহার করে তবুও তা শিরক। কেননা নাম দিয়ে কখনো বাস্তব অবস্থার পরিবর্তন করা যায় না। আল্লাহ তা'আলা তার ইবাদতে কাউকে অংশীদার করা পছন্দ করেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً} [الكهف: 110]

সুতরাং যে তার রবের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার রবের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে *(সূরা আল কাহাফ ১৮:১১০)*। তিনি আরো বলেন,

{فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ} [الزمر: 2]

অতএব আল্লাহর 'ইবাদত কর তারই আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে *(সূরা আয যুমার ৩৯:২)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ [سورة البينة: 5]

আর তাদেরকে কেবল এ নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর 'ইবাদত করে তারই জন্য দীনকে একনিষ্ঠ করে *(সূরা আল বায়্যিনাহ ৯৮:৫)*।

তিনি আরো বলেন,

{فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [غافر: 14]

সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ডাক, তার উদ্দেশ্যে দীনকে একনিষ্ঠভাবে নিবেদিত করে *(সূরা গাফির ৪০:১৪)*।

ইখলাস (একনিষ্ঠতা) ও রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শ অনুসরণ ছাড়া ইবাদত মূল্যহীন। জাহিলিয়্যাতের বড় সমস্যা হচ্ছে আওলীয়া ও নেক লোকদের ইবাদত করা, মৃত ও অস্তিত্বহীনদের নিকট সাহায্য কামনা ও আশ্রয় প্রার্থনা করা, তাদের কাছে অভাব-অভিযোগ পেশ

করা। যেমনভাবে বর্তমানে এসবকে কেন্দ্র করে কবর পূজা করা হয়। কবর পূজা, মৃতদের কাছে নৈকট্য লাভ করা ও আল্লাহ ব্যতীত তাদেরকে ডাকা ও তাদের কাছে সাহায্য কামনা করা বর্তমান চালু আছে যা জাহিলী কর্ম বলে গণ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ} [يونس:18]

আর তারা আল্লাহ ব্যতীত এমন কিছুর ইবাদত করছে, যা তাদের ক্ষতি করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না। আর তারা বলে, এরা আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী *(সূরা ইউনূস ১০:১৮)*।

অনুরূপভাবে বস্তু পূজাও বর্তমান চালু আছে। ঐ সব কবর পূজারীদেরকে কবর পূজার বৈধতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ ও তা থেকে নিষেধ করা হলে তারা বলে, আমরা কবর পূজা করি না, আর ইবাদততো আল্লাহর জন্যই হয়। আমাদের জন্য তারা আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ ও সুপারিশের মাধ্যম। জাহিলদের এ বিষয়কে আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ} [يونس:18]

আর তারা আল্লাহ ব্যতীত এমন কিছুর ইবাদত করছে, যা তাদের ক্ষতি করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না। আর তারা বলে, এরা আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী *(সূরা ইউনূস ১০:১৮)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى} [الزمر: 3]

আর যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করে তারা বলে, 'আমরা কেবল এজন্যই তাদের 'ইবাদত করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে' *(সূরা আয যুমার ৩৯:৩)*।

তারা তাদের ইবাদত করে না কিন্তু তারা মনে করে যে, সৃষ্টি করা, রিযিক দেয়া ও জীবন-মৃত্যুতে তারা আল্লাহর অংশীদার (নাউযুবিল্লাহ) অথচ তারা জানে একমাত্র আল্লাহই সব কিছুর মালিক। তারা আওলীয়া ও নেক লোকদের ইবাদত করে যাতে তারা আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়। তারা বলে থাকে, আমরা পাপী বান্দা। যেহেতু তারা নেক লোক, এ হিসাবে আল্লাহর নিকট তাদের মর্যাদা আছে। তাই আমাদের তাওবা ও ইবাদত আল্লাহর নিকট কবুল হওয়ার জন্য তাদের মাধ্যম অবলম্বন করি। এ জন্য শয়তান জিন ও মানবজাতিকে এ কাজটি তাদের জন্য সৌন্দর্য মন্ডিত করে। আশ্চর্যজনক বিষয় হলো তারা কুরআন পাঠ করে, এ সম্পর্কিত আয়াতও জানে কিন্তু তারা সতর্ক হয় না। এ সত্ত্বেও তারা কবর পূজায় অবিচল থাকে। আর কবর পূজা জাহিলী কর্ম। জাহিলিয়্যাত, জাহিলী কাজকর্ম ও তার কুফল সম্পর্কে তারা অবগত নয়।

শাইখ রহিমাহুল্লাহ বলেন, এটা হলো বড় সমস্যা যে বিষয়ে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বিরোধিতা করেন। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একনিষ্ঠতার কথা বর্ণনা করেন। আর আল্লাহর যে দীনের উপর রসূলগণ প্রেরিত, তা তিনি প্রচার করেন। একনিষ্ঠতা ছাড়া আমল কবুল হয় না তা মানুষকে অবহিত করেন। তিনি আরোও বলেন, ইখলাস ব্যতীত উত্তম মনে করে যারা কোন আমল করে, আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য জান্নাত হারাম করেন, তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম। এটা এমন সমস্যা যার কারণে মুসলিম ও কাফিরের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি হয়। আর কাফিরদের শত্রুতার কারণে জিহাদ বিধিবদ্ধ হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} [الأنفال: 39]

আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যতক্ষণ না ফিৎনার অবসান হয় এবং দীন পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায় *(সূরা আল আনফাল ৮:৩৯)*।

আল্লাহ তা'আলার নিকট অভাব-অভিযোগ পেশ করতে বান্দাকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করার প্রয়োজন আছে কি অথচ আল্লাহ তা'আলা বান্দার নিকটে থেকে সাড়াদানকারী? তিনি বান্দার কথা শুনেন, তাদেরকে দেখেন, দয়া করেন ও তাদের তাওবা কবুল করেন। তিনি আমাদেরকে দু'আয়

কোন মাধ্যম অবলম্বন করার নির্দেশ দেননি। বরং তিনি আমাদেরকে সরাসরি তার নিকট দু'আ করতে বলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} [غافر: 14]

সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ডাক, তার উদ্দেশ্যে দীনকে একনিষ্ঠভাবে নিবেদিত করে *(সূরা গাফির ৪০:১৪)*।

{وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ} [غافر:60]

আর তোমাদের রব বলেছেন, 'তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের জন্য সাড়া দেব। নিশ্চয় যারা অহঙ্কার বশতঃ আমার ইবাদত হতে বিমুখ থাকে, তারা অচিরেই লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে' *(সূরা গাফির ৪০:৬০)*।

আল্লাহ তা'আলা কোন মাধ্যম ছাড়া সরাসরি তার কাছে দু'আ করার নির্দেশ দেন। শিরক হলো মারাত্মক সমস্যা যে ব্যাপারে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাহিলদের বিরোধিতা করেন। কেননা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের মাঝে প্রেরিত হয়ে প্রথমে আল্লাহ তা'আলার একত্বের দিকে দাওয়াত দেন এবং শিরক পরিত্যাগ করতে বলেন। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

قولوا: لا إله إلا الله؛ تفلحوا

তোমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বল, অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন প্রকৃত উপাস্য নেই, তাহলে তোমরা সফলতা লাভ করবে।[৬] তিনি আরো বলেন,

أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم

---

৬. ছ্বহীহঃ মুসনাদে আহমাদ, ছ্বহীহ ইবনে হিব্বান, ত্বারানী ক্বাবীর, সুনানে দ্বারাকুতনী, মুসতাদরাক হাকীম।

অর্থাৎ আমি মানুষের সাথে সংগ্রাম করতে আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা বলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন প্রকৃত উপাস্য নেই। তারা এটা স্বীকার করলে আমার পক্ষ থেকে তাদের জীবন ও ধনসম্পদের নিরাপত্তা থাকবে।[৭]

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমাবেশে, আবাসস্থলে, আর হাজ্জের মৌসুমে তাদের মাঝে উপস্থিত হয়ে আল্লাহর একত্বের দাওয়াত দিতেন এবং দাওয়াতী কাজের জন্য বিভিন্ন জায়গায় যেতেন। যেমন তিনি তায়েফবাসীদেরকে আল্লাহর একত্বের দাওয়াত দেন। ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার একত্ব প্রকাশ করা। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমেই একত্বের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেন। এজন্য দা'ঈর উপর আবশ্যক হলো দাওয়াতী কাজে তাওহীদের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইখলাস (একনিষ্ঠতা) ও একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদতের দিকে দাওয়াত দেন এবং আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আওলীয়া, নেকলোক ও অন্যান্যের ইবাদত পরিত্যাগ করতে বলেন। এটাই ছিল রসূলগণের দীন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ [الأنبياء:25]

আর তোমার পূর্বে এমন কোন রসূল আমি পাঠাইনি যার প্রতি আমি এই ওহী অবতরণ করিনি যে, 'আমি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই; সুতরাং তোমরা আমার ইবাদত কর' *(সূরা আল আম্বিয়া ২১:২৫)।*

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} [النحل: 36]

আর আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতিতে একজন রসূল প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং পরিহার কর ত্বাগূতকে *(সূরা আন নাহাল ১৬:৩২)।*

৭. ছ্বহীহ বুখারী ১৩৯৯, ২৯৪৬, ছ্বহীহ মুসলিম ২০,২১।

এটাই ছিল রসূলগণের দাওয়াতী পদ্ধতি যার মাধ্যমে তারা আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান করেন। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত সব কিছুকে পরিত্যাগ করতে বলেন এবং ধারাবাহিকভাবে মানুষকে সংশোধনের আহ্বান জানান। আর আল্লাহ তা'আলা তার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে শিরকমুক্ত আমল ও ইখলাস (একনিষ্ঠতা) ব্যতীত কোন কিছু কবুল করেন না। আর আমল কবুল হওয়ার জন্য তা শরীয়ত সম্মত হওয়া আবশ্যক। তাই বিদ'আতী আমল আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন না, আর শিরকযুক্ত আমলও গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً} [الكهف: 110]

সুতরাং যে তার রবের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার রবের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে *(সূরা আল কাহাফ ১৮:১১০)*।

{وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً} [النساء: 36]

তোমরা ইবাদত কর আল্লাহর, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না *(সূরা আন নিসা ৪:৩৬)*।

আল্লাহ তা'আলা তার ইবাদতের নির্দেশ দিয়ে ক্ষান্ত হননি, তিনি শিরক থেকেও বান্দাকে বিরত থাকতে বলেন। কারণ শিরক মিশ্রিত আমল আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। আর ঈমান আনয়নের পূর্বে ত্বাগুতকে অস্বীকার করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا} [البقرة: 256]

অতএব, যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, অবশ্যই সে মজবুত রশি আঁকড়ে ধরে, যা ছিন্ন হবার নয় *(সূরা আল বাক্বারাহ ২:২৫৬)*।

এটিই হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর অর্থ অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন উপাস্য নেই। আর কালিমার মাঝে ইতিবাচক ও নেতিবাচক এবং শিরক

পরিত্যাগ ও আল্লাহর একত্বের স্বীকৃতি দেয়ার অর্থ নিহিত আছে। (لا إله) তথা কোন প্রকৃত উপাস্য নেই। এ অংশটুকুর মাধ্যমে সকল বাতিল কৃত্রিম উপাস্যসমূহকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। (إلا الله) তথা আল্লাহ ব্যতীত। কালিমার এ অংশের মাধ্যমে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার নির্দেশ সাব্যস্ত হয়েছে। আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইখলাস (একনিষ্ঠতা) ছাড়া কোন আমল তার নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। আর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পদ্ধতি অনুসরণ ছাড়া বিদ‘আতী আমলও তিনি কবুল করেন না। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد

যে আমাদের নির্দেশ ব্যতিরেকে আমল করলো তা প্রত্যাখ্যাত।[৮]

অন্য রেওয়ায়েতে তিনি আরোও বলেন:

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

যে আমাদের দীনে নতুন কিছু উদ্ভাবন করলো যা দীন নয় তা প্রত্যাখ্যাত।[৯]

এ কারণে আলেমগণ বলেন, দু’টি শর্ত ছাড়া আমল গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রথমত: আল্লাহ তা‘আলার জন্যই একনিষ্ঠভাবে আমল করা।

দ্বিতীয়ত: রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পদ্ধতি অনুসারে আমল করা।

দু’টি শর্তের কোন একটি ভঙ্গ হলে আমল কবুল হবে না এবং তাকে সৎআমল বলে গণ্য করা হবে না।

মূর্তি, আওলীয়া, গাছ, পাথর ও কবর ইত্যাদির পূজা করা যারা ভালমনে করে এবং আল্লাহর বিধান ও রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর

৮. ছ্বহীহ মুসলিম ১৭১৮।
৯. ছ্বহীহ বুখারী ২৬৯৭, ছ্বহীহ মুসলিম ১৭১৮।

পদ্ধতি অনুসারে ইবাদত করে না, এরূপ ইবাদতকারী ও কুপ্রবৃত্তির উপর নির্ভরশীলদেরকে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সতর্ক করেছেন। কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী কর্মের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন এবং জাহান্নাম হবে তাদের আবাস স্থল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ} [المائدة: 72]

নিশ্চয় যে আল্লাহর সাথে শরীক করে, তার উপর অবশ্যই আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন *(সূরা আল মায়িদা ৫:৭২)*।

অর্থাৎ চুড়ান্ত ভাবে তাদের জন্য জান্নাতে প্রবেশ নিষিদ্ধ। আর (التحريم) শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো নিষিদ্ধ। মুশরিকদের জন্য জান্নাত চুড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ। তাদের জন্য জান্নাতের প্রত্যাশা নেই এবং জাহান্নামই তাদের আবাসস্থল। এটা হলো আল্লাহর সাথে শিরক করার মন্দ পরিনাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى} [الزمر: 3]

যদিও তারা বলে থাকে, আমরাতো তাদের ইবাদত করি না কিন্তু তারাতো আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দিবে। তারা এর উপরই মৃত্যু বরণ করে, তারা ফিরে আসে না। আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য জান্নাত হারাম করে দেন। আর জাহান্নামকে তাদের জন্য চিরস্থায়ী আবাস স্থল নির্ধারণ করেন। যে মুক্তি পেতে চায় সে এ ব্যাপারে সতর্ক হয়। আর জাহিলী কাজকর্ম ও অন্যান্য অবাধ্যতা ছেড়ে দেয়।

শাইখ রহিমাহুল্লাহ বলেন, এ সমস্যার কারণে মানুষ মুসলিম ও কাফিরে বিভক্ত অর্থাৎ তাওহীদ ও শিরকে বিভক্ত। একদল রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সত্যবাদী জেনে তার প্রতি ঈমান আনয়ন করে এবং একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য একনিষ্ঠভাবে ইবাদত করে, তারাই মু'মিন। আর আরেক দল রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরোধিতা বশতঃ শিরকের উপর ও তাদের ইবাদতের উপর অবিচল

থাকে। আর তাদের পূর্ব পুরুষরা ইতিপূর্বে যেভাবে ইবাদত করতো। পূর্ববর্তী জাতিরা শিরকের উপর ছিল। তারা রসূলগণের বিরোধিতা করতো। কেননা তাদের পূর্ব পুরুষদের রীতিনীতির উপর তারা অবিচল থাকতে চায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ} [الزخرف:23]

আর এভাবেই তোমাদের পূর্বে যখনই আমি কোন জনপদে সতর্ককারী পাঠিয়েছি, তখনই সেখানকার বিলাসপ্রিয়রা বলেছে, নিশ্চয় আমরা তো আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে এক মতাদর্শের ওপর পেয়েছি তাই আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি *(সূরা আয যুখরুফ ৪৩:২৩)*। তারা বলে,

أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا} [هود: 62]

তুমি কি আমাদেরকে নিষেধ করছ তাদের উপাসনা করতে আমাদের পিতৃপুরুষরা যাদের উপাসনা করত? *(সূরা হুদ ১১:৬২)*।

এটা তাদের মুখের কথা ও তাদের যুক্তি। তারা পূর্বপুরুষদের রীতিকে আঁকড়ে ধরে থাকে। তা ছিল আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদত।

এর কথা: শত্রুতার সময় অর্থাৎ তাওহীদ পন্থী ও মুশরিকের মাঝে, মু'মিন ও কাফিরের মাঝের শত্রুতা। সুতরাং কাফিরদের সাথে শত্রুতা রাখা মু'মিনদের উপর আবশ্যক। তাই কাফিরদের প্রতি ভালবাসা রাখা বৈধ নয় যদিও তারা নিকটতম (প্রতিবেশী, বন্ধু, আত্মীয়) হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْأِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ} [المجادلة: 22]

যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান আনে তুমি পাবে না এমন জাতিকে তাদেরকে পাবে না এমন লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করতে বন্ধু হিসাবে যারা

আল্লাহ ও তার রসূলের বিরোধীতা করে, যদি সেই বিরুদ্ধবাদীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই অথবা জ্ঞাতি গোষ্ঠী হয় তবুও। এদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তার পক্ষ থেকে রূহ দ্বারা তাদের শক্তিশালী করেছেন। *(সূরা মুজাদালাহ ৫৮:২২)।*

আল্লাহ ও তার রসূল এবং মু'মিনদের সাথে বন্ধুত্ব করা আবশ্যক। কুফরী ও কাফির এবং শিরক ও মুশরিকদের থেকে বিরত থাকা অত্যাবশ্যক।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ [الممتحنة: 4]

আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করি; এবং উদ্রেক হল আমাদের তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য; যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আন *(সূরা মুমতাহানাহ ৬০:৪)।*

তাহলেই তারা হবে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর দলের অন্তর্ভুক্ত। যারা বর্তমানে দীন নিয়ে তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনা-পর্যালোচনা করে, আর মানুষকে সে দিকে ডাকে এবং বলে যে, এগুলো আসমানী ধর্ম। তাদের কতিপয় স্পর্ধার সাথে বলে যে, ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা কাফির বলে গণ্য হবে না। এ কথাটি যা নিয়ে এসেছেন তার বিপরীত ও আল কুরআন বিরোধী এবং আমাদের জন্য অনুসরণীয় ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর আদর্শও বিরোধী। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [التوبة:23]

হে ইমানদারগণ, তোমরা নিজেদের পিতা ও ভাইদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরিকে প্রিয় মনে করে। তোমাদের মধ্য হতে যারা তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তারাই যালিম *(সূরা আত-তাওবাহ ৯:২৩)।*

ঐ সব বিতর্ককারীরা বলে, ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা আহলে কিতাব ও বিশ্বাসী। আর তাদের প্রত্যেকের ধর্ম আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। আমাদের সাথে তাদের যোগসূত্র রয়েছে। আমরা পরস্পরকে সাহায্য করতে পারি। তারা ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদেরকে কাফির মনে করে না। বর্তমানে মানুষকে এ বিষয়ের দিকে দৃঢ়তার সাথে ডাকা হয়। এ ধরণের আহবান আল্লাহর সাথে মু'মিনদের বন্ধুত্বকে ধ্বংস করে। তাই কাফির ও মু'মিনদের মাঝে কোন বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকবে না। যারা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি ঈমান আনবে না, তারা কাফির। হোক সে কিতাবী অথবা কিতাববিহীন। কেননা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রেরিত হওয়ার পর তার প্রতিই ঈমান আনয়ন করা আবশ্যক, অন্য কাউকে সমর্থন করা যাবে না। তাই তার প্রতি যে বিশ্বাস রাখে না সে কাফির। ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি বিশ্বাস রাখে না, এজন্য তারা কাফির।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

والَّذي نَفْسُ محمَّدٍ بِيَدِه لا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هذه الأُمَّةِ وَلاَ نَصرانِيٌّ، ثم يَمُوتُ ولم يُؤمِن بالذي أُرْسِلْتُ به إلا كان من أصحاب النَّار

সে সত্তার কসম, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! ইয়াহুদী হোক আর খ্রিষ্টান হোক, যে ব্যক্তি আমার রিসালাতের খবর শুনেছে অথচ আমার রিসালাতের উপর ঈমান না এনে মৃত্যু বরণ করবে, অবশ্যই সে জাহান্নামী হবে।[১০]

সুতরাং নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুয়াত প্রাপ্তির পর তার আদর্শ হতে কেউ বের হতে পারবে না। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন,

والله لو كان أخي موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي

---

১০. ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৫৩।

আল্লাহর কসম! যদি মূসা আলাইহিস সালাম বেঁচে থাকতেন তাহলে আমাকে অনুসরণ করা ছাড়া তার কোন উপায় থাকতো না।[১১]

তাই নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পর দীন ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন সঠিক দীনের অস্তিত্ব নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [آل عمران:85]

আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন চায় তবে তার কাছ থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত *(সূরা আলে-ইমরান ৩:৮৫)।*

ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের এ ধরণের আহবান বাতিল বা প্রত্যাখ্যাত। এ বাতিল দাওয়াত প্রচারের জন্য অনেক সভা সমাবেশ করা হয়ে থাকে। ধর্মসমূহকে একীভূত করার জন্য তা প্রচারের উদ্দেশে তারা অর্থসম্পদও ব্যয় করে। আর তারা তাদের বিষয়বস্তুর নামকরণ করেছে (الحوار بين الأديان) অর্থাৎ ধর্মসমূহের বিতর্ক। সুবহানাল্লাহ! ঈমান ও কুফর নিয়ে বিতর্ক! শিরক ও তাওহীদ নিয়ে বিতর্ক! আল্লাহর বন্ধুদের সাথে শত্রুদের বিতর্ক!?

অতঃপর শাইখ রহিমাহুল্লাহ বলেন, এ কারণে জিহাদকে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ} [الأنفال: 39]

আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যতক্ষণ না ফিৎনার অবসান হয় এবং দীন পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায় *(সূরা আল আনফাল ৮:৩৯)।*

---

১১. হাসান: মিশকাতুল মাসাবিহ হা/১৭৭, শুয়াবুল ঈমান, শারহুস সুন্নাহ,

কাফিরদের সাথে আমাদের আবশ্যকীয় নীতি তিনটি

প্রথম: তাদের সাথে শত্রুতা রাখা। কেননা তারা আল্লাহ ও তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শত্রু।

দ্বিতীয়: তাদেরকে ঈমান ও রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্যের দাওয়াত দেয়া। এটা মুসলিমদের উপর ওয়াজিব-আবশ্যক।

তৃতীয়: কাফিরদেরকে দাওয়াত দেয়ার পর তারা ইসলাম গ্রহণ না করলে তাদের সাথে জিহাদ করা। এ ক্ষেত্রে জিহাদ আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ} [الأنفال: 39]

তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যতক্ষণ না ফিৎনার অবসান হয় এবং দীন পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায় *(সূরা আল আনফাল ৮:৩৯)*।

মুসলিমদের শক্তি সামর্থ থাকলে তারা শেষ পর্যায়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ} [التوبة: 5]

তোমরা মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা কর এবং তাদেরকে পাকড়াও কর, তাদেরকে অবরোধ কর এবং তাদের জন্য প্রতিটি ঘাঁটিতে বসে থাক *(সূরা আত তাওবাহ ৯:৫)*।

এ আয়াতে ইসলামে জিহাদের কৌশল বর্ণনা করা হয়েছে। আর তা হলো শিরক দূরীভূত করা যতক্ষণ না ফিতনার মূলৎপাটন হয়। যে ফিতনার মাধ্যমে মুরতাদ (দীন ত্যাগ করা) হয় তা হচ্ছে শিরক। এজন্য সম্পূর্ণভাবে শিরকী ফিতনা দূরীভূত করতে হবে। আর যুদ্ধ করতে হবে যতক্ষণ না দীন পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটিই জিহাদের উদ্দেশ্য। কর্তৃত্ব গ্রহণ ও প্রভাব বিস্তার করা জিহাদের উদ্দেশ্য নয়। আর জিহাদের

মাধ্যমে ধনসম্পদ অর্জনও উদ্দেশ্য নয়, বরং উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর কালিমাকে উড্ডীন করা ও শিরকের মূলৎপাটন করা।

সুতরাং কাউকে প্রতিহত করা ইসলামে জিহাদের উদ্দেশ্য নয়। যেমন কতিপয় জ্ঞানপাপী বলেন, প্রতিহত করার জন্যই দীন ইসলাম সাব্যস্ত। অর্থাৎ তারা যখন আমাদের সাথে বাড়াবাড়ি করবে তখন তাদের শত্রুতা রুখে দেয়ার জন্য কেবল যুদ্ধ করবো। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: 5]

তোমরা মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা কর *(সূরা আত তাওবাহ ৯:৫)।* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ} [الأنفال: 39]

আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যতক্ষণ না ফিৎনার অবসান হয় এবং দীন পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায় *(সূরা আল আনফাল ৮:৩৯)।*

ইসলামে দাওয়াত-প্রচার (نشر الدعوة) ও দীনের প্রসারতা (نشر الدين) এবং শিরকের মূলৎপাটন (إزالة الشرك) করাই যুদ্ধের উদ্দেশ্য। সূরা আনফালের উপরোক্ত (৮:৩৯) আয়াত থেকে উক্ত উদ্দেশ্য সাব্যস্ত হয়।

ইসলামে যুদ্ধ দু'প্রকার:

(১) প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ যা মুসলিমদের নিরুপায় অবস্থায় প্রযোজ্য

(২) প্রভাব বিস্তারমূলক যা মুসলিমদের শক্তি সামর্থ থাকলে প্রযোজ্য হয়।

২. জাহিল সম্প্রদায় তাদের ইবাদত ও দীনের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ নয়

জাহিল সম্প্রদায় তাদের দীনের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি করেছে। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} [الروم: 32]

প্রত্যেক দলই নিজেদের যা আছে তা নিয়ে আনন্দিত *(সূরা আর রূম ৩০:৩২)।*

অনুরূপভাবে তারা দুনিয়ার ব্যাপারেও পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। তারা মনে করতো, এধরণের কর্মকান্ডই সঠিক। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে দীনে একতাবদ্ধ থাকার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ} [الشورى: 13]

তিনি তোমাদের জন্য দীন বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন যে নির্দেশ তিনি নূহকে দিয়েছিলেন, আর যা আমি তোমার কাছে ওহী পাঠিয়েছি এবং ইব্রাহিম, মূসা ও ঈসাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলাম তা হলো: তোমরা দীন কায়েম করবে এবং এতে বিছিন্ন হবে না *(সূরা আশ শূরা ৪২:১৩)।* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ} [الأنعام: 159]

নিশ্চয় যারা তাদের দীনকে বিচ্ছিন্ন করেছে এবং দল-উপদলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের কোন ব্যাপারে তোমার দায়িত্ব নেই *(সূরা আল আন'আম ৬:১৫৯)।*

আল্লাহ তা'আলা তাদের অনুকরণ করতে নিষেধ করে বলেন,

وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ} [آل عمران: 105]

আর তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা বিভক্ত হয়েছে এবং মতবিরোধ করেছে তাদের নিকট স্পষ্ট নির্দশনসমূহ আসার পর। আর তাদের জন্যই রয়েছে কঠোর আযাব *(সূরা আলে ইমরান ৩:১০৫)।*

দুনিয়ায় বিভক্তি সৃষ্টি করা থেকে তিনি আমাদেরকে নিষেধ করে বলেন:

{وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا} [آل عمران: 103]

আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং বিভক্ত হয়ো না *(সূরা আলে ইমরান ৩:১০৩)।*

....

ব্যাখ্যা: এ দ্বিতীয় প্রকার বিষয়ের ব্যাপারে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাহিলদের বিরোধিতা করেন। দীন ও দুনিয়া উভয় ব্যাপারে জাহিলরা বিভক্তি সৃষ্টি করে। তাদের স্বভাবই ছিল অনৈক্য থাকা ও বিভক্ত হওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} [الروم: 31،32]

আর মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। যারা নিজেদের দীনকে বিভক্ত করেছে এবং যারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে (তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না)। প্রত্যেক দলই নিজেদের যা আছে তা নিয়ে আনন্দিত *(সূরা আর রূম ৩০:৩১-৩২)।*

এটা ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান ও মূর্তিপূজক জাহিলদের বৈশিষ্ট্য। সমস্ত জাহিলী দল এভাবে তাদের দীনের বিভক্তি ঘটায়। প্রত্যেকের স্বকীয় দীন ছিল, যার দিকে তারা ডাকতো ও আর ঐ দীনে সম্পৃক্ত হতো। খ্রিষ্টানরা তাদের খ্রিষ্টীয় ধর্মের দিকে আহবান জানায় ও ইয়াহুদীরা তাদের ইহুদী ধর্মের দিকে ডাকে। তারা প্রত্যেকে অন্যের দীনকে অস্বীকার করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ} [البقرة: 113]

আর ইয়াহূদীরা বলে, নাসারাদের কোন ভিত্তি নেই এবং নাসারারা বলে ইয়াহূদীদের কোন ভিত্তি নেই। অথচ তারা কিতাব পাঠ করে। এভাবেই, যারা কিছু জানে না, তারা তাদের কথার মত কথা বলে *(সূরা আল বাক্বারাহ ২:১১৩)।*

যারা (দীন সম্পর্কে) জানে না তারা মুশরিক। কেননা তাদের কোন কিতাব নেই, আর আসমানী কোন দীনও নেই। তারা পরস্পরকে কাফির বলে আখ্যা দেয় এবং পরস্পরে বিরোধিতায় লিপ্ত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ} [البقرة: 113]

সুতরাং আল্লাহ কিয়ামত দিবসে যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করত সে বিষয়ে তাদের মধ্যে ফায়সালা করবেন *(সূরা আল বাক্বারাহ ২:১১৩)।*

আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন কে হক্বের উপর এবং কে বাতিলের উপর রয়েছে। আল্লাহ তা'আলার দীন একটিই। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات:56]

আর আমি জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে তারা আমার 'ইবাদত করবে *(সূরা আয যারিয়াত ৫১:৫৬)* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة:21]

হে মানুষ, তোমরা তোমাদের রবের ইবাদাত কর, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তাদেরকে, যাতে তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর *(সূরা আল বাক্বারাহ ২:২১)।*

ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান, মূর্তিপূজক, আরব জাতি ও অনারব জাতি সকল সৃষ্টির জন্য দীন একটিই। ইবাদত একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যই নির্ধারিত, যার কোন শরীক নেই। ঐ সব জাহিলরা তাদের দীনকে বিভক্ত করে। তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে একদল অপরের দীনের বিরোধিতা করে। ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা নিজেদের মাঝে মতবিরোধে লিপ্ত হয় তারা সবাই ভিন্ন ভিন্ন মতে বিভক্ত, এমনকি বর্তমানেও তারা মতবিরোধের উপর প্রতিষ্ঠিত।

অনুরূপভাবে আরবের মূর্তিপূজকরাও তাদের ইবাদতে মতোপার্থক্য সৃষ্টি করে। তাদের মধ্যে কেউ সূর্য ও চন্দ্রপূজা করে, আবার কেউ করে মূর্তিপূজা, কেউ ফেরেস্তা, আওলীয়া ও নেক লোকদের পূজা করে এবং কেউ গাছ ও পাথর পূজা করে, এটাই কিতাবী (কিতাব প্রাপ্ত) ও উম্মি (নিরক্ষর) জাহিলদের অবস্থা। তাদের দীন তাদেরকে একীভূত করতে পারেনি। তাদের অনেক দল রয়েছে। আল্লাহর তা'আলার বাণী,

{ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} [الروم: 32]

প্রত্যেক দলই নিজেদের যা আছে তা নিয়ে আনন্দিত *(সূরা আর রূম ৩০:৩২)।*

এটা তাদের শাস্তি ও পরীক্ষা। মানুষ যে বাতিলের উপর রয়েছে তা নিয়েই সে আন্দবোধ করে। মানুষের উপর আবশ্যক এর বিপরীত অবস্থানে থাকা। মানুষের উচিত ভ্রষ্টতাকে এড়িয়ে চলা, সঠিক দীন থেকে বিমুখ না হওয়া ও ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে শঙ্কিত থাকা। কিন্তু তারা এগুলোর বিপরীত কাজ করে। আল্লাহ তা'আলার বাণী,

{ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} [الروم: 32]

প্রত্যেক দলই নিজেদের যা আছে তা নিয়ে আনন্দিত *(সূরা আর রূম ৩০:৩২)।*

মানুষ চিন্তাই করে না সে কি হক্বের উপর আছে নাকি বাতিলের উপর। বাপদাদা, পূর্ব-পুরুষ, আত্নীয়-স্বজন ও জাতি গোত্রের রীতিনীতিই যেন তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাতিল নিয়েই তারা আনন্দিত, এটাই তাদের শাস্তি। যখন মানুষ এভাবে আনন্দবোধ করে তখন সে এ থেকে

মুখ ফিরাতে পারে না। এটা জাহিলদের স্বভাব। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ থেকে নিষেধ করে বলেন,

{وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً} [الروم: 31–32]

আর মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। যারা নিজেদের দীনকে বিভক্ত করেছে এবং যারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে (তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না) *(সূরা আর রূম ৩০: ৩১-৩২)।* আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} [الأنعام:159]

নিশ্চয় যারা তাদের দীনকে বিচ্ছিন্ন করেছে এবং দল-উপদলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের কোন ব্যাপারে তোমার দায়িত্ব নেই। তাদের বিষয়টি তো আল্লাহর নিকট। অতঃপর তারা যা করত, তিনি তাদেরকে সে বিষয়ে অবগত করবেন *(সূরা আল আন'আম ৬:১৬৯)।*

তিনি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর আয়াত নাযিল করে বলেন,

{ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ} [الشورى: 13]

তিনি তোমাদের জন্য দীন বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন যে নির্দেশ তিনি নূহকে দিয়েছিলেন, আর যা আমি তোমার কাছে ওহী পাঠিয়েছি এবং ইব্রাহিম, মূসা ও ঈসাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলাম- তা হল: তোমরা দীন কায়েম করবে এবং এতে বিচ্ছিন্ন হবে না। *(সূরা আশ শূরা ৪২:১৩)*

দীন প্রতিষ্ঠা করাকে আল্লাহ তা'আলা বিধিবদ্ধ করেছেন, যা নূহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা আলাইহিমুস সালাম এবং মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহ সকল নাবী রসূলগণের দায়িত্ব ছিল। এ সকল নাবী রসূলগণের নাম উল্লেখের কারণ হলো তারা অধিক মর্যাদাসম্পন্ন ও

দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী ছিলেন। পাঁচজন নাবী হলেন: নূহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা আলাইহিমুস সালাম ও মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম যারা রসূলগণের মধ্যে সর্বোত্তম, আল্লাহ তা'আলা তাদের মনোনিত করেছেন। সকল নাবী রসূলগণের নিকট থেকে আল্লাহ তা'আলা ওয়াদা গ্রহণ করেন, এ পাঁচজন তাদের মধ্যে অন্যতম। তাদের নিকট থেকে আল্লাহ তা'আলা অঙ্গিকার গ্রহণ করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً} [الأحزاب:7]

আর স্মরণ কর, যখন আমি অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম নাবীদের থেকে এবং তোমার থেকে, নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও মারইয়াম পুত্র ঈসা থেকে। আর আমি তাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম। *(সূরা আল আহযাব ৩৩:৭)*

সমস্ত নাবী-রসূলগণের দীন এক। তাহলো একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করা যার কোন শরীক নেই। সাধারণভাবে তা ছিল সকল রসূলের দীন, বিশেষতঃ ঐ পাঁচজনের। এব্যাপারে কোন মতানৈক্য ও মতপার্থক্য গ্রহণযোগ্য নয়। এ দীন এককভাবে কোন নাবীর নয়, কোন জাতিরও নয়। বরং সকলের দীন এক। সকল সৃষ্টির উপরই আল্লাহ তা'আলার একক দীন সাব্যস্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات:56]

আর আমি জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে তারা আমার ইবাদত করবে' *(সূরা আয যারিয়াত ৫১:৫৬)*।

সকল সৃষ্টি বলতে জিন ও মানব জাতি উদ্দেশ্য, তাদের দীন এক হওয়ার আবশ্যকতা প্রমাণিত হয়। আর তা হলো তাওহীদ। যাতে ইবাদতের মাধ্যমে মহান আল্লাহর একত্ব প্রকাশ করা হয়। রসূলগণের ভাষায় মানুষের জন্য স্পষ্টভাবে ইবাদতের পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়। আল্লাহ তা'আলা মানুষের নিকট নাবী-রসূল প্রেরণ করে তাদের উপর কিতাব নাযিল করেন। আর বলা হয় এটাই দীন ও এটাই ইবাদত, এটাই

সমন্বয়সাধন ও দীনের সমাপ্তি। মানুষের অধিকার নেই যে, তারা দীন তৈরি করে নিজেদের জন্য তা বিধিবদ্ধ করে নিবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى: 21]

নাকি তাদের জন্য এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদের জন্য দীনের বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেন নি? *(সূরা আশ শূরা ৪২:২১)*।

এটা আল্লাহ তা'আলাকে অস্বীকার করা বুঝায়। আল্লাহ তা'আলা যা তাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন তা পালন করা তাদের উপর আবশ্যক। তার কিতাব সমূহে ও রসূলগণের ভাষায় আল্লাহ তা'আলা দীনের বর্ণনা দিয়েছেন, দীনের সমাপ্তি টেনেছেন। আর রসূলগণ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে দীনের প্রচারক। বান্দার জন্য আল্লাহ তা'আলা যা বিধিবদ্ধ করেছেন তারা তা প্রচার করতেন। এটা ছিল রসূলগণের দায়িত্ব। দীনের পদ্ধতি অনুসারে তারা ইবাদত করতেন। জাতির জন্য নির্ধারিত দীনের বিধিবদ্ধ নিয়মানুসারে আল্লাহর বান্দারা তার ইবাদত করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [آل عمران: 105]

আর তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা বিভক্ত হয়েছে এবং মতবিরোধ করেছে তাদের নিকট স্পষ্ট নির্দশনসমূহ আসার পর। আর তাদের জন্যই রয়েছে কঠোর আযাব *(সূরা আলে-ইমরান ৩:১০৫)*।

জাহিলদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা আমাদের জন্য নিষিদ্ধ। তাদের দীনে তারা বিভক্তি ও মতপার্থক্য সৃষ্টি করেছে। এটা তাদের অজ্ঞতার কারণে হয়নি বরং তাদের কুপ্রবৃত্তির কারণে তা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ}

তাদের নিকট স্পষ্ট নির্দশনসমূহ আসার পর *(সূরা আলে ইমরান ৩:১০৫)*

তারা স্পষ্ট দলীল পরিত্যাগ করে কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে। তাদের বিভক্তির মূল কারণ কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ। (নাউযুবিল্লাহ) তারা আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত নিজেদের কু-প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকের জন্য প্রমাণ পেশ করেছেন। তিনি রসূলগণকে প্রেরণ করে কিতাবসমূহ নাযিল করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: 38،39]

আমি বললাম, তোমরা সবাই তা থেকে নেমে যাও। অতঃপর যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে কোন হিদায়াত আসবে, তখন যারা আমার হিদায়াত অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না *(সূরা আল বাক্বারাহ ৩:৩৮-৩৯)*।

আল্লাহ তা'আলা আদম আলাইহিস সালাম কে পৃথিবীতে পাঠানোর পর হতে মানুষের জন্য তিনি দীন নির্ধারণ করেছেন। তিনি মানুষকে নাবী ও দীনবিহীনভাবে পৃথিবীতে পাঠাননি বরং তিনি ধারাবাহিক্বভাবে রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। আর মানুষের জন্য তিনি দীনকে বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন এবং তা স্পষ্টভাবে তাদের জন্য বর্ণনা করেছেন। আর সর্বশেষ নাবী মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে দীন ইসলাম দেয়া হয়েছে যা কিয়ামত অবধি চালু থাকবে, তা রহিত হবে না। আর এ দীনের মাপকাঠি হলো কুরআন ও সুন্নাহ। সবযুগেই রসূলগণ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে দীন নিয়ে এসেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلا فِيهَا نَذِيرٌ} [فاطر: 24]

আর এমন কোন জাতি নেই যার কাছে সতর্ককারী আসেনি *(সূরা ফাতির ৩৫:২৪)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ} [النساء: 165]

আর (পাঠিয়েছি) রসূলগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, যাতে আল্লাহর বিপক্ষে রসূলগণের পর মানুষের জন্য কোন অজুহাত না থাকে *(সূরা আন নিসা ৪:১৬৫)।*

সুতরাং সকলেই দলীল নিয়ে এসেছেন। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ} [المائدة: 19]

যেন তোমরা না বল যে, আমাদের নিকট কোন সুসংবাদদাতা কিংবা সতর্ককারী আসেনি। অবশ্যই তোমাদের নিকট সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী এসেছে। আর আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান *(সূরা আল মায়িদা ৫:১৯)।*

আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির উপর দলীল বহাল রাখেন। কিন্তু রসূলগণ যা নিয়ে আসেন জাহিলরা জেনে-বুঝে হঠকারিতা ও কু-প্রবৃত্তির অনুসরণের কারণে রসূলগণের বিরোধিতা করে। বিশেষত ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা রিসালাত সম্পর্কে জানতো। এজন্য তাদের নামকরণ করা হয়েছে আহলুল ইলম বা আহলে কিতাব। তারা অপরাধী, কারণ তারা আহলে কিতাব এবং আহলুল ইলম অর্থাৎ রিসালাত সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের বিরোধিতা ও কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আল্লাহ তা'আলা উম্মতকে জাহিলদের রীতিনীতি ধারণ করতে নিষেধ করেছেন। বরং রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর অর্পিত দীন আঁকড়ে ধরতে তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ছাহাবীগণ ও খুলাফায়ে রাশিদীন যার উপর পরিচালিত সেটাই হলো দীন, যা কিয়ামত অবধি আঁকড়ে ধরা উম্মতের উপর ওয়াজীব। যদি তাতে কোন মতভেদ দেখা দেয় তাহলে কিতাব ও সুন্নাহর দিকে তাদের প্রত্যাবর্তন করা ওয়াজীব-আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [النساء:59]

অতঃপর কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ্ ও রসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন কর যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর *(সূরা আন নিসা ৪:৫৯)।*

মতানৈক্য করা মানুষের স্বভাব। কিন্তু যখন মতানৈক্য দেখা দিবে আর আমরা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনিত হতে পারবো না তখন আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কিতাব ও সুন্নাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে বলেছেন। যার কাছে কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক দলীল পাওয়া যাবে তার নিকট থেকে তা গ্রহণ করতে হবে। আর কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী হলে তা পরিত্যাগ করতে হবে। কেননা আমাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য হলো হকের অনুসরণ করা। রায় বা সিদ্ধান্ত সমর্থন করা অথবা বাপদাদা, পূর্বপুরুষ ও ব্যক্তি প্রধানদের রীতিকে সম্মান দেখানো মুসলিমদের উদ্দেশ্য নয়। এটা মুসলিমদের কাজ হতে পারে না। হক্ব গ্রহণ করাই মু'মিনের উদ্দেশ্য। হক্ব যেখানেই পাওয়া যাবে তা গ্রহণ করবে, কারণ হক্বই মূল উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ} [النساء:59]

যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ। এটি উত্তম *(সূরা আন নিসা ৪:৫৯)।* আমাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহর দিকে যেতে হবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} [النساء:59]

এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর *(সূরা আন নিসা ৪:৫৯)।* অর্থাৎ এটা পরিনামে উৎকৃষ্টতর। দীন আল্লাহ তা'আলার রহমত। আল্লাহ তা'আলা আমাদের মাঝে তার বিধান দিয়েছেন যা হক্ব বলে প্রমাণিত। আর তা হলো তার কিতাব-আল কুরআন। এজন্য তিনি বলেন,

{وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ} [آل عمران: 103]

আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং বিভক্ত হয়ো না *(সূরা আলে-ইমরান ৩:১০৩)।*

এখানে (بِحَبْلِ اللَّهِ) বলতে আল-কুরআন উদ্দেশ্য। আর (جَمِيعاً) এর অর্থ হলো সকলেই, কতিপয় নয়। ব্যাপক অর্থে সব সৃষ্টি তথা মানব ও জিন জাতি উভয় উদ্দেশ্য। বিশেষতঃ এ উম্মতকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا} [آل عمران: 103]

তোমরা বিভক্ত হয়ো না। আর তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহর নিয়ামতকে স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পরে শত্রুছিলে। তারপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভালবাসার সঞ্চার করেছেন। অতঃপর তার অনুগ্রহে তোমরা হয়ে গেলে ভাই-ভাই। আর তোমরা ছিলে আগুনের গর্তের কিনারায়, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছেন *(সূরা আলে-ইমরান ৩:১০৩)।*

{شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ} এখানে জাহিলী দীনকে বুঝানো হয়েছে।

{فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا} [آل عمران: 103] এ আয়াতাংশ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে,

আল্লাহ তা'আলা ইসলামের মাধ্যমে আমাদের মুক্তির পথ উম্মুক্ত করেছেন। আর তা হচ্ছে আল-কুরআন। তাই তার নে'আমতের শুকরিয়া আদায় করতে হবে এবং তার রজ্জু আল কুরআনকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে। কেননা কিতাব হলো আল্লাহর প্রসারিত রজ্জু। যে তা শক্তভাবে আঁকড়ে ধরবে সে মুক্তি পাবে। আর যে তা ছেড়ে দিবে সে ধ্বংস হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের কাছে জাহিলদের অবস্থার কাহিনী বর্ণনা করে বলেন:

{فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} [الروم: 32]

যারা নিজেদের দীনকে বিভক্ত করেছে এবং যারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে (তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না)। প্রত্যেক দলই নিজেদের যা আছে তা নিয়ে আনন্দিত *(সূরা আর রূম ৩০:৩২)।*

জাহিলী কর্ম কান্ড ও জাহিলদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা থেকে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে নিষেধ করেছেন। অতঃপর তিনি আমাদেরকে তার কিতাব আঁকড়ে ধরতে নির্দেশ দেন, যা মতভেদ, ধ্বংস ও বিতর্ক থেকে নিরাপদ। আল্লাহর কিতাব ও রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত শক্তভাবে ধারণ করা ছাড়া কোন মুক্তি নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا} [آل عمران: 103]

আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং বিভক্ত হয়ো না *(সূরা আলে-ইমরান ৩:১০৩)।*

জাহিলরা তাদের দীনে মতভেদ সৃষ্টিকারী হিসাবে গণ্য। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} [الروم: 32]

প্রত্যেক দলই নিজেদের যা আছে তা নিয়ে আনন্দিত *(সূরা আর রূম ৩০:৩২)।*

তাদের মতভেদ বাতিল হওয়া সত্বেও তা নিয়ে তারা আনন্দিত হয়। এরূপভাবে তারা দুনিয়া নিয়েও মতপার্থক্য সৃষ্টি করে। কেননা দীন বিনষ্ট হওয়ায় দুনিয়াও নষ্ট হয়। দুনিয়া নিয়ে মতপার্থক্যের কারণে তারা জামা'আতবদ্ধ হতে পারে না। বরং প্রত্যেক গোত্র নিজ নিজ শাসন কর্তৃত্বের উপর বহাল থাকে। আর প্রত্যেক গোত্র অন্য গোত্রের লোকদের জীবন ও ধনসম্পদের উপর জবরদস্তি করে। এটা হলো নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে আরবদের অবস্থা। তারা তাদের দীন ধ্বংসের মাধ্যমে দুনিয়া ধ্বংস করে। ভীতি, উৎকণ্ঠা ও দারিদ্রতা তাদের জন্য স্থায়ী হয়ে যায়। জাহিলদের প্রত্যেকেই যুদ্ধবাজ। তাদের প্রত্যেকেই অপরকে আক্রমণ ও অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

জাহিলী যুগে ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ হতো। যেমন মদিনার আউস ও খাযরাজ গোত্র বংশগত দিক থেকে ভাই ভাই সম্পর্ক। তারা কাহতান নামক একই গোত্রীয় লোক ছিল। কিন্তু তাদের মাঝে এক ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যা একশত বছরের অধিক সময় ধরে চলতে থাকে। আউস ও খাযরাজ গোত্রের মাঝে সংঘটিত এ যুদ্ধের নাম দেয়া হয়েছে (حرب بعاث) হারবুন বুআ'ছ।

ইয়াহুদীরা অগ্নিপূজা করতো। আল্লাহ তা'আলা তার নাবী মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রেরণ করেন। তিনি মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন। তার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে জামা'আতবদ্ধ করেন। যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ হলো, মুসলিমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেল, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে তারা একতাবদ্ধ হয়। তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার এ অনুগ্রহ তার রসূলের মাধ্যমে স্বরণ করিয়ে দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا} [آل عمران: 103]

আর তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহর নিয়ামতকে স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পরে শত্রুছিলে। তারপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভালবাসার সঞ্চার করেছেন। অতঃপর তার অনুগ্রহে তোমরা হয়ে গেলে ভাই-ভাই *(সূরা আলে-ইমরান ৩:১০৩)*।

ইসলামের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাদের মাঝে আন্তরিকতা সৃষ্টি করে দেন। তাদের মাঝে যুদ্ধ-বিগ্রহ থেমে যায়। তারা ও আরবের অন্যান্য গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করলে দুনিয়া শান্তিময় হয়ে যায়। তারা জীবন ও ধনসম্পদের নিরাপত্তা লাভ করে, জমিনে নিরাপদে চলাফেরা করে। আরবের একগোত্র অন্যগোত্রের সাথে মিশে যায়, কেউ অনিষ্টের আশ্রয় নিতো না। তাদের মাঝে ভালবাসার বন্ধন সৃষ্টি হয় এবং তারা পরস্পর দীনি ভাই হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলে,

{إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ} [الأنعام: 159]

নিশ্চয় যারা তাদের দীনকে বিচ্ছিন্ন করেছে এবং দল-উপদলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের কোন ব্যাপারে তোমার দায়িত্ব নেই *(সূরা আল আন'আম ৬:১৬৯)।*

যারা তাদের দীনে বিভক্তি সৃষ্টি করে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয় তারা দীন বহির্ভূত। কেননা দীন একটিই। আর দীনের উপর মানুষের জামা'আতও একটি। আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়েরই নির্দেশ দিয়েছেন। যিনি এ নির্দেশ মেনে চলবেন তিনি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সমর্থন লাভ করবেন ও তার বন্ধু হবেন। আর যে দীনের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি করে সে বিশৃঙ্খলা ও জাহিলী কর্মের উপরই টিকে থাকে। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার থেকে মুক্ত।

ফিক্বহী মাস'আলায় মতানৈক্য অথবা বিরোধপূর্ণ বিষয়ে আমাদের করণীয়। কারণ ফিক্বহী বিষয়ে মতানৈক্য বর্তমানেও চালু আছে, এটা কি নিকৃষ্ট হিসাবে গণ্য?

জবাব হলো, মতভেদ দু'প্রকার:

প্রথমত: দীনি বিষয়ে মতভেদ। যেমন ইবাদত ও আক্বীদায় মতানৈক্য। এধরণের মতানৈক্য নিকৃষ্ট ও হারাম। কেননা দীনে (ইবাদত ও আক্বীদায়) ইজতিহাদ করার কোন অবকাশ নেই, রায় বা সিদ্ধান্ত দেয়ারও কোন সুযোগ নেই। বরং দীন ও আক্বীদা পরিপূর্ণ। এ বিষয়ে ইজতিহাদ (গবেষণা) করার কোন বিধান নেই।

আল্লাহ তা'আলা দীন ও আক্বীদা হিসাবে যা কিছু আমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন, রায় ও ইজতিহাদ ছাড়াই তা আঁকড়ে ধরা আমাদের উপর ওয়াজীব-আবশ্যক। আর ইবাদতও পরিপূর্ণ। যে বিষয়ে দলীল রয়েছে তা আমাদেরকে জানতে হবে। আর যে বিষয়ে দলীল পাওয়া যায় না তা বিদ'আত বলে গণ্য, যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। যেমন হাদীসে বর্ণিত আছে,

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

যে আমাদের দীনে এমন নতুন কিছু আবিষ্কার করলো যা দীন নয় তা প্রত্যাখ্যাত।[১২] অন্য হাদীসে এসেছে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار

তোমরা নতুন কিছু আবিষ্কার করা হতে বিরত থাক। কেননা প্রত্যেক নতুনত্ব বিদ'আত। আর প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা। প্রত্যেক ভ্রষ্টতা জাহান্নামের কারণ।[১৩]

সাধারণভাবে আক্বীদা, ইবাদত ও দীনি বিষয়ে কখনো মতানৈক্যের কোন সুযোগ নেই। একমাত্র কুরআন ও সুন্নাহর বিধি-বিধান ও সালাফদের পদ্ধতিই অনুসরণীয়।

দ্বিতীয়ঃ রায় (সিদ্ধান্ত) এর ক্ষেত্রে মতানৈক্য করার সুযোগ আছে অথবা ফিক্বহী মাস'আলায় ইজতিহাদী ব্যাখ্যার বিষয়ে ও দলীলের ভিত্তিতে বিধান উদ্ঘাটন করার ক্ষেত্রে মতানৈক্য করার সুযোগ আছে। কেননা মানুষকে বুঝানোর ক্ষেত্রে বিধান উদ্ঘাটনে ভিন্নতা আসতে পারে। আর ইজমার মাস'আলা সমূহ সীমাবদ্ধ, তাতে মতানৈক্য বৈধ নয়। যে সব ইজতিহাদী মাস'আলায় ইজমা হয়নি, সে বিষয়ে ইজতিহাদ করার সুযোগ আছে। প্রত্যেক বিদ্বানকে আল্লাহ তা'আলা উপযোগী জ্ঞান ও বুঝ দান করেন, যাতে তারা দলীল উদ্ঘাটন করতে পারে। এক্ষেত্রে ইজতিহাদ শরী'আত সম্মত।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে যে ইজতিহাদ হতো তা ছিল কল্যাণকর। এসব ইজতিহাদী বিষয়ে মতানৈক্য হয়। তবে দীন ও আক্বীদাগত বিষয়ে কোন মতভেদ নেই। আর ফিক্বহী মাসআলায় মতানৈক্য ঘটেই থাকে। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে ছাহাবীরা ইজতিহাদ করতেন আর তাতে মতানৈক্য হতো।

---

১২. ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৭১৮।

১৩. ছ্বহীহ: সুনানে নাসাঈ হা/১৫৭৭, সুনানে আবূ দাউদ হা/৪৬০৭, ইবনে মাজাহ হা/৪২, তিরমিযী হা/২৬৮১।

ইজতিহাদ (গবেষণা) দু'প্রকার:

প্রথম: ভিন্নমতের দু'দলের কোন একটির নিকট স্পষ্ট দলীল থাকলে দলীলসহ ঐ মতামত গ্রহণ আবশ্যক। আর এক্ষেত্রে দলীলবিহীন মতামত পরিত্যাজ্য। ফকীহগণের রায় (সিদ্ধান্ত) দলীল ভিত্তিক পেশ করা হয়। তাই যে বিষয়ে দলীল পাওয়া যাবে তা গ্রহণ করা আবশ্যক নচেৎ তা পরিত্যাগ করতে হবে। সঠিক সিদ্ধান্ত না হলে ও দলীলের অনুপস্থিতিতে হক্বকে গ্রহণ করা ও সঠিক বিষয়ের দিকে ফিরে আসা মুজতাহিদগণের উপর আবশ্যক। ভুল ইজতিহাদে বহাল থাকা মুজতাহিদ (গবেষক) এর জন্য বৈধ নয়। আর ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাও মানুষের জন্য বৈধ নয়। সম্মানিত ইমামগণ এ বিষয়ে আমাদেরকে উপদেশ দিয়ে বলেন,

(اعرضوا أقوالنا على الكتاب والسنة)

অর্থাৎ তোমরা আমাদের কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী কথা পরিত্যাগ করবে।

ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ বলেন,

إذا جاء الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء الحديث عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وإذا جاء الحديث عن التابعين فنحن رجال وهم رجال

যখন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কোন হাদীছ পাবে তার উপরই অটল থাকবে। আর ছাহাবীদের থেকে হাদীছ পেলে তার উপর বহাল থাকবে। আর তাবিয়ীনদের থেকে হাদীছ পাওয়া গেলে এ ক্ষেত্রে (সঠিক ও ভুল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে) কারণ তারা ও আমরা উভয়ই মানুষ। এটা ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ কথা যিনি সম্মানিত চার ইমামের একজন।

অনুরূপভাবে ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহ বলেন, এ কবর বাসী অর্থাৎ রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যাখ্যানকারী ও প্রত্যাখ্যাত। তিনি আরোও বলেন,

একজন অপরজন থেকে বেশি বিতর্ককারী আমাদের নিকট আসে। মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট জিবরাঈল আলাইহিস সালাম যা নিয়ে এসেছেন ঐসব বিতর্ককারীদের তর্কের কারণে আমরা কি তা পরিত্যাগ করতে পারি!? এটা ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহ এর কথা। তিনি আরোও বলেন,

প্রথম শ্রেষ্টতর ব্যতীত এই উম্মাতের অন্য কোন শ্রেষ্টতর নেই। এখানে প্রথম শ্রেষ্টতর কি? উত্তর হলো কুরআন ও সুন্নাহ। এটা ইমাম মালিক রহিমাহুল্লাহ এর কথা। ইমাম শাফিয়ী রহিমাহুল্লাহ বলেন,

মুসলিমদের ঐকমত্যে যার নিকট রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত স্পষ্ট হবে, এক্ষেত্রে অন্যের কথা সে গ্রহণ করবে না। তিনি আরোও বলেন: আমার কথা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথার বিরোধী হলে আমার কথা ধিক্কারের সাথে বর্জন করবে। তিনি আরোও বলেন, যখন কোন ছ্বহীহ হাদীছ পাওয়া যাবে সেটাই হবে আমার মাযহাব। এটা ইমাম শাফিয়ী রহিমাহুল্লাহ এর কথা।[১৪]

ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি এমন সম্প্রদায়ের ব্যাপারে আশ্চার্যবোধ করি, যারা সনদের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও সুফইয়ানের রায়কে গ্রহণ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}
[النور: 63]

অতএব যারা তার নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা যেন তাদের ওপর বিপর্যয় নেমে আসা অথবা যন্ত্রণাদায়ক আযাব পৌঁছার ভয় করে (*সূরা আন নূর ২৪:৬৩*)।

তুমি কি জান ফিতনা কি? ফিতনা হলো শিরক। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোন কথা প্রত্যাখ্যান করলে অন্তরে সংশয় সৃষ্টি হবে যা ধ্বংসকর।

---

১৪. সীয়ারু আলামিন নুবালা ১০/৩৪-৩৫

আশ্চর্যজনক! এগুলো মুজতাহিদ (দীনি গবেষক) ইমামগণের কথা। তারা তাদের জ্ঞান ও যোগ্যতার মাধ্যমে ইজতিহাদ (গবেষণা) করেন। কিন্তু তারা কখনো নিজেদেরকে ত্রুটিমুক্ত দাবি করেননি। বরং তাদের দলীল ভিত্তিক কথাকে গ্রহণ করার উপদেশ দেন। শাফিয়ী মাযহাবের স্পষ্ট দলীল পাওয়া গেলে তা গ্রহণ করা হাম্বলী মাযহাবের অনুসারীদের উপর আবশ্যক। আর হানাফী মাযহাবের স্পষ্ট দলীল পাওয়া গেলে তা গ্রহণ করা শাফিয়ীদের উপর আবশ্যক। অনুরূপভাবে মালিকীরাও হাম্বলী মাযহাবের স্পষ্ট দলীল গ্রহণ করবে। কারণ দলীল গ্রহণ করাই মূল উদ্দেশ্য। কারও অনুসরণ করা উদ্দেশ্য নয়। ইমামদের পক্ষপাতিত্ব করা যাবে না। কেবলমাত্র দলীলের পক্ষপাতিত্ব করা হবে।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া, ইমাম ইবনুল কাইয়ুম ও মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাবসহ প্রত্যেকেই এ বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে বলেন,

انظروا في أقوال العلماء، فخذوا ما قام عليه الدليل

আলেমদের কথা যাচাই কর এবং দলীল ভিত্তিক কথা গ্রহণ কর।

তাদের কিতাবাদী থেকে এ কথাগুলোই জানা যায়। এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের মাযহাব। যাতে কোন পক্ষপাতিত্ব নেই। কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে, মাযহাবসমূহ বর্জন ও পরিত্যাগ করতে হবে। বরং মাযহাবসমূহ ও ইমামগণের ফিকহ থেকে আমরা উপকার গ্রহণ করবো। কারণ এগুলো আমাদের জন্য বৃহত্তর সম্পদ। তবে আমরা দলীল অনুসরণ করবো। যার নিকট দলীল থাকবে আমাদেরকে তার কথা গ্রহণ করতে হবে। এটাই আবশ্যক। যিনি দলীল জানেন না তিনি আহলুল ইলম (**أهل العلم**) বিদ্বানদের নিকট থেকে জেনে নিবেন। কারণ আল্লাহ বলেন:

{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43]

আর আমি তোমার পূর্বে কেবল পুরুষদেরকেই রসূল হিসাবে প্রেরণ করেছি, যাদের প্রতি আমি ওহী পাঠিয়েছি। সুতরাং জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা কর, যদি তোমরা না জেনে থাক (*সূরা আন নাহাল ১৬:৪৩*)।

কেননা তাতে দায়িত্ব মুক্ত হবে। তুমি যদি জানো তো আলহামদুলিল্লাহ। দলীল গ্রহণ করো। আর যদি না জানা যায় তবে বিদ্বানদের জিজ্ঞেস করা ওয়াজীব।

দ্বিতীয়: ফিক্বহী ইজতেহাদে দু'টি মতের উভয়টির ব্যাপারে স্পষ্ট কোন দলীল নেই, দু'টি মতই সম্ভাব্য। তাই দলীল না পাওয়ায় ইজতিহাদী মাস'আলা প্রত্যাখ্যান করা যায় না। ফলে ভিন্ন মতের কোন একটি মত গ্রহণ করাতে কোন অসুবিধা নেই। এক্ষেত্রে শর্ত হলো এটা যেন নিছক পক্ষপাতিত্ব অথবা কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ না হয়। হক্ব গ্রহণ করাই যেন উদ্দেশ্য হয়। এজন্য হাম্বলীরা শাফিয়ীদেরকে এবং শাফিঈরা মালিকীদের প্রত্যাখ্যান করবে না। আর চার ইমাম ও তাদের অনুসারীরা যুগযুগ ধরে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। সকল প্রশংসা আল্লাহরই, তাদের মাঝে কোন শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয় না। যদিও কোন বিষয়ে এরূপ ঘটে, তবে তা কতিপয় অজ্ঞদের পক্ষপাতিত্বের কারণেই হয়। চার মাযহাবের অধিকাংশ অনুসারীদের মাঝে কোন শত্রুতা, বিদ্বেষ ও বিভেদ নেই। তারা পরস্পর বিবাহবন্ধনেও আবদ্ধ হয়। তারা পরস্পরের পিছনে ছলাত আদায় করে। তাদের মাঝে সালাম বিনিময় হয় এবং বিষয় নিয়ে মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও তারা পরস্পর ভ্রাতৃত্ব সূলভ আচরণ করে। তাদের মাঝে ইজতিহাদী মাস'আলাগত প্রাধান্যতা নেই। এজন্য তাদের প্রসিদ্ধ কথা হলো:

لا إنكار في مسائل الاجتهاد

'ইজতিহাদী মাস'আলা গ্রহণযোগ্য'। ইজতিহাদী কথার ব্যাপারে যে কোন দেশে কোন মতানৈক্য ও বৈপরীত্য নেই। তাই ফিক্বহী রায়ের (সিদ্ধান্ত) উপরও তারা ঐকমত্য পোষণ করে। এই ঐকমত্যে বিভাজন সৃষ্টি করা কারো জন্য জায়েয নয়। বরং উচিত হবে সম্মতি জ্ঞাপন করা ও মতভেদ সৃষ্টি না করা।

৩. শাসকের বিরোধিতাকে মর্যাদাকর গণ্য করা এবং তার আনুগত্যকে লাঞ্ছনাকর মনে করা

শাসকের বিরোধিতা করাকে মর্যাদাকর মনে করা এবং তার আনুগত্য করা ও তাকে মেনে নেয়া অপমান ও লাঞ্ছণাদায়ক মনে করা।

রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বিষয়য় তাদের বিরোধিতা করেন। বরং তিনি শ্রবণ করা, তাদের অনুগত থাকা ও তাদের কল্যাণ কামনার নির্দেশ দেন। শাসকের অনুগত থাকা ও তার কথা শ্রবণ করার ব্যাপারে কঠোরতা আরোপ করেন। আর সকলকে এ বিষয়ে বারবার তাকিদ করেন। আর উপরোক্ত তিনটি বিষয়ে ছহীহ হাদীসে একত্রে নির্দেশ দেয়া হয়েছে,

إن الله يرضى لكم ثلاثاً: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم

আল্লাহ তোমাদের উপর তিনটি ব্যাপারে খুশী হন: (১) তোমরা কেবলমাত্র আল্লাহর আনুগত্য করো এবং তাঁর সংগে কাউকে শরীক করো না। (২) তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জুকে মজবুত ভাবে আঁকড়ে ধরো এবং আর বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ো না (৩) আল্লাহ যাদেরকে তোমাদের উপর শাসন ক্ষমতা দান করেন, তাদেরকে সু-পরামর্শ দিবে।[১৫] এ তিনটি বিষয়ের সম্পূর্ণ অথবা আংশিক লঙ্ঘন করার কারণে মানুষের দীন ও দুনিয়াবী বিষয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

....

ব্যাখ্যা: কতিপয় জাহিলী সমস্যা: জাহিলরা শাসকের প্রতি অনুগত নয়। অনুগত থাকাকে তারা অসম্মানের কারণ মনে করে। শাসকের অবাধ্য হওয়াকে মর্যাদাকর ও স্বাধীনতা হিসাবে তারা গ্রহণ করে। একারণে কোন ইমাম (নেতা) ও আমীর (শাসক) তাদেরকে জামা‘আতবদ্ধ করতে পারে না। কেননা তারা অনুগত নয়। তারা দাম্ভিক ও অহংকারী। ইসলাম

১৫. ছহীহ মুসলিম হা/১৭১৫।

তাদের এ কাজের বিরোধিতা করে। সেই সাথে ইসলাম মুসলিম শাসকের কথা শ্রবণ করা ও তার প্রতি অনুগত থাকার নির্দেশ দেয়, যা কল্যাণকর। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59]

হে মুমিনগণ, তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর ও আনুগত্য কর রসূলের এবং তোমাদের মধ্য থেকে কর্তৃত্বের অধিকারীদের (*সূরা আন নিসা ৪:৫৯*)।

এ আয়াত থেকে শাসকের প্রতি আনুগত্যের নির্দেশ প্রমাণিত হয়। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবাধ্যতায় আনুগত্যের সীমা নির্ধারণ করে বলেন,

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

অর্থাৎ স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির আনুগত্য নেই।[১৬] তিনি আরোও বলেন,

إنما الطاعة في المعروف

আনুগত্য শুধু সৎকাজে।[১৭]

তাই আল্লাহর অবাধ্যতা ব্যতীত শাসকের আনুগত্য করা ওয়াজীব-আবশ্যক। শাসক অবাধ্যতার নির্দেশ দিলে তার আনুগত্য করা যাবে না। অবাধ্য বিষয় ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে তার বিরোধিতা করা যাবে না। বিশেষত যে বিষয়ে অবাধ্যতা রয়েছে সে ব্যাপারে আদৌ শাসকের আনুগত্য করা যাবে না। এ কারণে শাসক ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকলে অন্যান্য বিষয়ে তার বাইয়াত ভঙ্গ করা যাবে না এবং তার বিরোধিতাও করা যাবে না। কেননা একতাবদ্ধ থাকা, রক্তপাত নিবৃত্ত করা, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অত্যাচারীর হাত থেকে নির্যাতিতদের রক্ষা করা, মানুষের অধিকার রক্ষা করা ও ন্যায়ভিত্তিক শাসন প্রতিষ্ঠা শাসকের আনুগত্যের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। এমনকি শাসক যদি দীনের উপর

---

১৬. ছ্বহীহ: মুসনাদে আহমাদ, ছ্বহীহ জামে হা/৭৫২০।

১৭. ছ্বহীহ বুখারী হা/৭২৫৭ , ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৮৪০।

অটল না থাকে ও ফাসিকও হয়, কিন্তু কুফরীতে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তার আনুগত্য করতে হবে। যেমন নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

اسمعوا وأطيعوا، إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم عليه من الله برهان

তোমরা শাসকের কথা শ্রবণ করবে ও তার অনুগত থাকবে কিন্তু যদি স্পষ্ট কুফরী দেখ, তোমাদের কাছে আল্লাহর তরফ থেকে যে বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান, তাহলে আলাদা কথা।[১৮]

শাসক কুফরী ব্যতীত অন্যান্য অবাধ্যতায় লিপ্ত হলেও তার কথা শ্রবণ করতে হবে ও তার অনুগত থাকতে হবে, যদি তার নের্তৃত্ব ও তার প্রতি অনুগত থাকা মুসলিমদের জন্য কল্যাণকর হয়। তবে ফাসিকী শাসকের উপরই বর্তাবে।

এ জন্য কতিপয় ইমামকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো, কেউ ফাসিক কিন্তু শক্তিশালী। আর কেউ সৎ তবে দুর্বল। উভয়ের মধ্যে কে নের্তৃত্বের উপযুক্ত?

তারা জবাব দিলেন: শক্তিশালী ফাসিক উপযুক্ত। কেননা তার ফাসিকী নিজের উপরই বর্তাবে এবং মুসলিমদের স্বার্থে তার শক্তি ব্যয় হবে। অপর পক্ষে এ সৎ ব্যক্তির সততা তার নিজের জন্য, তার দুর্বলতা মুসলিমদের ক্ষতি বয়ে আনবে। তাই যদিও শক্তিশালী শাসকের মাঝে ফাসিকী থাকে, তবু তার কথা শ্রবণ করতে হয় ও তার অনুগত থাকতে হয়। যদি সে বাড়াবাড়ি ও অত্যাচার করে সে ক্ষেত্রে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

أطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك

যদিও তোমার ধনসম্পদ হরণ করে এবং তুমি প্রহৃত হও তবুও তুমি তার অনুগত থাকো।[১৯]

---

১৮. ছহীহ বুখারী হা/৭০৫৬ , ছহীহ মুসলিম হা/১৭০৯।

১৯. ছহীহ মুসলিম হা/১৮৪৭।

কেননা ফাসিকীর দিক বিবেচনায় তার আনুগত্যের মাধ্যমে মুসলিমদের স্বার্থ রক্ষাই প্রাধান্য পাবে। শাসকের আনুগত্য করা তার অবাধ্য কাজের চেয়ে কল্যাণকর। শাসকের বিরোধিতা করা তার আনুগত্যের চেয়ে বেশি মারাত্মক। কেননা তার বিরোধিতার কারণে রক্তপাত ঘটা, নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়াসহ ঐক্য বিনষ্ট হতে পারে।

শাসক ও নেতাদের বিরোধিতাকারীদের অবস্থা যা ইতিহাসের বর্ণনায় পাওয়া যায়?

সাজ্জাযের প্ররোচনায় উসমান রদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর আনুগত্য থেকে জনগণ দূরে সরে যায় এবং তার দ্বারা প্ররোচিত হয়ে আমীরুল মু'মিনিন (মুসলিমদের শাসক) উসমান রদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে তারা হত্যা করে। আমীরুল মু'মিনিন (মুসলিমদের শাসক) এর বিরোধিতা এবং তাকে হত্যার কারণে মু'মিনদের কি অবনতি ঘটেছিল?

ক্রমাগত অবনতি ও ফিতনা ফাসাদের মধ্যে দিয়ে মুসলিমরা কষ্ট ভোগ করে আসছে।

অনুরূপ অন্যান্য নেতাদের আনুগত্যের মাধ্যমে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। যদি শাসক আংশিক ফাসাদে (বিশৃঙ্খলায়) লিপ্ত থাকে, তাহলে তার বিরোধিতা করার চেয়ে এটা অনেক সহজতর বলে গণ্য হবে।

এ কারণে শাসক ইসলাম ত্যাগ না করলে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার অনুগত থাকা আবশ্যক করে দেন যদিও সে ফাসিক অথবা অত্যাচারী হয়।

বৃহত্তর বিশৃঙ্খলা রুখে দেয়ার জন্য আংশিক বিশৃঙ্খলার উপর ধৈর্য ধারণ করতে হয়। বড় ধরণের ক্ষতিকে প্রতিহত করা জন্য সাধারণ ক্ষতি মেনে নেয়া ভাল। নেতার বিরোধিতায় মারাত্মক বিশৃঙ্খলা সংঘটিত হওয়ার চেয়ে জনগণের ধৈর্য ধারণ করা ভাল।

শাসকের আনুগত্যের ব্যাপারে জাহিল এবং মুসলিমদের মাঝে পার্থক্য

জাহিলরা তাদের শাসকের প্রতি অনুগত থাকে না। আনুগত্যশীল হওয়াকে তারা অপমানের কারণ মনে করে। আর ইসলাম মুসলিমদেরকে শাসকের আনুগত্যের নির্দেশ দেয়। যদি শাসক ফাসিক হয় ও মানুষের প্রতি জুলুম করে তবে ধৈর্য ধারণ করতে বলে।

কেননা, এতে মুসলিমদের স্বার্থকতা নিহিত আছে। আর শাসকদের বিরোধিতায় মুসলিমদের মারাত্মক ক্ষতি করার চেয়ে তাদের আনুগত্য করা ভাল, যে অনাকাঙ্খিত আনুগত্য মুসলিমদেরকে ইসলাম থেকে বের করে দেয় না। এরূপ গুরুত্বপূর্ণ অবস্থায় ইসলাম এ বৃহৎ মূলনীতি প্রবর্তন করেছে।

আর জাহিলদের আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে। যারা শাসকদের নেতৃত্ব মেনে নেয় না। তারা শাসকদের কথা শ্রবণ করে না ও তাদের প্রতি অনুগত থাকে না।

বর্তমান কাফির জনগণও জাহিলদের মতই অবাধ্য। যারা স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের কথা বলে অথচ বর্তমানে তাদের সমাজ ব্যবস্থা কেমন?

দোষত্রুটি অন্বেষণ, পাশবিকতা, হত্যা, ছিনতাই-রাহাজানি, বিভিন্ন ধরণের বিশৃঙ্খলা, অপকর্ম ও নিরাপত্তাহীনতা এসব মন্দ বিষয় বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোতে ঘটে চলছে অথচ তাদের কাছে অস্ত্রের সমাহার ও বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা রয়েছে। কিন্তু এরপরও তাদের মাঝে পশুত্ব বিরাজমান। এসব থেকে আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তারা এখনও জাহিলী অবস্থার উপর বিদ্যমান।

নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাসকের কথা শ্রবণ করা ও তাদের প্রতি অনুগত থাকা ও গোপনে তাদের উপদেশ প্রদানের নির্দেশ দেন। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এ নির্দেশ শাসক ও উপদেষ্টার মাঝে সীমাবদ্ধ। আর তাদের সমালোচনা, গালিগালাজ ও গীবত করার মাধ্যমে মূলতঃ তাদেরকে ধোঁকা দেয়া হয়, যে কারণে জনগণ তাদের

উপর ক্ষিপ্ত হয় ও দুষ্ট লোকেরা আনন্দিত হয়, যা শাসকদের ব্যাপারে খিয়ানত স্বরূপ।

অপরপক্ষে, তাদের জন্য দু'আ করা ও সভা-সমাবেশে দোষ-ত্রুটি বর্ণনা না করা, তাদের জন্য কল্যাণ কামনার অন্তর্ভুক্ত। আর যে শাসককে উপদেশ বাণী শুনাতে চায়, সে নিজেই তার নিকট গিয়ে মৌখিকভাবে অথবা বার্তার মাধ্যমে তাকে উপদেশ দিবে অথবা সম্ভবপর কারো মাধ্যমে তার নিকট উপদেশবাণী পৌঁছে দিবে। আর পৌঁছাতে সক্ষম না হলে তা অজুহাত হিসাবে গণ্য হবে। সভা-সমাবেশ অথবা মঞ্চ অথবা লাইনের সামনে দাঁড়িয়ে শাসককে গালিগালাজ করা ও তার দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা তার জন্য উপদেশ নয়, বরং তা খিয়ানাত করারই নামান্তর।

তাদের সংশোধনের জন্য দু'আ করা উপদেশ দেয়ার অন্তর্ভুক্ত। আর তাদের দোষ-ত্রুটি ও অশ্লীলতা মানুষের কাছে ব্যক্ত না করাও উপদেশ দেয়ার মধ্যে শামিল। আর কর্মকর্তাদের উপর তারা যেসব কাজের দায়িত্ব অর্পণ করে তা পালন করা ও দায়িত্বশীলদের উপর তাদের কৃত অঙ্গিকার পালন করাও শাসকদের হিতোপদেশ দেয়ার অন্তর্ভুক্ত।

অতঃপর শাইখ রহিমাহুল্লাহ বলেন: এ তিনটি বিষয়ে ছহীহ হাদীছে একত্রে নির্দেশ দেয়া হয়েছে:

إن الله يرضى لكم ثلاثاً: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم

আল্লাহ তোমাদের উপর তিনটি ব্যাপারে খুশী হন: (১) তোমরা কেবলমাত্র আল্লাহর আনুগত্য করো এবং তার সংগে কাউকে শরীক করো না। (২) তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জুকে মজবুত ভাবে আঁকড়ে ধরো এবং আর বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ো না (৩) আল্লাহ যাদেরকে তোমাদের উপর শাসন ক্ষমতা দান করেন, তাদেরকে সু-পরামর্শ দিবে।[২০]

২০. ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৭১৫।

এ তিনটি বিষয় অথবা এর আংশিক ছেড়ে দেয়ার কারণে মানুষের দীন ও দুনিয়া উভয়ই ক্ষতিগ্রস্থ হয়। শাইখ রহিমাহুল্লাহ বলেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একত্রে তিনটি বিষয় বর্ণনা করেন, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম সমস্যা: জাহিলরা ওলী-আওলীয়া ও নেকলোকদের ইবাদত করতো। আর বলতো,

{وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ} [يونس: 18]

আর তারা বলে, এরা আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী *(সূরাহ ইউনুছ:১৮)।*

দ্বিতীয় সমস্যা: জাহিলরা দীন ও দুনিয়া উভয় ব্যাপারে দলে দলে বিভক্ত ছিল।

তৃতীয় সমস্যা: তারা শাসকদের প্রতি অনুগত ছিল না। আনুগত্য করাকে তারা অপমান ও লাঞ্ছনা মনে করতো।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনটি বিষয়কে একত্রে বর্ণনা করেছেন যা সকল কথা ও বক্তব্য একই বাক্যের অন্তর্ভুক্ত। তিনি বলেন,

إن الله يرضى لكم ثلاثاً: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم

(১) তোমরা কেবলমাত্র আল্লাহর আনুগত্য করো এবং তাঁর সংগে কাউকে শরীক করো না। (২) তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রজ্জুকে মজবুত ভাবে আঁকড়ে ধরো এবং আর বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ো না (৩) আল্লাহ যাদেরকে তোমাদের উপর শাসন ক্ষমতা দান করেন, তাদেরকে সু-পরামর্শ দিবে।[২১]

প্রথম: একমাত্র তারই ইবাদত করবে, তার সাথে কাউকে শরীক করবে না। আর আওলীয়া ও নেকলোকদের ইবাদত করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

---

২১. ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৭১৫।

দ্বিতীয়ঃ তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরবে আর বিভক্ত হবে না। জাহিলরা দীন ও দুনিয়ার ব্যাপারে দলে দলে বিভক্ত ছিল, তার বিপরীতে আল্লাহ এ নির্দেশ দেন। অর্থাৎ [وحبل الله هو القرآن] আল্লাহর রজ্জু কুরআন আঁকড়ে ধরবে। আল্লাহ তা'আলা যে নির্দেশ দেন তা পালন করবে। আর যে বিষয়ে তিনি নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকবে। কেননা আল-কুরআন আল্লাহ প্রদত্ত পদ্ধতি যা বান্দার দীন ও দুনিয়াবী স্বার্থ রক্ষার জিম্মাদার। এটাকে আঁকড়ে ধরার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার রহমত পাওয়া যায়। আর তা ছেড়ে দেয়ার কারণে শাস্তি ও কষ্ট নির্ধারিত হয়।

তৃতীয়ঃ আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে শাসন ক্ষমতার দায়িত্ব দিয়েছেন, তোমরা পরস্পর তাদের কল্যাণ কামনা করবে। এটা সেসব জাহিলদের বিপরীত বিষয় যারা শাসকের প্রতি অনুগত হয় না। শাসকের কথা মেনে নেওয়া, তার কল্যাণ কামনা করা, অনুগত থাকা, তার বিরোধিতা না করা, জনসম্মুখে সমালোচনা ও দোষ-ত্রুটি বর্ণনা না করার নির্দেশ রয়েছে, কেননা তা খিয়ানাত স্বরূপ। কারণ তাতে উপদেশ নেই। যদিও কিছু মানুষ মনে করে এটা শাসকের জন্য হিতোপদেশ, আসলে তা নয়। বরং তার গিবত করা ও তাকে মন্দ বলার অন্তর্ভুক্ত। এটা শাসক ও প্রজার মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি ছাড়া কিছু নয়। আর তা কখনোই কল্যাণকর নয়। এটা নিছক ক্ষতি ছাড়া কিছু নয়।

শাইখ রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, মানুষের দীন ও দুনিয়াবী ব্যাপারে যে তিনটি বিষয় অথবা তার আংশিক লঙ্ঘন করার কারণে যে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হয়। তা হলোঃ

(১) আল্লাহর সাথে শিরক করা

(২) দলে দলে বিভক্ত হওয়া ও

(৩) শাসকের বিরোধিতা করা।

৪. তাক্বলীদ (অন্ধ অনুকরণ) ক্ষতিকর

কতিপয় মূলনীতির উপর জাহিলদের দীনের ভিত্তি গঠিত। বৃহৎ ভিত্তি হলো অন্ধ অনুসরণ করা। পূর্বাপর সব কাফিরের জন্য এটাই বৃহৎ মূলনীতি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ} [الزخرف: 23]

আর এভাবেই তোমাদের পূর্বে যখনই আমি কোন জনপদে সতর্ককারী পাঠিয়েছি, তখনই সেখানকার বিলাসপ্রিয়রা বলেছে, নিশ্চয় আমরা তো আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে এক মতাদর্শের ওপর পেয়েছি তাই আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি (*সূরা আয যুখরুফ ৪৩:২৩*)। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ} [لقمان: 21]

আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তোমরা তার অনুসরণ কর' তখন তারা বলে, বরং আমরা তার অনুসরণ করব যার ওপর আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছি।' শয়তান তাদেরকে প্রজ্বলিত আযাবের দিকে আহবান করলেও কি (তারা পিতৃপুরুষদেরকে অনুসরণ করবে)? (*সূরা লুক্বমান ৩১:২১*)। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ ... } [سبأ: 46] الآية،

বল, 'আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি; তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে দু'জন অথবা এক একজন করে দাঁড়িয়ে যাও, অতঃপর চিন্তা করে দেখ, তোমাদের সাথীর মধ্যে কোন পাগলামী নেই। সে তো আসন্ন

কঠোর আযাব সম্পর্কে তোমাদের একজন সতর্ককারী বৈ কিছু নয়’ (*সূরা সাবা ৩৪:৬৪*)।

وقوله: {اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ} [الأعراف: 3]

তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের পক্ষ হতে যা নাযিল করা হয়েছে, তা অনুসরণ কর এবং তাকে ছাড়া অন্য অভিভাবকের অনুসরণ করো না। তোমরা সামান্যই উপদেশ গ্রহণ কর (*সূরা আল ‘আরাফ ৭:৩*)।

....

ব্যাখ্যা: জাহিলী সমস্যা সমূহ: রসূলগণ যা নিয়ে এসেছেন তা দিয়ে জাহিলরা দীনের ভিত্তি গঠন করে না। বরং তারা নিজেদের উদ্ভাবিত মূলনীতির মাধ্যমে তারা দীনের ভিত্তি গঠন করে। এ থেকে তারা ফিরেও আসে না। জাহিলী সমস্যার মধ্যে একটি হলো: [التقليد] অন্ধ অনুসরণ করা। তা জাহিলদের পরস্পরের মাঝে কতিপয়ের অনুকরণ করা বুঝায়। যদিও অনুসৃত ব্যক্তিরা আদর্শবান নয়। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ} [الزخرف: 23]

আর এভাবেই তোমাদের পূর্বে যখনই আমি কোন জনপদে সতর্ককারী পাঠিয়েছি, তখনই সেখানকার বিলাসপ্রিয়রা বলেছে, নিশ্চয় আমরা তো আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে এক মতাদর্শের ওপর পেয়েছি তাই আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি (*সূরা আয যুখরুফ ৪৩:২৩*)।

বিলাসীরা অধিকাংশই স্বাচ্ছন্দ্যময়ী ও সম্পদশালী। কেননা তারা মন্দ প্রকৃতির লোক ও হক্ব গ্রহণ করা থেকে বিমুখ। এটা দুর্বল ও দরিদ্রদের বিপরীত যাদের অধিকাংশই বিনয়ী ও হক্ব গ্রহণকারী। বিলাসীরা হলো খ্যাতি সম্পন্ন ও ঐশ্বর্যশালী।

আল্লাহর বাণী: (إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا) অর্থাৎ জাহিলদের মাঝে সম্পদশালী ও প্রভাবসম্পন্ন লোক রয়েছে। আল্লাহর বাণী:

{إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ} [الزخرف: 23]

নিশ্চয় আমরা তো আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে এক মতাদর্শের ওপর পেয়েছি (*সূরা যুখরুফ ৪৩:২৩*)।

অর্থাৎ জাহিলরা তাদের পূর্ব পুরুষদের আদর্শ ও দীনের অনুসারী। তারা রসূলগণের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথা বলে। তাদের ধারণা এটা রসূলগণের আনুগত্য থেকে তাদেরকে বিরত রাখবে। এটা [التقليد الأعمى] আত-তাক্বলিদুল'আমা বা অন্ধ অনুসরণ এবং [أمور الجاهلية] উমুরুল জাহিলীয়া বা জাহিলী কর্ম। ভালকাজের অনুকরণ করার নাম [اتباعاً واقتداء] ইত্তেবা ও ইক্বতেদা তথা অনুসরণ ও অনুকরণ। আল্লাহ তা'আলা ইউসূফ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন,

{وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ} [يوسف: 38]

আর আমি অনুসরণ করেছি আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের ধর্ম। আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করা আমাদের জন্য সঙ্গত নয় (*সূরা ইউসূফ ১২:৩৮*)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ} [٩:١٠٠]

মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা অগ্রগামী ও প্রথম এবং যারা তাদেরকে অনুসরণ করেছে সুন্দরভাবে *(সূরা আত তাওবা ৯:১০০)।*

জাহিলদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ} [البقرة: 170]

আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা অনুসরণ কর, যা আল্লাহ নাযিল করেছেন, তারা বলে, বরং আমরা অনুসরণ করব আমাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে যার উপর পেয়েছি। যদি তাদের পিতৃ-পুরুষরা কিছু না বুঝে এবং হেদায়াতপ্রাপ্ত না হয়, তাহলেও কি? (*সূরা আল বাক্বারাহ ২:১৭০*)।

যে বিবেক দ্বারা বুঝে না ও সৎ পথে পরিচালিত হয় না, তার কোন আদর্শ নেই। বিবেকসম্পন্ন ও সৎপথে পরিচালিত ব্যক্তির মাঝে আদর্শ রয়েছে। আর অন্ধ অনুসরণ জাহিলী কর্ম। এটার নাম পক্ষপাতিত্ব। কেননা রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার অনুসারীরা একমাত্র আদর্শ। অতঃপর শাইখ রহিমাহুল্লাহ আল্লাহর বাণী উল্লেখ করেন:

{وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ} [لقمان: 21]

আর যখন তাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তোমরা তার অনুসরণ কর' তখন তারা বলে, বরং আমরা তার অনুসরণ করব যার ওপর আমাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে পেয়েছি।' শয়তান তাদেরকে প্রজ্বলিত আযাবের দিকে আহবান করলেও কি (তারা পিতৃ-পুরুষদেরকে অনুসরণ করবে)? (*সূরা লুক্বমান ৩১:২১*)

আর কাফির ও মুশরিকদের যখন বলা হয়, (اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّه) অর্থাৎ আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তথা আল-কুরআনের অনুসরণ করো।

قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ

অর্থাৎ শয়তান ঐ সব পূর্বপুরুষকে (শাস্তির দিকে) ডাকে। (إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ) তথা তোমরা কি সাঈর নামক জাহান্নামের জন্য তাদের অনুসরণ করছো? অর্থাৎ তোমাদের পূর্ব পুরুষরা শয়তানের অনুসারী হলে ও সাঈর নামক জাহান্নামের দিকে ডাকলে তবুও কি তোমরা তাদের অনুকরণ করবে?

এ বিষয়ে বিবেক দিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা আবশ্যক যে, কার অনুসরণ করা হচ্ছে। অতঃপর শাইখ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাহিলদের নিকট আল্লাহ তা'আলার এ বাণী নিয়ে আসেন।

{قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ} [سبأ: 46]

বল, 'আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি; তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে দু'জন অথবা এক একজন করে দাঁড়িয়ে যাও, অতঃপর চিন্তা করে দেখ, তোমাদের সাথীর মধ্যে কোন পাগলামী নেই। সে তো আসন্ন কঠোর আযাব সম্পর্কে তোমাদের একজন সতর্ককারী বৈ কিছু নয়' (*সূরা সাবা ৩৪:৪৬*)। তিনি আরোও বলেন,

{اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ} [الأعراف: 3]

তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের পক্ষ হতে যা নাযিল করা হয়েছে, তা অনুসরণ কর এবং তাকে ছাড়া অন্য অভিভাবকের অনুসরণ করো না। তোমরা সামান্যই উপদেশ গ্রহণ কর (*সূরা আল 'আরাফ ৭:৩*)।

রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের নিকট এ আয়াত নিয়ে আসলে তারা বলে, আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদের রীতি আঁকড়ে ধরবো। এ ব্যক্তি অর্থাৎ মুহাম্মাদ এর আনুগত্য করবো না। আল্লাহ তা'আলার কথা হলো, এ ব্যক্তি তোমাদেরকে যা বলে সে বিষয়ে তোমরা ভেবে দেখ ও চিন্তা-ভাবনা করো। তোমরা যেন কোন পক্ষ পাতিত্ব না করো। আল্লাহ তা'আলার বাণী:

{أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى} [(سبأ: 46]

তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে দু'জন অথবা এক একজন করে দাঁড়িয়ে যাও (*সূরা সাবা ৩৪:৪৬*)।

মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দিকে কোন বিষয়ে তোমাদের কোন ব্যক্তি বা দলকে ডাকলে তোমরা সে ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করে দেখবে। যদি সে হক্বের দিকে তোমাদেরকে ডাকে, তাহলে

তার অনুসরণ করা তোমাদের উপর ওয়াজীব। আর পূর্ব পুরুষ ও বাপদাদার রীতির উপর বহাল থাকা তোমাদের জন্য বৈধ নয়।

আল্লাহর কথা {أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ} আল্লাহ তা'আলার জন্য প্রতিষ্ঠিত থাকবে। অর্থাৎ কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ ও পক্ষপাতিত্ব করবে না। বরং আল্লাহ তা'আলার জন্য প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তোমরা হক্ব গ্রহণে আগ্রহী হবে {مَثْنَى وَفُرَادَى} দু'জন দু'জন বা একজন করে। অর্থাৎ দু'জন দু'জন করে চিন্তাভাবনা করবে, জামা'আতবদ্ধ হবে, সমবেত হবে।কেননা সমবেত হয়ে অথবা জামা'আতবদ্ধ থেকে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে হক্বের নিকট পৌঁছানো সহজ হয়।

অথবা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন সে ব্যাপারে এককভাবে নিজে নিজে চিন্তা-ভাবনা করলে অবশ্যই হক্ব পাবে, যার আনুগত্য করা আবশ্যক। {ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ} অর্থাৎ মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যার ব্যাপারে তোমরা বলে থাকো যে, সে উন্মাদ অথচ সে উন্মাদ নয়। বরং তিনি মানুষের মধ্যে অধিক বিবেক সম্পন্ন ও সৃষ্টির মাঝে অধিক বুদ্ধিমত্তা, উপদেশ দাতা ও অধিক জ্ঞানী হিসাবে বিবেচিত। এ সত্ত্বেও তোমরা তাকে কিভাবে উন্মাদ বলো? তার বিবেক সম্পর্কে ভেবে দেখো ও চিন্তা-ভাবনা করো। তার আচরণাদী সম্পর্কে চিন্তা করো, তিনি কি উন্মাদের মতো আচরণ করেন?

{مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ} [سبأ: 46]

তোমাদের সাথীর মধ্যে কোন পাগলামী নেই। সে তো আসন্ন কঠোর আযাব সম্পর্কে তোমাদের একজন সতর্ককারী বৈ কিছু নয়'(*সূরা সাবা ৩৪:৪৬*)।

যদি তার প্রতি ঈমান না আনো ও তাকে অনুসরণ না করো, তবে তোমাদের জন্য অচিরেই কঠিন শাস্তি নির্ধারিত হবে। তিনি তোমাদের উপদেশ দাতা হিসাবে আগমন করেছেন, তিনি তোমাদের কল্যাণ ও মুক্তি

চান। তিনি তোমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গল ও সফলতা কামনা করেন।

কোন রকম চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা ছাড়াই তোমরা কিভাবে তার দিকে উন্মাদ কথাটি সম্বোধন করো অথচ তিনি কুরআন নিয়ে এসেছেন? মানুষ যা বলে তা নিয়ে প্রত্যেক বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তির চিন্তা-ভাবনা করা আবশ্যক। যাতে বিশুদ্ধ কথার পার্থক্য বুঝা যায় ও সঠিকতার মাধ্যমে ভুল নির্ণয় করা যায়। অতঃপর সঠিক বিষয় গ্রহণপূর্বক ভুল প্রত্যাখ্যান করা হয়। ফলে বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি অন্ধ অনুকরণ বশতঃ বাতিলের উপর টিকে থাকবে না।

৫. দলীলের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে অধিকাংশের নিয়ম-নীতি-আমলকে দলীল হিসাবে উপস্থাপন করা

তাদের বৃহৎ কর্মপদ্ধতি: অধিকাংশের উপর ভিত্তির কারণে প্রবঞ্চিত হওয়া, কোন বিষয়ের বিশুদ্ধতা প্রমাণের জন্য অধিকাংশকে দলীল গণ্য করা, আর কোন বিষয় বাতিল করার জন্য তা অপরিচিত হওয়া ও কম সংখ্যক সম্প্রদায়ের কর্মকে দলীল গণ্য করা। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ নীতির বিপরীতে তাদের নিকট দলীল পেশ করেন। কুরআন বিরোধী এ নীতির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেন।

....

ব্যাখ্যা: জাহিলী বিষয় সমূহ: হক্ব প্রমাণের জন্য তারা অধিকাংশের দোহাই দিয়ে থাকে। আর কোন কিছু বাতিল করার জন্য কম সংখ্যকের মাধ্যমে দলীল পেশ করে। অধিকাংশরা যে বিষয়ের উপর বহাল থাকে, সেটাকেই তারা হক্ব মনে করে। কম সংখ্যকরা যার উপর বহাল থাকে, সেটা বিশুদ্ধ মনে করে না। এটাই হলো তাদের হক্ব ও বাতিল বুঝার মাপকাঠি। এটা তাদের ভুল কর্মপদ্ধতি। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ} [الأنعام:116]

আর যদি তুমি যারা যমীনে আছে তাদের অধিকাংশের আনুগত্য কর, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। তারা শুধু ধারণারই অনুসরণ করে এবং তারা শুধু অনুমানই করে (*সূরা আল আন‘আম ৬:১১৬*)।

তিনি আরোও বলেন,

{وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونْ} [لأعراف: 187]

কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না (*সূরা আল ‘আরাফ ৭:১৮৭*)। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

{وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ} [الأعراف:102]

আর তাদের অধিকাংশ লোককে আমি অঙ্গীকার রক্ষাকারী পাইনি। বরং তাদের অধিকাংশকে আমি ফাসিক-ই পেয়েছি (*সূরা আল ‘আরাফ ৭: ১০৬*)।

সংখ্যায় কম বা বেশি হওয়া কোন পরিমাপ নয়। বরং হক্বই হলো পরিমাপ। যদি একজনও হক্বের উপর বহাল থাকে তাহলে তিনিই সঠিক বলে গণ্য হবেন, তার অনুসরণ করা আবশ্যক। পক্ষান্তরে অধিকাংশই বাতিলের উপর বহাল থাকলে, তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করা ও তাদের প্রবঞ্চনা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। হক্বের শিক্ষাই গ্রহণ করা জরুরী। একারণে বিদ্বানগণ বলেন, ব্যক্তির সংখ্যা দ্বারা হক্ব চেনা যায় না, বরং হক্বের মাধ্যমেই ব্যক্তি চেনা যায়। তাই কেউ হক্বের উপর থাকলে, তার আনুগত্য করা আবশ্যক। আল্লাহ তা‘আলা বিভিন্ন জাতির কাহিনী বর্ণনা করে জানিয়ে দেন যে, কম সংখ্যকও কখনো হক্বের উপর বহাল থাকে। তিনি বলেন,

{وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ} [هود: 40]

আর তার সাথে অল্পসংখ্যকই ঈমান এনেছিল (*সূরা হূদ ১১:৪০*)। আর হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে,

عُرِضَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ الرُّهَيْطُ، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ، وَالنَّبِيَّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে উম্মতদের পেশ করা হলে তিনি দেখতে পান, একজন নাবীর সাথে একটি দল, অন্য একজন নাবীর সাথে একজন অথবা দু'জন লোক রয়েছে এবং কোন নাবীর সাথে একজন লোকও নেই।[২২] তাই কোন মতামত বা কথার উপর অধিকাংশের অনুসরণের মাধ্যমে কোন শিক্ষা নেই, বরং হক্ব ও বাতিল নির্ণয়ের মাধ্যমেই শিক্ষা রয়েছে। তাই যদি হক্ব প্রমাণিত হয় এবং ঐ হক্বের উপর অল্প সংখ্যক মানুষ বহাল থাকে অথবা কেউই বহাল না থাকে, যতক্ষণ তা হক্ব হিসাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে, ঐ হক্বকেই আঁকড়ে ধরতে হবে। কেননা হক্বই হলো মুক্তির কারণ। বহু সংখ্যক মানুষের মাধ্যমে বাতিল কখনোই শক্তিশালী হতে পারে না। সুতরাং সর্বদাই হক্বের মাপকাঠি গ্রহণ করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ওয়াজিব। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ

অপরিচিত অবস্থায় ইসলামের সূচনা হয় এবং অপরিচিত অবস্থায় তা ফিরে যাবে।[২৩]

মন্দকর্ম, ফিতনা (বিশৃঙ্খলা) ও ভ্রষ্টতা বৃদ্ধি পেলে তখন অল্পসংখ্যক মানুষ ও কিছু গোত্র ছাড়া কেউ হক্বের উপর বহাল থাকবে না। অল্পসংখ্যকই সমাজে অবস্থান করবে। সমগ্র পৃথিবী যখন কুফরী ও ভ্রষ্টতায় নিমোজ্জিত ছিল তখন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিলে একজন, দু'জন করে তার দাওয়াত গ্রহণ করে, ক্রমান্বয়ে সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কুরাইশ ও বেদুঈনসহ পৃথিবীর সবাই ভ্রষ্টতায় নিমোজ্জিত ছিল। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একাই মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। পৃথিবীর অল্প সংখ্যক

---

২২. ছ্বহীহ মুসলিম হা/২২০।
২৩. ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৪৬।

মানুষই তার অনুসারী হয়। সুতরাং সংখ্যায় বেশি হওয়া শিক্ষণীয় নয়। সঠিক ও হক্ব অর্জনে শিক্ষা নিহিত আছে। তবে হ্যাঁ বেশি সংখ্যক হক্বের উপর বহাল থাকলে তা ভাল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার নিয়মানুযায়ী অধিকাংশই বাতিলের অনুসারী হয়ে থাকে, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين} [يوسف: 103]

আর তুমি আকাঙ্খা করলেও অধিকাংশ মানুষ মুমিন নয় *(সূরা ইউসূফ ১২:১০৩)*। তিনি আরো বলেন,

{وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} [الأنعام: 116]

আর যদি তুমি যারা যমীনে আছে তাদের অধিকাংশের আনুগত্য কর, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। (*সূরা আল আন'আম ৬:১১৬*)।

৬. দলীলের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে পূর্ববর্তীদের নিয়ম-নীতি-আমলকে দলীল হিসাবে পেশ করা

পূর্ববর্তীদের দলীল গ্রহণ করা সম্পর্কে আল্লাহর বাণী:

{قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى} [طه:51]

ফিরআউন বলল, তাহলে অতীত যুগের লোকদের অবস্থা কী? (*সূরা ত্বহা ২০:৫১*)। তিনি আরো বলেন,

{مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ} [المؤمنون: 24]

এ কথাতো আমরা আমাদের পূর্বতম পিতৃ-পুরুষদের সময়েও শুনিনি (*সূরা মুমিনুন ২৩:২৪*)।

....

ব্যাখ্যা: রসূলগণ জাহিলদের নিকট হক্ব পেশ করলে তাদের পূর্ব-পুরুষদের রীতিকে তারা দলীল হিসাবে পেশ করতো। মূসা আলাইহিস সালাম ফেরআউনকে ঈমানের দাওয়াত দিলে সে পূর্ববর্তীদেরকে দলীল হিসাবে পেশ করেছিল। আল্লাহর বাণী:

{قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى} [طه:51]

ফিরআউন বলল, তাহলে অতীত যুগের লোকদের অবস্থা কী? (*সূরা ত্বহা ২০:৫১*)।

ফেরআউন পূর্ববর্তী যুগের কাফিরদেরকে প্রমাণ স্বরূপ পেশ করতো। এটাই হলো বাতিল ও জাহিলী যুক্তি। নূহ আলাইহিস সালাম তার জাতিকে আল্লাহর দিকে দা'ওয়াত দিলে তারা বলেছিল,

{مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ} [المؤمنون: 24]

এতো তোমাদের মত একজন মানুষ ছাড়া কিছুই না। সে তোমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে চায়। আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে অবশ্যই ফেরেশ্‌তা নাযিল করতেন। এ কথাতো আমরা আমাদের পূর্বতম পিতৃ-পুরুষদের সময়েও শুনিনি (*সূরা মুমিনুন ২৩:২৪*)।

তারা আল্লাহর নাবী নূহ আলাইহিস সালাম এর দা'ওয়াতের বিরোধিতা করেছিল এবং পূর্ব পুরুষরা যে রীতির উপর ছিল তা হক্ব বলে প্রমাণ পেশ করতো। তারা মনে করতো নূহ আলাইহিস সালাম যা নিয়ে এসেছেন তা বাতিল। কেননা তা ছিল পূর্ব-পুরুষদের বিরোধী। অপর দিকে কুরাইশ কাফিররা বলতো,

{مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَاإِلَّا اخْتِلَاقٌ} [صٓ: 7]

আমরা তো সর্বশেষ ধর্মে এমন কথা শুনিনি। এটা তো বানোয়াট কথা ছাড়া আর কিছু নয় (*সূরা ছদ ৩৮: ৭*)।

অর্থাৎ (مَا سَمِعْنَا بِهَذَا) তথা আমরা এটা শুনিনি যা মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়ে এসেছেন।

(فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ) তথা শেষ ধর্মে অর্থাৎ তাদের পূর্বপুরুষ ও বাপদাদার ধর্মে। (إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ) তথা এটা মিথ্যা। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তারা তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতো। কিন্তু কেন? কেননা রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রাপ্ত দীন ছিল তাদের পূর্ব-পুরুষ বিরোধী। আর পূর্ব পুরুষদের রীতি ছিল মূর্তি পূজা করা।

তাদের পিতা ইবরাহীম ও ইসমাঈল আলাইহিমাস সালাম এর দীনের দিকে তারা প্রত্যাবর্তন করেনি। বরং তাদের নিকটতম পূর্ব পুরুষদের রীতির দিকে তারা প্রত্যাবর্তন করেছিল। মক্কার কাফির কুরাইশরা ছিল তাদের বাপদাদা ও পূর্ব পুরুষদের অনুসারী। এটাই ছিল কাফির ও জাহিলদের রীতি। এভাবে পূর্ববর্তী জাতিদেরকে তারা দলীল হিসাবে গ্রহণ করতো।

রসূলগণের সাথে যা ছিল সে ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা বিবেকবানদের উপর আবশ্যক। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শ ও পূর্ব পুরুষদের রীতির মাঝে তাদের তুলনা করে দেখা আবশ্যক, যাতে তাদের নিকট বাতিল থেকে হক্ব স্পষ্ট হয়ে যায়। বিবেকহীনরা নিজেরা বলে,

ما نقبل إلا ما عليه آباؤنا، ولا نقبل ما يخالفه

আমরা পূর্ব পুরুষদের রীতিই গ্রহণ করবো, এর বিপরীত কিছু মেনে নিবো না।

এটা অধিকন্তু বিবেকবানদের মর্যাদা পরিপন্থী বিষয়, যারা নিজেদের মুক্তি চায়। বর্তমানে কবরের ইবাদত করা হতে কবর পূজারীদের নিষেধ করা হলে তারা বলে, অমুক দেশে এটার প্রচলন আছে, অমুক গোষ্ঠী এটা করে ও যুগযুগ ধরে তা পালন করা হয়।

রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম দিন পালন করা থেকে যখন মিলাদপন্থীদের নিষেধ করতঃ বলা হয়, এটা বিদ‘আত। তখন তারা

বলে, আমাদের পূর্ব থেকেই এর উপর আমল চালু আছে। যদি এটা বাতিলই হতো তাহলে পূর্ববর্তীরা এর উপর আমল করতো না। এটাই হলো জাহিলদের দলীল গ্রহণের স্বরূপ।

মানুষ যা পালন করে তাতে কোন শিক্ষা নেই। বরং রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তাতেই শিক্ষা নিহিত আছে। কেননা মানুষ ভুল ও সঠিক উভয়টি করতে পারে। কিন্তু রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন, তা অকাট্যভাবে সঠিক।

তাই রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্য করা আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা আমাদের বাপদাদা ও পূর্ব পুরুষদের উপর নির্ভর করতে বলেন নাই। বাপদাদা ও পূর্ব পুরুষদের রীতি যদি যথেষ্ট হতো, তাহলে রসূলগণের প্রয়োজন হতো না। এরূপভাবে সূফীগণ বলেন, রসূলের আনুগত্য করার চেয়ে আমরা যে অবস্থায় আছি সেটাই যথেষ্ট। আর আমাদের স্বীয় অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। ফলে আমরা সরাসরি আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে দীন গ্রহণ করি।

সূফীরা বলে, সুন্নাতের অনুসারীরা মৃতদের কাছ থেকে তাদের দীন গ্রহণ করে, তারা হাদীছের সনদের রাবীগণকে বুঝাতে চায়। আর তাদের কথা হলো আমরা চিরঞ্জীব আল্লাহর কাছ থেকে আমাদের দীন গ্রহণ করি।

তারা বলে, জন সাধারণের জন্য রসূলগণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তবে বিশেষ ব্যক্তি বর্গের জন্য রসূলের প্রয়োজন নেই। কেননা বিশেষ ব্যক্তিগণ আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারেন। তারা বুঝতে পারেন যে, তাদের জন্য রসূলগণ প্রয়োজনহীন। এভাবে শয়তান তাদেরকে বলে, পথ প্রাপ্তদের জন্য রসূলগণের দরকার নেই। কেননা তারা সরাসরি আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে দীন গ্রহণ করে। এটাই জাহিলী দীন। অনেক মানুষই এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

৭. শক্তিশালী গোষ্ঠীর রীতিকে হক্ব মনে করে তা দলীল হিসাবে গ্রহণ করা

শক্তিশালী গোষ্ঠীর রীতিকে হক্ব মনে করে তা দলীল হিসাবে গ্রহণ করা: যে সম্প্রদায়কে বোধশক্তি, কর্মক্ষমতা, ধনসম্পদ, সম্মান ও রাজত্ব দান করা হয়েছে তার মাধ্যমে দলীল গ্রহণ করা। আল্লাহ তা'আলা তার বাণীর মাধ্যমে এটা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন,

{وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ} [الأحقاف:26]

আর আমি অবশ্যই তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম, তোমাদেরকে তাতে প্রতিষ্ঠিত করি নি (*সূরা আহক্বাফ ৪৬: ২৬*)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

{وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ} [البقرة: 89]

আর তারা (এর মাধ্যমে) পূর্বে কাফিরদের উপর বিজয় কামনা করত। সুতরাং যখন তাদের নিকট এল, যা তারা চিনত, তারা তা অস্বীকার করল। অতএব কাফিরদের উপর আল্লাহর লা'নত (*সূরা বাক্বারাহ ২:৮৯*)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

{يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ} [البقرة:146]

তারা তাকে চিনে, যেমন চিনে তাদের সন্তানদেরকে (*সূরা বাক্বারাহ ২:১৪৬*)।

....

ব্যাখ্যা: জাহিলী সমস্যাসমূহ: শক্তি, জ্ঞান ও মর্যাদা সম্পন্ন মানুষেরা যে রীতির উপর থাকে, সেটাকে তারা হক্ব মনে করে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে। এটাই ছিল তাদের নিকট হক্ব চেনার পদ্ধতি। তারা মানুষের দিকে দৃষ্টি দেয় এবং মনে করে সামর্থবান, সম্পদশালী, বিলাসী ও খ্যাতিমানরাই সঠিক পথে আছে। আর দুর্বল ও গরীবদেরকে তারা বাতিল মনে করে। এটাই হলো জাহিলদের অবস্থা, তাদের এ পদ্ধতি পরিত্যাজ্য।

আল্লাহ তা‘আলা পূর্ববর্তী কাফির জাতি সম্পর্কে অবহিত করেছেন যে, তারা সম্পদশালী ও শক্তিসম্পন্ন ছিল। কুরআনের অনেক আয়াতের মাধ্যমে তাদের গৌরবের কথা জানা যায়। তারা জ্ঞানবান ও বোধশক্তি সম্পন্নও ছিল। কিন্তু এসব কিছুই তাদের কোন কাজে আসেনি। বরং তারা বাতিলের উপরই ছিল। এ বিষয়টি আল্লাহ তা‘আলা অনেক আয়াতেই উল্লেখ করেন। আল্লাহর বাণী:

{وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَاماً وَأَحْسَنُ نَدِيّاً} [مريم:73]

আর যখন তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ সুস্পষ্টরূপে পাঠ করা হয়, তখন কাফিররা ঈমানদারকে বলে, “দুই দলের মধ্যে কোনটি মর্যাদায় শ্রেষ্ঠতর এবং মজলিস হিসাবে উত্তম?” (*সূরা মারইয়াম ১৯:৭৩*)।

আল্লাহ তা‘আলা তাদের ধ্বংস সাধনের ব্যাপারে বলেন,

{وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثاً وَرِئْياً} [مريم:74]

আর তাদের পূর্বে আমি কত প্রজন্ম ধ্বংস করে দিয়েছি যারা সাজ-সরঞ্জাম ও বাহ্য দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ ছিল! (*সূরা মারইয়াম ১৯:৭৪*)। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

{أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيماً قَدِيراً} [فاطر:44]

আর তারা কি যমীনে ভ্রমণ করেনি ? তাহলে তারা দেখত, কেমন ছিল তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম। অথচ তারাতো শক্তিতে ছিল এদের চেয়েও প্রবল। আল-াহ তো এমন নন যে, আসমানসমূহ ও যমীনের কোন কিছু তাকে অক্ষম করে দেবে। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান (*সূরা ফাতির ৩৫:৪৪*)। আল্লাহ তা‘আলা আরোও বলেন,

{وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشاً} [قٓ:36]

আমি তাদের পূর্বে বহু প্রজন্মকে ধ্বংস করে দিয়েছি যারা পাকড়াও করার ক্ষেত্রে এদের তুলনায় ছিল প্রবলতর (*সূরা ক্বফ ৫০:৩৬*)। আল্লাহ তা'আলা আরোও বলেন,

{أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَاراً وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ} **[الأنعام: 6]**

তারা কি দেখে না আমি তাদের পূর্বে বহু প্রজন্মকে ধ্বংস করেছি? যাদেরকে যমীনে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যেভাবে তোমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করিনি। আর তাদের উপর বৃষ্টি পাঠিয়েছিলাম মুষলধারে এবং সৃষ্টি করেছিলাম নদীসমূহ যা তাদের নীচে প্রবাহিত হত। অতঃপর তাদের পাপের কারণে তাদেরকে ধ্বংস করেছি এবং তাদের পরে অন্য প্রজন্মকে সৃষ্টি করেছি (*সূরা আন'আম ৬:৬*)।

এ সকল আয়াত ও উদাহরণ সমূহের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ধন-সম্পদ ও শক্তিতে কোন শিক্ষা নেই। কেননা সম্পদশালী ও ক্ষমতাবানরা যখন ভ্রষ্টতায় নিমোজ্জিত ছিল তখন তাদের এ ক্ষমতা, সম্পদ ও প্রাচুর্য কোন কাজে আসেনি। আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন যে, কাফিরদেরকে পাঁকড়াও করার জন্য তিনি এগুলো তাদেরকে দান করেন। আল্লাহর বাণী:

{فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} **[الأنعام: 44، 45]**

অতঃপর তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছিল, তারা যখন তা ভুলে গেল, আমি তাদের উপর সব কিছুর দরজা খুলে দিলাম। অবশেষে যখন তাদেরকে যা প্রদান করা হয়েছিল তার কারণে তারা উৎফুল হল, আমি হঠাৎ তাদেরকে পাকড়াও করলাম। ফলে তখন তারা হতাশ হয়ে গেল। অতএব যালিম সম্প্রদায়ের মূল কেটে ফেলা হল। আর সকল প্রশংসা

রাব্বুল আলামীন আল্লাহর জন্য (*সূরা আন‘আম ৬:৪৪-৪৫*)। আল্লাহ তা‘আলা আরোও বলেন,

{فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ} [القلم: 45،44]

অতএব ছেড়ে দাও আমাকে এবং যারা এ বাণীকে প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে । আমি তাদেরকে ধীরে ধীরে এমনভাবে পাকড়াও করব যে, তারা জানতে পারবে না। আর আমি তাদেরকে অবকাশ দেব। অবশ্যই আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ (*সূরা ক্বলাম ৬৮:৪৪-৪৫*)। আল্লাহ তা‘আলা আরোও বলেন,

{وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْماً وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ} [آل عمران: 178]

আর যারা কুফরী করেছে তারা যেন মনে না করে যে, আমি তাদের জন্য যে অবকাশ দেই, তা তাদের নিজেদের জন্য উত্তম। আমি তো তাদেরকে অবকাশ দেই যাতে তারা পাপ বৃদ্ধি করে। আর তাদের জন্য রয়েছে অপমানজনক আযাব (*সূরা আলে ইমরান ৩:১৭৮*)।

মহান আল্লাহ কাফিরদেরকে প্রাচুর্য, পৃথিবীতে ক্ষমতা, রাজত্ব ও কর্তৃত্ব দান করেছেন। বিভিন্ন জিনিস আবিস্কার ও উদ্ভাবনে তিনি তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন। যেমন বর্তমান যুগের কাফিররা এসবের উপরই রয়েছে। এটা প্রমাণ করে না যে, তারা হক্বের উপর আছে। এটাও প্রমাণিত নয় যে, মহান আল্লাহ এসব কিছু তাদেরকে দান করে তাদের উপর সন্তুষ্ট।

এটা কাফিরদেরকে পাঁকড়া করার অবকাশ ও তার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার ক্ষেত্র বিশেষ, যাতে তাদের পাপাচারিতা বৃদ্ধি পায়। জাহিলরা এ সবের মাধ্যমে দলীল গ্রহণ করে থাকে। পক্ষান্তরে বোধ সম্পন্নরা বিভিন্ন জাতি সম্পর্কে চিন্তা করে, তাদের মাঝে হক্বের সন্ধান পাওয়া গেলে তা গ্রহণ

করে, যদিও তারা অভাবী হয়। আর কোন গোষ্ঠী প্রাচুর্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও বাতিল হলে জ্ঞানীরা তা প্রত্যাখ্যান করে।

এ বিষয়ে অনেক আয়াত আছে। শাইখ রহিমাহুল্লাহ এখানে কতিপয় আয়াত উল্লেখ করেছেন। যে আয়াতে আদ জাতির ধ্বংসের কথা আছে তা তিনি উল্লেখ করেন। আল্লাহর বাণী:

{وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعاً وَأَبْصَاراً وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلا أَبْصَارُهُمْ وَلا أَفْئِدَتُهُمْ ... } [الأحقاف: 26]

আর আমি অবশ্যই তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম, তোমাদেরকে তাতে প্রতিষ্ঠিত করি নি। আর আমি তাদেরকে কান, চোখ ও হৃদয় দিয়েছিলাম, কিন্তু তারা যখন আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করত তখন তাদের কান, তাদের চোখ ও তাদের হৃদয় সমূহ তাদের কোন উপকারে আসেনি (*সূরা আহক্বাফ ৪৬:২৬*)। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

{أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلادِ} [الفجر: 6–8]

তুমি কি দেখনি তোমার রব ‘আদ সম্প্রদায়ের সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? ইরাম জাতির প্রতি, যারা ছিল সুউচ্চ স্তম্ভের অধিকারী (*সূরা ফাজর ৮৯: ৬-৮*)।

রায় বা সিদ্ধান্ত: ইরমা বলতে ইরমা গোত্র অথবা যে শহরে গোত্রটি বসবাস করতো তার নাম ইরমা।

{ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ} [الفجر: 7–9]

ইরাম জাতির প্রতি, যারা ছিল সুউচ্চ স্তম্ভের অধিকারী। যার সমতুল্য দেশ সমূহে সৃষ্টি করা হয়নি। এবং সামুদ সম্প্রদায়, যারা উপত্যকায় পাথর কেটে বাড়ি ঘর নির্মাণ করেছিল? (*সূরা ফাজর ৮৯:৭-৯*)।

গোত্রটি পাহাড় কেটে কারুকাজ করতো ও সেখানে তাদের বাসস্থান নির্মাণ করতো। বর্তমানেও সিরিয়ার পাহাড়ের পাদদেশে তাদের অবস্থান রয়েছে।

{فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلاً وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ} [القصص: 58]

আর আমি কত জনপদকে ধ্বংস করেছি, যার বাসিন্দারা তাদের জীবন উপকরণ নিয়ে দম্ভ করত। এগুলো তো তাদের বাসস্থান। তাদের পরে (এখানে) সামান্যই বসবাস করা হয়েছে। আর আমি চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী (*সূরা ক্বাসাস ২৮: ৫৮*)।

{فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا} [النمل: 52]

সুতরাং ঐগুলো তাদের বাড়ীঘর, যা তাদের যুল্মের কারণে বিরাণ হয়ে আছে। নিশ্চয় এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে সে সম্প্রদায়ের জন্য যারা জ্ঞান রাখে (*সূরা নামল ২৭:৫২*)।

আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে প্রচুর শক্তি দান করেছিলেন অথচ তারা ছিল কাফির। তাদের নিকট নাবীগণ আগমন করলে তাদের শক্তি, প্রাচুর্য ও বিলাসীতার কারণে তারা প্রতারিত হন। তারা রসূলগণের প্রতি অহংকার প্রদর্শন করতো। তাদের শিরকী আমলের উপরই তারা বহাল ছিল এবং তারা হক্বকে গ্রহণ করেনি। গোত্রটি নিজেদের শক্তির মাধ্যমে প্রতারিত হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা আদ জাতির কথাও উল্লেখ করেন, তাদের শক্তির মাধ্যমে তারাও প্রতারিত হয়েছিল।

{وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً} [فصلت: 15]

(আর 'আদ সম্প্রদায়, তারা যমীনে অযথা অহঙ্কার করত এবং) বলত, আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী কে আছে? তবে কি তারা লক্ষ করেনি যে, নিশ্চয় আল্লাহ যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী? (*সূরা ফুসসিলাত ৪১:১৫*)।

বনী ইসরাঈল ও ইয়াহুদীদের জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়ার মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করা হয় এভাবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জ্ঞান ও বুঝশক্তি দান করেছিলেন। তারা নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গুণাবলী

সম্পর্কে জানতো যে, অচিরেই তিনি প্রেরিত হবেন, যা তাদের তাওরাত ও ইনজিলে বর্ণিত হয়েছে। আর একথাও বর্ণিত হয়েছে, তিনি শেষ নাবী হিসাবে প্রেরিত হবেন এবং তার বিভিন্ন গুণাবলীরও বর্ণনা আছে। মদিনায় আরবের আউস ও খাযরাজ গোত্রের সাথে তাদের যুদ্ধের বর্ণনাও আছে।

{وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا} [البقرة: 89]

আর তারা (এর মাধ্যমে) পূর্বে কাফিরদের উপর বিজয় কামনা করত (*সূরা বাক্বারাহ ২:৮৯*)।

তারা বলতো, শেষ যুগে অচিরেই একজন নাবী প্রেরিত হবেন। আমরা তার অনুসরণ করবো ও তার সাথে তোমাদেরকে হত্যা করবো।

{فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ} [البقرة: 89]

সুতরাং যখন তাদের নিকট এল, যা তারা চিনত, তারা তা অস্বীকার করল (*সূরা বাক্বারাহ ২:৮৯*)।

অর্থাৎ মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনী ইসমাঈল বংশে প্রেরিত হন। ইয়াহুদীরা তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। কারণ বনী ইসরাঈলের মধ্যে থেকে নাবী হোক তারা এটা কামনা করতো। যাতে তারা নিজেদের জন্য তাকে পৃষ্ঠপোষকতা দান করতে পারে। ইসমাঈলী বংশে নাবী হওয়ায় রসূল মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি তারা ঈর্ষান্বিত হয়। তারা জানতো যে, তিনি আল্লাহর রসূল। এ সত্ত্বেও তাদের জ্ঞান ও বোধগম্যতা কোন কাজে আসেনি।

মূলতঃ যারা হক্ব বুঝে, তদনুযায়ী আমল করে। আর হক্ব থেকে বিমুখ করে এমন বিষয় হলো: হিংসা, অহংকার ও দুনিয়া প্রীতি অথবা নের্তৃত্বের লোভ। এসব প্রতিবন্ধকতার কারণে মানুষ জেনে বুঝে হক্ব থেকে বিরত থাকে। হেদায়াত ও অনুগ্রহ আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। শিক্ষা, জ্ঞান ও বুঝের মাধ্যমে হেদায়াত লাভ হয় না। তাই যে কোন বিষয় আল্লাহ তা'আলার দিকেই অভিমুখী হয়। একারণে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নোক্ত দু'আটি বেশি বেশি পাঠ করতেন,

يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك

হে অন্তর ও চক্ষুর পরিবর্তনকারী! তোমার দীনের উপর আমার অন্তরকে অটল রাখো।[২৪]

শিক্ষা, জ্ঞান, বুঝ ও ফিক্বহ এসবই ভাল উপকরণ, তবে তা যথেষ্ট নয়। মু'মিনের সতর্কতার জন্য এসব তাকে দান করা হয়। যাতে মু'মিন তার জ্ঞান ও বুঝের মাধ্যমে প্রতারিত না হয়। আর সর্বদা হক্বের উপর অটল থাকা ও সঠিক পথের হিদায়াত লাভের জন্য রবের নিকট দু'আ করবে। এমনিভাবে মু'মিন তার শক্তির মাধ্যমেও প্রতারিত হয় না। যেমন বলা হয়ে থাকে, এটা শক্তিশালী রাষ্ট্র, কেউ এর উপর বিজয় লাভ করতে পারবে না। কেননা এ রাষ্ট্র অস্ত্রাদী, ধ্বংসাত্মক গোলাবারুদ ও পারমাণবিক বোমার সমারোহে সমৃদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ} [التوبة: 25]

হুনাইনের দিনে যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে উৎফুল করেছিল, অথচ তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি। আর যমীন প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের উপর সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে (*সূরা আত তাওবা ৯:২৫*)।

এটা হলো বৃহত্তর বিষয় যে ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষই সচেতন নয়। শক্তি, প্রাচুর্য, খ্যাতি ও অহংকারের মাধ্যমে জাহিলরা যুক্তি দেখিয়ে বলে, এটা উন্নত জাতি, যাতে প্রমাণিত হয় এ জাতি হক্বের উপর আছে। তাদের ধারণা হক্ব ছাড়া কেউ এ সমপর্যায়ে পৌঁছতে পারবে না, কেননা তাদের রয়েছে সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জ্ঞান। কতিপয় জনসমষ্টি প্রতারিত হয়ে তাদের বিষয়ে এরূপ ধারণাই করে থাকে, অথচ তারা কুফরীর উপর প্রতিষ্ঠিত, সেদিকে তারা দৃষ্টি দেয় না।

---

২৪. ছহীহ: তিরমিযী ৩৫৯৬, হাকিম ১৯৭০, ইবনে মাজাহ ১৯৯, ছহীহ জামে ৭৯৮৭-৮৮।

৮. দুর্বলরা যে নীতির উপর রয়েছে, সেটাকে হক্ব মনে না করা

দুর্বলরা ছাড়া কেউ বাতিলের অনুসরণ করে না বলে প্রমাণ পেশ করা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

{أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ} [الشعراء: 111]

তারা বলল, 'আমরা কি তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব, অথচ নিম্নশ্রেণীর লোকেরা তোমাকে অনুসরণ করছে? (*সূরা শু'আরা ২৬:১১১*)।

{أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا} [الأنعام: 53]

এরাই কি, আমাদের মধ্য থেকে যাদের উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন? (*সূরা আন'আম ৬:৫৩*)।

কিন্তু আল্লাহ তা'আলা (দুর্বলদের প্রতি উপস্থাপিত অভিযোগ) প্রত্যাখ্যান করে বলেন,

{أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ} [الأنعام: 53]

আল্লাহ কি কৃতজ্ঞদের ব্যাপারে পূর্ণ জ্ঞাত নয়? (*সূরা আন'আম ৬:৫৩*)।

....

ব্যাখ্যা: এটা পূর্ববর্তী মাস'আলার বিপরীত। মাস'আলাটি ছিল শক্তিশালীরা হক্বের উপর রয়েছে বলে প্রমাণ পেশ করা। আর এ বিষয়কে তারা দুর্বলতাকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করে যে, দুর্বলরা হক্বের উপর নেই। যদি তারা হক্বের উপরই থাকতো তাহলে তারা দুর্বল হতো না। হক্ব ও বাতিল বুঝার জাহিলদের মাপকাঠি এটাই। তারা জানে না যে, শক্তিমত্তা ও দুর্বলতা আল্লাহ তা'আলার হাতেই আছে। দুর্বলতা সত্ত্বেও দুর্বলরা কখনো হক্বের উপর থাকে এবং শক্তিসম্পন্নরা কখনো বাতিলের উপর থাকে। নূহ আলাইহিস সালাম তার জাতিকে দাওয়াত দিলে তারা বলে,

{قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ} [الشعراء:111]

তারা বলল, ‘আমরা কি তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব, অথচ নিম্নশ্রেণীর লোকেরা তোমাকে অনুসরণ করছে? (*সূরা শু‘আরা ২৬:১১১*)।

অর্থাৎ আমাদের মাঝে যারা দুর্বল তারা (অনুসরণ করবে)। আপনি যদি হক্বের উপর থাকতেন তাহলে শক্তিসম্পন্নরা আপনার অনুসরণ করতো। অন্য আয়াতে আছে,

{وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ}

আমরা দেখছি যে, কেবল আমাদের নীচু শ্রেণীর লোকেরাই বিবেচনাহীনভাবে তোমার অনুসরণ করেছে। *(সূরা হুদ ১১:২৭)*

অর্থাৎ যাদের কোন রায় বা সিদ্ধান্ত নেই, তারাই আপনার অনুসরণ করে। আর তারা এ ব্যাপারে অন্য কোন চিন্তা-ভাবনা করে না।

অনুরূপভাবে রসূল এর যুগে মুশরিকরা দুর্বল মু’মিনদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো। যেমন বিলাল, সালমান, আম্মার ইবনে ইয়াসার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম ও তার মাতা-পিতা এবং দুর্বল ছাহাবীগণকে তারা উপহাস করতো। তারা বলতো, ঐসব দুর্বলরা আপনার নিকটে থাকার কারণে আমরা আপনার সাথে বসবো না। তাদের মজলিশ ভিন্ন অন্যত্র আমাদের বসার ব্যবস্থা করেন। নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জন্য নির্দিষ্ট মজলিশ নির্ধারণ করার ইচ্ছা করলে আল্লাহ তা‘আলা ভর্ৎসনা করে বলেন,

{وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا} [الأنعام: 52، 53]

আর তুমি তাড়িয়ে দিয়ো না তাদেরকে, যারা নিজ রবকে সকাল সন্ধ্যায় ডাকে, তারা তার সন্তুষ্টি চায়। তাদের কোন হিসাব তোমার উপর নেই এবং তোমার কোন হিসাব তাদের উপর নেই, ফলে তুমি তাদেরকে তাড়িয়ে দিবে এবং তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে (*সূরা আল আন‘আম ৬:৫২-৫৩*)।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{أَهَؤُلاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا}

এরাই কি, আমাদের মধ্য থেকে যাদের উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন? *(সূরা আল আন'আম ৬:৫৩)*।

ঐ সব লোকেরা অর্থাৎ দুর্বল ছাহাবীরা। কল্যাণ অর্জনে আমাদের চেয়ে অগ্রগামী হওয়া তাদের সম্ভব নয়।

{لَوْ كَانَ خَيْراً مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ}

যদি এটা ভাল হত তবে তারা আমাদের থেকে অগ্রণী হতে পারত না। *(সূরা আহক্বাফ ৪৬:১১)*

জাহিলদের মত বর্তমানেও অজ্ঞরা আলিমদেরকে আখ্যা দেয় যে, তাদের কোন রায় (সিদ্ধান্ত) ও চিন্তা ভাবনা নেই, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি সংকীর্ণ, তারা পাথরে পরিণত হয়েছে, তারা জটিলতা সৃষ্টি করে, শেষ পর্যন্ত এভাবেই বলতে থাকে।

শাইখ রহিমাহুল্লাহ যে ঐতিহাসিক বিষয় লিপিবদ্ধ করেছেন তা কেবল সর্তকতার উদ্দেশেই করেছেন। যাতে এ বিষয়সমূহের ব্যাপারে তিনি সতর্ক করতে পারেন। কেননা তা জাহিলী বিষয়াদীর অন্তর্ভুক্ত। জাহিলরা তো ফাসেক আলেম ও অজ্ঞ ইবাদতকারীদের অনুসরণ করে।

৯. ফাসিক আলিম ও মুর্খ ইবাদতকারীদের অনুসরণ করা

আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 34]

হে ঈমানদারগণ, নিশ্চয় পন্ডিতগণ ও সংসার বিরাগীদের অনেকেই মানুষের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে, আর তারা আল্লাহর পথে বাধা দেয় এবং যারা সোনা ও রূপা পুঞ্জীভূত করে রাখে, আর তা আল্লাহর রাহে খরচ করে না, তুমি তাদের বেদনাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও *(সূরা আত-তাওবা ৯:৩৪)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيراً وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ} [المائدة: 77]

বল, হে কিতাবীরা, সত্য ছাড়া তোমরা তোমাদের ধর্মের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করো না এবং এমন সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, যারা পূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সোজা পথ বিচ্যুত হয়েছে (*সূরা আল-মায়েদা ৫:৭৭*)।

....

ব্যাখ্যা: জাহিলী বিষয়সমূহ: আলেমদের পাপাচারীতার মাধ্যমে দলীল পেশ করা। ফাসেক হলো জ্ঞান ও আমলগত দিক থেকে যে আল্লাহর আনুগত্য থেকে বের হয়ে যায়। ফাসেক আলেম হচ্ছে যারা জ্ঞানানুযায়ী আমল করে না অথবা আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যারোপ করে, যদিও জানে তারাই মিথ্যাবাদী। নিজেদের খেয়ালখুশি ও কু-প্রবৃত্তির অনুসরণের জন্য তারা আলেমের বেশ ধারণ করে, মানুষ তাদের বিশ্বাস করে। আর ইলম-জ্ঞান ছাড়া আমল করাই হচ্ছে ইবাদতকারীদের পাপাচারীতা। মানুষ ইবাদতকারীদের বিশ্বাস করে বলে থাকে তারাতো নেকলোক।

আলেম ও ইবাদতকারীর দ্বারা প্রতারিত হওয়া যাবে না যতক্ষণ না তাদের প্রত্যেকে সঠিক দীনে বহাল থাকে। ইয়াহুদী খ্রিষ্টানদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 34]

হে ঈমানদারগণ, নিশ্চয় পন্ডিতগণ ও সংসার বিরাগীদের অনেকেই মানুষের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে, আর তারা আল্লাহর পথে বাধা দেয় *(সূরা আত-তাওবা ৯:৩৪)*।

{اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ ... } [التوبة: 31]

তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পন্ডিতগণ ও সংসার-বিরাগীদেরকে রব হিসাবে গ্রহণ করেছে *(সূরা আত-তাওবা ৯:৩১)*।

তারা হারামকে হালাল ও হালালকে হারাম সাব্যস্ত করে, অতঃপর তার অনুসরণ করে। একারণে আল্লাহ তা'আলা ছাড়াই তারা নিজেদেরকে প্রভু হিসাবে গ্রহণ করেছে। এ থেকে আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

হালাল ও হারাম নির্ধারণ করা আল্লাহরই অধিকার। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ও কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ করে হারাম অথবা হালাল নির্ধারণ করার অধিকার কারো নেই। তাতে মানুষ খুশি হয় ও তাল মিলিয়ে চলে। বর্তমানেও মানুষ শরী'আতের পরিবর্তন করছে। মানুষের সাথে তাল মিলিয়ে চলা ও মানুষকে খুশি করার জন্য অনুমান করে হারামকে হালাল করা হচ্ছে। তারা ফন্দি তালাশ করে অনুমোদন চায় অথবা আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যারোপ করে। কেননা আল্লাহ তা'আলা মানুষের স্বার্থেই হালাল ও হারাম নির্ধারণ করেন। (দীনের পরিবর্তনকারী) ঐসব লোকই পাপাচারী আলেম। আর যে আল্লাহর আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যায় সে ফাসেক। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَحْبَارِ} [التوبة: 34

হে ঈমানদারগণ, নিশ্চয় পন্ডিতগণ ও সংসার বিরাগীদের অনেকেই মানুষের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে *(সূরা আত-তাওবা ৯:৩৪)*।

মু'মিনদেরকে সতর্ক করার জন্য এ আহবান করা হয়েছে। আর আহবার (الأحبار) হলো আলেমগণ। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইয়াহুদী আলেমদেরকে বুঝানো হয়ে থাকে। আর রূহবান (الرهبان) তথা ইবাদতকারীগণ। এটাও অধিকাংশ সময় খ্রিষ্টান ইবাদতকারীগণকে বুঝানো হয়।

খ্রিষ্টানদের মাঝে বৈরাগ্যবাদ রয়েছে। আর ইয়াহুদীদের মাঝে বিদ্বান আছে। যদিও ইয়াহুদীরা অভিশপ্ত ও খ্রিষ্টানরা পথভ্রষ্ট। আল্লাহ তা'আলা ছালাতের প্রত্যেক রাক'আতে আমাদেরকে নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করার নির্দেশ দেন:

{اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة:6، 7]

আমাদেরকে সরল পথের হিদায়াত দিন। তাদের পথ, যাদেরকে নি'মাত দিয়েছেন (নাবী, সত্যনিষ্ঠ, শহীদ, সৎকর্মপরায়ণ): যাদের উপর (আপনার) ক্রোধ আপতিত হয় নি এবং যারা পথভ্রষ্টও নয় *(সূরা ফাতিহা ১:৬,৭)*।

{غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ}

যাদের উপর (আপনার) ক্রোধ আপতিত হয়নি

আর খ্রিষ্টানরা আমল ছাড়াই ইলমের অধিকারী। তারাই হলো পাপাচারী আলেম।

{وَلَا الضَّالِّينَ} অর্থাৎ যারা পথভ্রষ্টও নয়

খ্রিষ্টানসহ অন্যান্য জাতির মাঝে বৈরাগ্যবাদী আছে, যারা দলীল-প্রমাণ ছাড়াই আল্লাহর ইবাদত করে। তারা কেবল বিদ'আত, নবাবিষ্কৃত বিষয়ের অনুসরণ ও নির্বুদ্ধিতার বশবর্তী হয়ে আল্লাহর ইবাদত করে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে নিষেধ করেন পাপাচারী আলেম ও পথভ্রষ্ট ইবাদতকারীর নিকট যেতে। আর আদেশ করেন কুরআন ও সুন্নাহর দলীলসহ হক্ব গ্রহণ করতে।

বর্তমানে কোন বিষয়ে কারো জানার আকাঙ্খা হলে সে বলে, অমুক আমাকে এ ফাতওয়া দিয়েছে। কুরআন ও সুন্নাহর দলীলের দিকে ভ্রূক্ষেপ করা ছাড়াই এটা করা হয়। তাই ফাতওয়া দানকারীকে যখন বলা হয়, এটা ভুল ফাতওয়া। তখন সে বলে, আমার কি করার আছে! অমুকতো এর উপর অটল থেকেই ফাতওয়া দিয়েছেন।

যখন কোন ফাতওয়া তার ইচ্ছা বিরোধী হয় তখন সে বলে, এ ফাতওয়া ঠিক নয় অথবা এটা কঠিন ফাতওয়া। আর মিথ্যা ও আলেমদের ভুল-ত্রুটি একত্রিত করে তারা কিতাব আকারে মানুষের মাঝে প্রকাশ করে। মানুষের সামনে তাদের অনুমান ব্যাপক পরিসরে তুলে ধরে বলে, ইসলাম উদার। তোমরা মানুষকে বাধ্য করো না। তাদেরকে যখন বলা হয়, এসব ফাতওয়া কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে পেশ করুন। তখন তারা বলে, এগুলোতো আলেমদের কথা।

কুরআন ও সুন্নাহর চেয়ে কি আলেম বড় হতে পারে! কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে তারা পেশ করে না কেন?! এরূপ কাজ কু-প্রবৃত্তির অনুসারীরাই করতে পারে। এ থেকে আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যারা বলে:

{اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ} [التوبة: 31]

তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পন্ডিতগণ ও সংসার-বিরাগীদেরকে রব হিসাবে গ্রহণ করেছে *(সূরা আত-তাওবা ৯:৩১)।*

যখন তাদেরকে বিদআ'ত থেকে নিষেধ করা হয় যে ব্যাপারে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সতর্ক করেছেন, তখন তারা বলে, অমুক ব্যক্তি এরূপ আমল করে, তিনিতো আলেম অথবা নেকলোক। আর অমুক দেশে এ আমলের প্রচলন আছে। তাদের মাঝেও সৎকর্ম ও তাক্বওয়া

আছে। এক্ষেত্রে আমরা বলবো, সৎকর্ম ও তাক্বওয়া যথেষ্ট নয়। কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক হওয়া আবশ্যক।

সুতরাং কুরআন ও সুন্নাহর দলীল ছাড়াই আলিম ও ইবাদতকারীদের কথাকে তারা সঠিক সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করে। এটাই জাহিলদের পদ্ধতি যারা তাদের আলেম ও ইবাদতকারীদেরকে প্রভু হিসাবে গ্রহণ করেছে।

১০. দীনদারদেরকে অহেতুক বুঝের স্বল্পতা এবং মুখস্থ না করার দোষে দোষী করা

দীনের অনুসারীদের বুদ্ধিমত্তার কমতি ও মুখস্থ শক্তি না থাকার অজুহাতে দীনকে বাতিল হিসাবে প্রমাণ করা। আল্লাহ তা'আলার বাণী:

{بَادِيَ الرَّأْيِ} [هود: 27] অর্থাৎ বিবেচনাহীনভাবে (সূরা হূদ: ২৭)

....

ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'আলা নূহ আ. এর জাতির কথা উল্লেখ করে বলেন,

{وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا} [هود: 27]

আমরা দেখছি যে, কেবল আমাদের নীচু শ্রেণীর লোকেরাই বিবেচনাহীনভাবে তোমার অনুসরণ করেছে। আর আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব আমরা দেখছি না। বরং আমরা তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী মনে করছি *(সূরা হূদ ১১: ২৭)।*

অর্থাৎ দুর্বলরা। {بَادِيَ الرَّأْيِ} তথা যাদের কোন বুঝশক্তি নেই-নির্বোধ। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসারীদের বোধশক্তি, দক্ষতা ও চিন্তা-চেতনা নেই বলে তাদেরকে তারা তিরস্কার করে। বর্তমানে অনেক বিপথগামী ও আল্লাহর শত্রুরা এ ব্যাপারে দাম্ভিকতার সাথে চলছে। আর মুসলিম ও তাদের আলেমদেরকে নিয়ে তারা তামাশা করে। কারণ তাদের নাকি বুঝশক্তি ও দুরদর্শন নেই। তাই মুসলিমদের আলেমগণ

বিচক্ষণ সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে এ অপবাদ দিয়ে তারা নিন্দা জ্ঞাপন করে। কেননা আলেমরা আল্লাহর কিতাবের মাধ্যমেই চিন্তা গবেষণা করে। তারা আল্লাহর নির্দেশ পালন করতে বলেন এবং আল্লাহ তা'আলা যা নিষেধ করেন তা থেকে দুরে থাকতে বলেন।

সন্দেহ নেই যে, রসূলগণের পরে নেক আমলকারী আলেমগণ উত্তম মানুষ হিসাবে বিবেচিত। তারকারাজীর উপর চাঁদের মর্যাদা যেমন ইবাদতকারীর উপর আলেমের মর্যাদা তেমনই। সুতরাং যারা জাহিলদের সমকক্ষ তারা ব্যতীত আলেমদের বোধশক্তি না থাকা ও চিন্তা-চেতনার স্বল্পতার অভিযোগে তাদেরকে নিন্দা ও তিরস্কার করা যাবে না। নুহ আ. এর জাতি রসূলগণের অনুসারীদেরকে অনুরূপভাবে তিরস্কার করতো। যাতে মানুষ রসূলগণের নিকট থেকে পলায়ন করে। বর্তমানেও কিছু মানুষের মুখ থেকে তিরস্কারমূলক কথা প্রকাশ পায়। তারা বলে, ঐ সকল আলেমগণ কেবল হায়েয ও নেফাসের মাসআলা এবং জামরায় পাথর নিক্ষেপের বিধান নিয়ে আলোচনা করে। তাদের ধারণায় এসব আলেম স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী, তাদের আধুনিক কোন জ্ঞান নেই। জাহিলদের নিকট রাজনীতির জ্ঞান ও নের্তৃত্বের মোহই আধুনিকতা।

১১-১২. বাতিল ক্বিয়াসের উপর নির্ভর করা ও ছহীহ ক্বিয়াসকে প্রত্যাখ্যান করা

ভ্রষ্ট ক্বিয়াসের মাধ্যমে দলীল পেশ করা। যেমন আল্লাহর বাণী:

{إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا} [إبراهيم: 10]

তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ *(সূরা ইবরাহীম ১৪:১০)।*

আর বিশুদ্ধ ক্বিয়াসকে অস্বীকার করা: জামে ও তার পূর্ববর্তী বিষয় অস্বীকার করা। জামে ও ফারেকের জ্ঞান না থাকা।[২৫]

---

২৫. জামে (الجامع) বলা হয় যার উপর ভিত্তি করে কিয়াস গঠিত হয়। আর ফারেক (الفارق) হলো যে বিষয়ের মাধ্যমে কিয়াস বিশুদ্ধ হয় না ।

....

ব্যাখ্যা: উসূলবিদদের নিকট : ক্বিয়াস (তুলনা) দু'প্রকার:

১. ক্বিয়াসু ইল্লাহ (কারণগত ক্বিয়াস)। একই হুকুমে মূল ও শাখা উভয়টি একত্রিত করার জন্য মৌলিক বিষয়ের সাথে শাখা মিলানো। শর্তসমূহের মধ্যে কোন একটি শর্ত ভঙ্গ হলে তা ভ্রান্ত ক্বিয়াস হিসাবে গণ্য হবে। কোন বিধান সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে এর উপর নির্ভর করা যাবে না। এটি একটি মারাত্মক সমস্যা। ইবনুল কাইয়ুম রহিমাহুল্লাহ বলেন, ভ্রান্ত ক্বিয়াসের কারণে অধিকাংশ মানুষ বিপথগামী হয়। আর প্রথমে ক্বিয়াস চর্চা করে ইবলিশ। আদম আলাইহিস সালামকে সিজদা করার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাকে নির্দেশ দিলে সে বলে,

{قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ} [الأعراف: 12]

তিনি বললেন, কিসে তোমাকে বাধা দিয়েছে যে, সিজদা করছ না, যখন আমি তোমাকে নির্দেশ দিয়েছি? সে বলল, আমি তার চেয়ে উত্তম। আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন কাদামাটি থেকে *(সূরা আরাফ ৭:১২)*।

সে ধারণা করে মাটি থেকে আগুন উত্তম। তাই সে আদমের চেয়ে নিজেকে উত্তম মনে করে। এটা ছিল ইবলিশের ভ্রান্ত ক্বিয়াস-তুলনা। কেননা আগুন কখনো মাটির চেয়ে উত্তম হতে পারে না। বরং মাটিই আগুনের চেয়ে উত্তম। কারণ আগুন সাধারণত সব জিনিসকে পুড়িয়ে ধ্বংস করে করে দেয়। অথচ মাটি বিভিন্ন জিনিস ও শস্য উৎপন্ন করে, তাতে মানুষের কল্যাণ রয়েছে। আর যদি আমরা ক্বিয়াসের দিকে অগ্রসর হতাম, তাহলে বলতাম আগুন থেকে মাটি উত্তম। এ ধরণের তুলনা করা ক্বিয়াস নয়। বরং আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ও অনুগ্রহের উপরই নির্ভর করতে হবে। কারণ আল্লাহ যা চান ও যা ইচ্ছা করেন তাই হয়। আল্লাহ তা'আলার রয়েছে পূর্ণ হেক্বমাত।

অনুরূপভাবে মুশরিকরাও ক্বিয়াস করে রসূলগণকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে বলতো,

{إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا} [إبراهيم: 10]

তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ *(সূরা ইবরাহীম ১৪:১০)*।

রসূলগণ মানুষ হওয়ার কারণে তাদের উপর রিসালাত বিশুদ্ধ না হওয়ার উপর মুশরিকরা প্রমাণ পেশ করে। তাদের ধারণায় মানুষের উপর রিসালাত বিশুদ্ধ নয়। রিসালাতের ব্যাপারে এটা তাদের ক্বিয়াস। এ ধরণের ক্বিয়াস বাতিল। কেননা তা বিভেদ সৃষ্টিকারী ক্বিয়াস। আল্লাহ তা'আলা রসূলগণকে অন্যদের উপর মর্যাদা দান করেছেন এবং তাদেরকে পছন্দ করে বাছাই করেছেন। আর তাদের অবস্থা ও রিসালাতের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

{اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ} [الحج: 75،76]

আল্লাহ, ফিরিশতা ও মানুষের মধ্য থেকে রসুল মনোনীত করেন। অবশ্যই আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্ব দ্রষ্টা *(সূরা হাজ্জ ২২:৭৫,৭৬)*।

এ কারণে তারা রসূলগণকে বলতো,

{إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ} [إبراهيم: 11]

তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ, তোমরা আমাদেরকে আমাদের পিতৃ-পুরুষরা যার ইবাদাত করত, তা থেকে ফিরাতে চাও। অতএব তোমরা আমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আস। তাদেরকে তাদের রসূলগণ বলল, আমরা তো কেবল তোমাদের মতই মানুষ, কিন্তু আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন *(সূরা ইবরাহীম ১৪:১১)*।

রসূলগণ বলতেন, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মর্যাদা দিয়েছেন এবং অনুগ্রহ করে রিসালাতের জন্য আমাদেরকে বাছাই করেছেন। তাই তোমাদের ক্বিয়াস বিভেদ সৃষ্টিকারী। সব মানুষ সমান নয় তাই তারা

সমপর্যায়ে থাকতে পারে না। মানুষের মাঝে কাফির, মু'মিন, রসূল, আলেম, সৎলোক, অজ্ঞ ও ফাসেক সবই আছে। তাই মানুষের মাঝে ব্যবধান বিদ্যমান। বিভেদপূর্ণ :ক্বিয়াস পরিত্যাজ্য। কেননা উসূলবিদদের নিকট এ ধরণের: ক্বিয়াস নিকৃষ্ট। মানুষের নিকট তাদের মধ্য থেকে রসূলগণের আগমনই যুক্তিযুক্ত, যাতে তিনি তাদেরকে বুঝাতে পারেন।

{قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكاً رَسُولاً} [الإسراء:95]

বল, 'ফেরেশ্‌তারা যদি যমীনে চলাচল করত নিশ্চিন্তভাবে তাহলে আমি অবশ্যই আসমান হতে তাদের কাছে ফেরেশ্‌তা পাঠাতাম রসূল হিসাবে' *(সূরা বনী ইসরাঈল ১৭:৯৫)*।

তাই মানুষের নিকট রিসালাত পৌঁছে দেয়ার জন্য রসূলগণ দাঈ হিসাবে গণ্য। আর মানুষের মধ্যে থেকে রসূল হওয়া যুক্তিযুক্ত। পৃথিবীতে বসবাসকারীগণ যদি ফেরেস্তা হতো তাহলে তাদের জন্য ফেরেস্তাদের মধ্যে থেকে রসূল আসতেন।

ঐ সব জাহিলদের বিষয় বড়ই আশ্চর্য! মানুষের মধ্যে থেকে রিসালাত প্রাপ্ত হওয়াকে জাহিলরা অসম্ভব মনে করে। অথচ পাথরের ইবাদত করাকে তারা কিভাবে সম্ভব মনে করে! কিন্তু পাথর ও গাছকে প্রভূ ও উপাস্য স্বীকার করাকেই তারা সম্ভব মনে করে। এতদসত্ত্বেও মানুষের রিসালাত প্রাপ্ত হওয়াকে তারা স্বীকার করে না এবং সম্ভব মনে করে না!

নূহ আলাইহিস সালাম এর কাফির সম্প্রদায় ও অন্যান্যরা এ বাতিল ক্বিয়াসের উপরই ছিল। রসূলগণ মানুষ হওয়ায় তারা রিসালাতকে অস্বীকার করতো। রসূলগণ মানুষ হওয়ার কারণে নূহ আলাইহিস সালাম এর জাতিসহ অন্যরা তাদের রিসালাতকে অস্বীকার করতো। নূহ আলাইহিস সালাম এর জাতি বলেছিল,

{مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ} [المؤمنون: 24،25]

এতো তোমাদের মত একজন মানুষ ছাড়া কিছুই না। সে তোমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে চায়। আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে অবশ্যই ফেরেশ্তা নাযিল করতেন। এ কথাতো আমরা আমাদের পূর্বতম পিতৃ-পুরুষদের সময়েও শুনিনিসে কেবল এমন এক লোক, যার মধ্যে পাগলামী রয়েছে। অতএব তোমরা তার সম্পর্কে কিছুকাল অপেক্ষা কর *(সূরা মু'মিনূন ২৩:২৪,২৫)*।

অনুরূপভাবে অন্যান্য জাতিরাও বলতো আর কুরাইশরা মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যাপারে বলেছিল,

{أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا} [القمر: 25]

আমাদের মধ্য থেকে কি তার ওপরই উপদেশবাণী পাঠানো হয়েছে ? বরং সে চরম মিথ্যাবাদী অহংকারী *(সূরা আল-ক্বামার ৫৪:২৫)*।

কাফিরদের নিকট বহুল প্রচলিত রীতি হলো ভ্রান্ত ক্বিয়াস করা।

২. ক্বিয়াসুস শিবহি (قياس الشبه) বা সাদৃশ্য মূলক ক্বিয়াস।

তা হলো দু'টি মূলের মাঝে শাখাকে পুনরাবৃত্তি করা, তারপর মূল দু'টির সাথে বেশি সাদৃশ্যতা সংযোজন করা। আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য করা যাবে না। সৃষ্টির উপর কোন ক্বিয়াস হয় না। কোন ক্বিয়াসই আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যতায় সমান নয়। একমাত্র আল্লাহ তা'আলার অধিকারের ক্ষেত্রে উত্তম ক্বিয়াস ব্যবহৃত হবে। আর তা হলো এভাবে বলা যে, প্রত্যেক পূর্ণতা সৃষ্টির জন্যই সাব্যস্ত, আর স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলাই তার সৃষ্টি হ্রাস করার প্রয়োজন অনুভব করতে পারেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [النحل: 60]

আল্লাহর জন্য রয়েছে মহান উদাহরণ। আর তিনিই পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী *(সূরা আন নাহাল ১৬:৬০)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [النحل:74]

তোমরা আল্লাহর জন্য কোন দৃষ্টান্ত স্থাপন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ জানেন আর তোমরা জান না *(সূরা আন নাহাল ১৬:৭৪)*।

পরবর্তী বিষয়: বিশুদ্ধ ক্বিয়াসকে তারা অস্বীকার করে। তা হলো: মানুষের মধ্যে থেকে রসূল হিসাবে তাদের নিকট মানুষই আগমন করা এবং ফেরেস্তাদের মধ্যে থেকে রসূল হিসাবে ফেরেস্তাই আগমন করা। এটা বিশুদ্ধ ক্বিয়াস যা বিচক্ষণতার দাবী রাখে যে, প্রেরিত ব্যক্তিকে যাদের নিকট প্রেরণ করা হবে তিনি তাদের মত সমজাতীয় হবেন, অন্য কোন জাতের হবেন না। যারা এ দু'টি বিষয়ে মানুষকে প্ররোচিত করে তারা জামি (ক্বিয়াসের ভিত্তি) ও ফারিক (যা দ্বারা ক্বিয়াস শুদ্ধ হয় না) এর ব্যাপারে অজ্ঞ।

জামি (الجامع) বলা হয় যার উপর ভিত্তি করে ক্বিয়াস গঠিত হয়। আর ফারিক (الفارق) হলো যে বিষয়ের মাধ্যমে ক্বিয়াস বিশুদ্ধ হয় না ।

১৩. বিদ্বান (আলিম) ও নেক লোকদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা

আলিম ও নেকলোকদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা জাহিলিয়্যাত। আল্লাহর বাণী:

{يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ} [النساء: 171]

হে কিতাবীগণ, তোমরা তোমাদের দীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহর উপর সত্য ছাড়া বলো না *(সূরা আন নিসা ৪:১৭১)*।

....

ব্যাখ্যা: এটি একটি মারাত্মক বিষয়। (الغلو) এর আভিধানিক অর্থ: সীমা অতিক্রম করা (الزيادة عن الحد)। যেমন উদাহরণ স্বরূপ: যখন হাড়িতে পানিপূর্ণ হয়ে উথলিয়ে যায় তখন বলা হয় (غلا القدر) হাড়ি উথলিয়ে গেছে। (غلا السعر) অর্থাৎ ভালো কাজের সীমা অতিক্রম করা।

সুতরাং বাড়াবাড়ি (الغلو) হচ্ছে কোন জিনিসের অতিরিক্ততা ও ভাল বিষয়েরও সীমাতিক্রম করা। **الزيادة والارتفاع عن الحد المعروف**

শরীয়তের পরিভাষায় তা হচ্ছে কোন ব্যক্তিকে তার যথোপযুক্ত অবস্থান থেকে উপরের অবস্থানে নিয়ে যাওয়া। যেমন নাবীগণ অথবা নেকলোকদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা, তাদের ক্ষমতাকে রব অথবা উপাস্যের পর্যায়ে তুলে ধরা। জাহিলরা বিভিন্ন ব্যক্তিকে বাড়াবাড়ি মূলক ক্ষমতাবান মনে করে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার সাথে রব হিসাবে গ্রহণ করে। যেমন ইয়াহুদীরা উযাইর আলাইহিস সালাম এর ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করে তাকে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করেছে। আর মানুষের মধ্যে থেকে মারইয়ামের পুত্র ও তার রিসালাতের ব্যাপারে খ্রিষ্টানরা সীমালঙ্ঘন করে আল্লাহর পুত্র হিসাবে রবের পর্যায়ে নির্ধারণ করেছে।

অনুরূপভাবে নূহ আলাইহিস সালাম এর জাতি নেক লোকদের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করেছে। তারা নেক লোকদের মূর্তি তৈরি করার পর আল্লাহ তা'আলাকে বাদ দিয়ে রবের মর্যাদা স্বরূপ তাদের ইবাদত করতো।

{وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدّاً وَلا سُوَاعاً وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً} [نوح:23]

আর তারা বলে, 'তোমরা তোমাদের উপাস্যদের বর্জন করো না; বর্জন করো না ওয়াদ, সুওয়া', ইয়াগূছ, ইয়া'উক ও নাসরকে' *(সূরা নূহ ৭১:২৩)*।

অর্থাৎ তাদেরকে তারা উপাস্য নির্ধারণ করতো। অনুরূপভাবে নূহ আলাইহিস সালাম এর জাতি ছাড়াও বর্তমানে মুশরিকদের বিভিন্ন সম্প্রদায় নেক লোকদের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে। আর তারা নেক লোকদের কবর

তাওয়াফ করে তাদের জন্য পশু উৎসর্গ করে, মানত করে, মৃতদের নিকট সাহায্য কামনা করে, সাহায্যের আবেদন তুলে ধরে ও তাদের নিকট অভাব অভিযোগের জন্য সমাধান তালাশ করে। তাই যারা ধৃষ্টতা দেখায় তারা এরূপ শিরকের দিকে ধাবিত হয়।

এ জন্য নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لا تُطْرُونِي كما أطرت النصارى ابن مريم" والإطراء هو: الغلو في المدح "إنما أنالا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله

তোমরা আমার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করিও না যেমন খ্রিষ্টানরা মারইয়ামের পুত্রকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে। আর এখানে ধৃষ্টতা বলতে প্রশংসায় অতিরঞ্জন করা। আমি কেবল বান্দা নই বরং তোমরা বলো আল্লাহর বান্দা ও রসূল।[২৬]

নাবী ও নেকলোকদের বাড়াবাড়ি কিতাবধারী ও উম্মি (নিরক্ষর) লোকদেরকে শিরকে আকবারে (বড় শিরকে) লিপ্ত করে। মানুষদের জানা আবশ্যক নাবী ও নেকলোকদের ক্ষমতা কতটুকুন। তাহলে রসূলগণের রিসালাত সম্পর্কে জানা যাবে, নেকলোকদের সঠিক পন্থা ও আলেমদের ইলম সম্পর্কেও জানা যাবে যে তারা অন্যদের থেকে উত্তম। তারকারাজীর উপর চন্দ্রের যেমন মর্যাদা আবেদের উপর আলেমের মর্যাদা তেমনই। ফলে মানুষ তাদের উপযুক্ত মর্যাদা দিবে, তাদের মর্যাদার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করবে না।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ} [النساء: 171]

২৬. ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৪৪৫।

হে কিতাবীগণ, তোমরা তোমাদের দীনের মধ্যে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহর উপর সত্য ছাড়া বলো না। মারইয়ামের পুত্র মাসীহ ঈসা কেবলমাত্র আল্লাহর রসূল এবং তাঁর কালিমা, যা তিনি প্রেরণ করেছিলেন মারইয়ামের প্রতি ও তাঁর পক্ষ হতে রূহ। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলগণের প্রতি ঈমান আন এবং বল না, তিন *(সূরা নিসা ৪:১৭১)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيراً وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ} [المائدة:77]

বল, হে কিতাবীরা, সত্য ছাড়া তোমরা তোমাদের ধর্মের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করো না এবং এমন সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, যারা পূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সোজা পথ বিচ্যুত হয়েছে *(সূরা আল-মায়েদা ৫:৭৭)*। নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين

তোমরা দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা থেকে বিরত থাকো। কেননা দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ির কারণে তোমাদের পূর্ববর্তী জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে।[২৭]

তাই সৃষ্টির ব্যাপারে বাড়াবাড়ি বৈধ নয়। আর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যে অবস্থানে রেখেছেন তার উপর অতিরঞ্জন করাও বৈধ নয়। কেননা এটা আল্লাহ তা'আলার সাথে শিরকের দিকে ধাবিত করে। অনুরূপভাবে আলেম এবং আবেদের ব্যাপারেও ধৃষ্টতা বৈধ নয়। ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ} [التوبة: 31]

---

২৭. ছহীহ: নাসাঈ ৩০৫৭, ইবনে মাজাহ ৩০২৯, মুসনাদে আহমাদ ৪৩৭, ছহীহ জাে ২৬৮০।

তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পন্ডিতগণ ও সংসার-বিরাগীদেরকে রব হিসাবে গ্রহণ করেছে *(সূরা আত-তাওবা ৯:৩১)*।

তাদের আলেম ও ইবাদতকারীদের নিয়ে তারা বাড়াবাড়ি করে। আর হারামকে হালাল ও হালালকে হারাম করার ব্যাপারে ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানরা তাদেরকে সঠিক বলে বিশ্বাস করে। আর পবিত্র শরী'আত বিকৃত করে।

১৪. হক্ব অস্বীকার করা এবং বাতিল সাব্যস্ত করা

পূর্বে যা আলোচনা হয়েছে তা নেতিবাচক ও ইতিবাচক নিয়মের উপর নির্ভরশীল। জাহিলরা কু-প্রবৃত্তি ও ধারণার অনুসরণ করে। রসূলগণ যা নিয়ে এসেছেন তা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়।

....

ব্যাখ্যা: জাহিলদের সম্পর্কে শাইখ রহিমাহুল্লাহ যে সব বিষয় পূর্বে আলোচনা করেছেন, তা ইতিবাচক ও নেতিবাচকতার ভিত্তিতে হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যা নিষেধ করেন জাহিলরা তা সঠিক সাব্যস্ত করে এবং তিনি যা সঠিক সাব্যস্ত করেন তারা সেটাকে নিষিদ্ধ মনে করে। এ কারণে তারা ভ্রষ্টতায় নিমোজ্জিত।

আল্লাহ তা'আলা শিরককে নিষিদ্ধ করেছেন, তাওহীদকে সাব্যস্ত করেছেন, একত্বের নির্দেশ দিয়েছেন অথচ জাহিলরা এর বিরোধিতা করে। জাহিলরা শিরক সাব্যস্ত করে ও তাওহীদকে নাকোচ করে। আবার (لا إله إلا الله) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন মাবুদ নেই এ কালেমার পূর্ণ অর্থেরও বিরোধিতা করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} [العنكبوت: 52]

আর যারা বাতিলে বিশ্বাস করে ও আল্লাহকে অস্বীকার করে, তারাই ক্ষতিগ্রস্থ *(সূরা আনকাবূত ২৯:৫৩)*।

বাতিলকে বিশ্বাস করা নেতিবাচক দিক। অথচ বাতিলকে অস্বীকার করার বদলে এর প্রতি বিশ্বাস রেখে তারা তা সঠিক সাব্যস্ত করে। আর আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনয়ন করা ইতিবাচক দিক। অথচ তারা আল্লাহকে অস্বীকার করে। তারা বাতিলকে বিশ্বাসের কারণে আল্লাহর একত্বকে নাকোচ করে। আর নেতিবাচক তথা বাতিলকে তারা সাব্যস্ত করে ও ইতিবাচক তথা একত্বকে নাকোচ করে সর্বোপরি আল্লাহকে অস্বীকার করে।

এটাই জাহিলী রীতি যার উপর তারা পরিচালিত হয় ও ভ্রষ্টতায় ডুবে থাকে। তাদের অবস্থাদী পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে তারা কখনো জাহিলী রীতি থেকে বের হবে না।

যে আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করে সে মূলতঃ আল্লাহ যা সাব্যস্ত করেন তা অস্বীকার করে। আর আল্লাহ যা নিষিদ্ধ করেন সে তা সাব্যস্ত করে। আর যে হারামকে হালাল ও হালালকে হারামে পরিনত করে, সে এ শ্রেণীর জাহিলদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা যা হালাল করেন যে তা নাকোচ করে ও হারামকে সাব্যস্ত করে সে জাহিলী রীতিরই অনুসারী বলে গণ্য। কোন জাহিলী কর্মকান্ড থেকে সে মুক্ত হতে পারে না। আর যে আল্লাহর একত্বকারীদের বিরুদ্ধে শত্রুতা রাখে ও মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব করে, সে আল্লাহ তা'আলার সাব্যস্তকৃত বিষয়কে নাকোচ করে ও আল্লাহ তা'আলা যা নাকোচ করেছেন তা সাব্যস্ত করে। কেননা আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের সাথে বন্ধুত্বের নির্দেশ দিয়েছেন এবং মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব নিষেধ করেছেন।

১৫. মিথ্যা অজুহাত পেশ করে হক্ব গ্রহণ না করা

আল্লাহ তা‘আলা যা দিয়েছেন তা না বুঝেই তার অনুসরণ থেকে বিরত থাকার অজুহাত পেশ করা। আল্লাহর বাণী:

{وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ} [البقرة: 88] ، {يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِمَّا تَقُولُ} [هود: 91] ،

আর তারা বলল, আমাদের অন্তরসমূহ আচ্ছাদিত (সূরা বাক্বারাহ ২:৮৮)। তারা বলল, হে শু‘আইব, তুমি যা বল, তার অনেক কিছুই আমরা বুঝি না *(সূরা হুদ ১১:৯১)*।

আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করেছেন। আর আল্লাহ তা‘আলা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তাদের কুফরীর কারণেই তারা বিমুখ হয়েছে।

....

ব্যাখ্যা: অর্থাৎ তারা হক্ব না বুঝার কারণে তা কবুল করতে অজুহাত পেশ করে। যেমন মহান আল্লাহ ইয়াহুদীদের ব্যাপারে উল্লেখ করেন, যখন তাদেরকে রসূল ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন তখন তারা বলেছিল,

{قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلاً مَا يُؤْمِنُونَ} [البقرة: 88] ،

আর তারা বলল, আমাদের অন্তরসমূহ আচ্ছাদিত। বরং তাদের কুফরীর কারণে আল্লাহ তাদেরকে লা‘নত করেছেন। অতঃপর তারা খুব কমই ঈমান আনে *(সূরা বাক্বারাহ ২:৮৮)*।

(غُلْفٌ) অর্থাৎ অন্তরে আবরণ রয়েছে, তাতে রসূলের কথা পৌঁছবে না এবং তার কথায় তাদের অন্তর শান্তিও পাবে না। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার ব্যাপারে এ অজুহাতকে দলীল হিসাবে তারা গ্রহণ করেছে। এটিই আয়াতের প্রসিদ্ধ অর্থ।

আর দ্বিতীয় অর্থ হলো (وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ) অর্থাৎ অন্তর জ্ঞানে পূর্ণ তাই কারো কথার প্রয়োজন নেই। তাদের ধারণায় রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যে, তারা যা বলে তা নিষ্প্রয়োজন। বরং প্রয়োজনীয়তা হলো আল্লাহ তা'আলা তাদের কুফরীর কারণে তাদেরকে ভর্ৎসনা করেন। অর্থাৎ কুফরীর কারণে তাদেরকে তার রহমত থেকে বিতাড়িত করে দূরে সরিয়ে দেন। কুফরীর কারণে তারা হক্ব গ্রহণ করতে পারে না। এখানে 'بِ' পদটি সাবাব তথা 'কারণ' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা তারা বুঝবে না কেননা তাকে তারা ভ্রূক্ষেপ করে না এবং তার কথায় মনোনিবেশও করে না। বিমুখতার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য শাস্তি নির্ধারণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ} [الصف: 5]

অতঃপর তারা যখন বক্রপথ অবলম্বন করল, তখন আল্লাহ তাদের হৃদয়গুলোকে বক্র করে দিলেন। আর আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না *(সূরা ছাফ ৬১:৫)*।

তাই যে হক্ব গ্রহণ করবে না আল্লাহ তা'আলা তাকে বাতিলে নিমোজ্জিত করে পরীক্ষা করেন। এরপর অন্তর বিকৃত হওয়ার কারণে সে আর হক্ব গ্রহণ করে না। আমরা এ থেকে আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلاً مَا يُؤْمِنُونَ} [البقرة: 88]

বরং তাদের কুফরীর কারণে আল্লাহ তাদেরকে লা'নত করেছেন। অতঃপর তারা খুব কমই ঈমান আনে *(সূরা আল বাক্বারাহ ২:৮৮)*।

{فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيراً وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ} [النساء: 160، 161]

সুতরাং ইয়াহূদীদের যুলমের কারণে আমি তাদের উপর উত্তম খাবারগুলো হারাম করেছিলাম, যা তাদের জন্য হালাল করা হয়েছিল এবং আল্লাহর রাস্তা থেকে অনেককে তাদের বাধা প্রদানের কারণে। আর তাদের সুদ গ্রহণের কারণে, অথচ তা থেকে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল এবং অবৈধভাবে মানুষের সম্পদ খাওয়ার কারণে *(সূরা আন নিসা ৪:১৬০,১৬১)*।

ইয়াহুদীদের ব্যাপারে অন্তর বিমুখতার কথা এসেছে। তাদের কথা **(قُلُوبُنَاغُلْفٌ)** অর্থাৎ আমাদের অন্তর আচ্ছাদিত, কথাটি শুদ্ধ নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলাই তাদের জন্য শাস্তিস্বরূপ অন্তরকে পরিবর্তন করেন। আর অন্তরের মৌলিকত্ব হলো তা পরিবর্তনের স্বভাব বজায় থাকা। স্বভাব অনুযায়ী তা হক্ব গ্রহণের ক্ষমতা রাখে। আর ফিতরাত (স্বভাব) বিকৃত হলে অন্তর হক্ব গ্রহণ করে না। অন্তর যেন জমিনের মতই, জমিন অকেজো হলে তা বিলে পরিণত হয়। তাতে ফসল উৎপন্ন হয় না। অনুরূপ অন্তরও অকেজো হলে তা হক্ব গ্রহণ করে না।

অনুরূপভাবে শুয়াইব আ. এর জাতিও বিকৃত। শুয়াইব আ. নাবীগণের মধ্যে বাগ্মীতায় পারদর্শি ও স্পষ্টভাষী ছিলেন। তার স্পষ্টভাষণ ও অলংকারপূর্ণ বক্তব্যে ও প্রভাবসম্পন্ন কথার জন্য তাকে নাবীগণের খতিব উপাধি দেয়া হয়। এ সত্ত্বেও তার জাতি বলতো, আল্লাহর বাণী:

{قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيراً مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفاً وَلَوْلا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ} [هود: 91]

তারা বলল, হে শু'আইব, তুমি যা বল, তার অনেক কিছুই আমরা বুঝি না। আর তোমাকে তো আমরা আমাদের মধ্যে দুর্বলই দেখতে পাচ্ছি। যদি তোমার আত্মীয়-স্বজন না থাকত, তবে আমরা তোমাকে অবশ্যই পাথর মেরে হত্যা করতাম। আর আমাদের উপর তুমি শক্তিশালী নও *(সূরা হূদ ১১:৯১)*।

তারা শুয়াইব আলাইহিস সালাম এর কথা বুঝতো না। কেননা আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলের মত তাদের অন্তর মহরাঙ্কিত করেছেন। আল্লাহ তা'আলার রীতি হলো যারা হক্ব থেকে অহংকার বশতঃ মুখ ফিরিয়ে নিবে,

হক্ব পৌঁছার পরও তা গ্রহণ করবে না, আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তর বিকৃত করার মাধ্যমে শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে পরীক্ষায় ফেলবেন।

অনুরূপভাবে কুরাইশ কাফিররা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কি বলেছিল?

{وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ} [فصلت: 5]

আর তারা বলে, তুমি আমাদেরকে যার প্রতি আহ্বান করছ সে বিষয়ে আমাদের অন্তরসমূহ আচ্ছাদিত, আমাদের কানের মধ্যে রয়েছে বধিরতা আর তোমার ও আমাদের মাঝে রয়েছে অন্তরায়, অতএব তুমি তোমার কাজ কর, নিশ্চয় আমরা (আমাদের) কাজ করব *(সূরা ফুসসিলাত ৪১:৫)*।

কাফিরদের পন্থা একই। রসূলগণের কথা না বুঝার কারণে তারা তাদের দাওয়াতের বিরোধিতা করে। এটা কি রসূলগণের দাওয়াত পৌঁছানোর ব্যর্থতা? না বরং কাফিরদের কুফরীর প্রবণতা, হক্ব থেকে বিমুখতা, হক্বের প্রতি মনোনিবেশ না করা ও কল্যাণ মূলক কাজে আগ্রহ না থাকারই ব্যর্থতা।

১৬. ইয়াহূদী কর্তৃক তাওরাতের পরিবর্তে যাদুর পুস্তক গ্রহণ করা

আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদীদেরকে যে কিতাব দিয়েছেন তা থেকে তারা যাদু পুস্তক রচনার মাধ্যমে বিনিময় গ্রহণ করে। মহান আল্লাহ তা'আলা তা উল্লেখ করে বলেন,

{وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ}

আর যখন তাদের নিকট আল্লাহর কাছ থেকে একজন রসূল এল, তাদের সাথে যা আছে তা সমর্থন করে, আহলে কিতাবের একটি দল আল্লাহর কিতাবকে তাদের পেছনে ফেলে দেয়, (এভাবে যে) মনে হয় যেন তারা জানে না। আর তারা অনুসরণ করেছে, যা শয়তানরা সুলাইমানের রাজত্বে পাঠ করত। আর সুলাইমান কুফরী করেনি। বরং শয়তানরা কুফরী করেছে। তারা মানুষকে যাদু শেখাত *(সূরা আল বাক্বারাহ ২:১০১,১০২)*।

....

ব্যাখ্যা: তাওরাতে মুহাম্মাদ এর গুণাবলী বর্ণিত আছে এবং তাকে অনুসরণ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে, ইয়াহুদীরা তা অস্বীকার করতো।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْأِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ} [الأعراف: 157]

যারা অনুসরণ করে রসূলের যে উম্মী নাবী ; যার গুণাবলী তারা নিজেদের কাছে তাওরাত ও ইঞ্জিলে লিখিত পায়, যে তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ দেয় ও বারণ করে অসৎ কাজ থেকে এবং তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করে আর অপবিত্র বস্তু হারাম করে। আর তাদের থেকে বোঝা ও শৃংখল যা তাদের উপরে ছিল অপসারণ করে *(সূরা আল আরাফ ৭:১৫৭)*।

এমনিভাবে ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে ইনজিলে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{يَا بَنِي إِسْرائيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ} [الصف: 6]

'হে বণী ইসরাঈল! নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর রসূল। আমার পূর্ববর্তী তাওরাতের সত্যায়নকারী এবং একজন রসূলের সুসংবাদদাতা যিনি আমার পরে আসবেন, যার নাম আহমদ'। অতঃপর সে যখন সুস্পষ্ট

নিদর্শনসমূহ নিয়ে আগমন করল, তখন তারা বলল, ‘এটাতো স্পষ্ট যাদু’ *(সূরা ছাফ ৬১:৬)*।

রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম, তার রিসালাত ও তার গুণাবলীর কথা তাওরাত ও ইনজিলে উল্লেখ আছে, এমনকি ইয়াহুদীরা তাদের সন্তানদের মতই রসূল সা. কে চিনলেও আল্লাহর কিতাব তাওরাতকে অস্বীকার করলো ও তাকে বর্জন করলো। আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে পরীক্ষায় ফেললেন এভাবে যে, তারা শয়তানের কর্ম যাদুর কিতাব গ্রহণ করলো।

তারা শয়তানের কর্ম দ্বারা বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহ তা‘আলার অহীর পরিবর্তন ঘটালো, যা তাদের শাস্তি হিসাবে নির্ধারিত। যারা হক্ব থেকে বিমুখ হয়, আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে বাতিলে নিমোজ্জিত করেন।

যারাই হক্ব পরিত্যাগ করে তাদেরকে বাতিলের পরীক্ষায় পড়তে হয়। আল্লাহর একত্ব ও একমাত্র আল্লাহর ইবাদাতের ব্যাপারে যারা রসূলগণের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে, তাদের জন্য স্পষ্ট বর্ণনা হলো তারা শিরক ও কুসংস্কারে লিপ্ত থাকার মাধ্যমে পরীক্ষায় পড়ে। আর শিরক ও কুসংস্কারের পক্ষে দলীল পেশ করে বাতিলকে হক্ব হিসাবে মানুষের মাঝে প্রচার করে।

কুসংস্কারে নিমোজ্জিত ও কবর পূজারী অনেক আলেম আল্লাহর একত্ব, আল্লাহর কিতাব ও রসূল সা. এর সুন্নাতের দিকে দাওয়াতের পরিবর্তে বাতিলের দিকে আহবান করে এবং আল্লাহ, কবর পূজা এবং মৃতদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের দিকে মানুষকে দাওয়াত দেয়। তারা মানুষের মাঝে সন্দেহ সৃষ্টি করে এবং বাতিল কর্মে ব্যস্ত থাকে। এ থেকে আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

১৭. নাবী-রসূলগণের দিকে বাতিল সম্বন্ধিত করা

নাবীগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। আল্লাহর বাণী:

{وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ} [البقرة: 102]

সূলাইমান কুফরী করেনি *(সূরা বাক্বারাহ ২:১০২)*। আল্লাহর বাণী:

{مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيّاً وَلا نَصْرَانِيّاً} [آل عمران: 67]

ইব্রাহীম ইহুদীও ছিল না, নাসারাও ছিল না *(সূরা আলে-ইমরান ৩:৬৮)*।

....

ব্যাখ্যা: জাহিলী পদ্ধতি: জাহিলরা নাবীগণকে কুফরী ও ভ্রষ্টতার সাথে সম্পৃক্ত করে। যেমনভাবে ইয়াহুদীরা সুলাইমান আ. কে যাদু কর্মের সাথে সম্পৃক্ত করে। তারা বলতো যাদু করা সুলাইমান আ. এর কর্ম। (তাদের ধারণা) যাদুর মাধ্যমে সে জিন ও শয়তানকে বশ করে। জাহিলরা জানে না যে, শয়তান আল্লাহরই সৃষ্টি। আল্লাহ তা‘আলা যেভাবে চান জিন শয়তানকে অধীন করেন। আর মহান আল্লাহ জিন শয়তানকে সুলাইমান আ. এর জন্য বশীভূত করেন। তাই ঐ সব ইয়াহুদীরা সুলাইমান আ. কে যাদুর সাথে সম্পৃক্ত করে। মানুষের মাঝে যাদু কর্ম হালাল বলে প্রচার করে, কেননা তা নাবীগণের কর্ম মনে করতো।

অনুরূপভাবে ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা একনিষ্ঠদের নেতা ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে কুফরীর সাথে সম্পৃক্ত করে। তারা যে কুফরীর উপর আছে তার সাথে ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে সম্পৃক্ত করে বলে, এটা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর দীন। আল্লাহ তা‘আলা নিম্নোক্ত বাণীর মাধ্যমে তা প্রত্যাখ্যান করেন।

{مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيّاً وَلا نَصْرَانِيّاً وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [آل عمران:67]

ইব্রাহীম ইহুদীও ছিল না, নাসারাও ছিল না। বরং সে ছিল একনিষ্ঠ মুসলিম। আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না *(সূরা আলে-ইমরান ৩:৬৭)*।

একত্বই হলো ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর দীন। তিনি শিরক ও মুশরিক হতে মুক্ত ছিলেন। ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা যে কর্ম পদ্ধতির উপর অটল ছিল, তিনি তার বিরোধিতা করেন।

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর অনেক যুগ পরে ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের উদ্ভব ঘটে। তাহলে কিভাবে তাকে ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টান বলে সম্পৃক্ত করা হয়?! এটাতো কেবল জঘন্য মিথ্যা। ইতিহাস তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। কেননা ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান ও ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর মাঝে দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর যুগ অতিক্রান্ত হওয়ার পর মূসা আলাইহিস সালাম এর উপর তাওরাত ও ঈসা আলাইহিস সালাম এর উপর ইনজিল নাযিল হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْأِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ} [آل عمران:65] . [كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِبَنِي إِسْرائيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرائيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ} [آل عمران: 93]

হে কিতাবীগণ, তোমরা ইব্রাহীমের ব্যাপারে কেন বিতর্ক কর? অথচ তাওরাত ও ইঞ্জীল তো তার পরই অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং তোমরা কি বুঝবে না?সকল খাবার বনী ইসরাঈলের জন্য হালাল ছিল। তবে ইসরাঈল তার নিজের উপর যা হারাম করেছিল তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে। বল, তাহলে তোমরা তাওরাত নিয়ে আস, অতঃপর তা তিলাওয়াত কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও *(সূরা আলে-ইমরান ৩:৬৫,৯৩)*।

অনুরূপভাবে মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উম্মাতে মুহাম্মাদীর মাঝে জাল-মিথ্যা হাদীছ প্রচারের মাধ্যমে মিথ্যুকরা নাবী মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বাতিলের সাথে সম্পৃক্ত করে। আর এমনিভাবে কতিপয় উম্মত ইমামদের আক্বীদার বিরোধিতায় তাদেরকে বাতিলের সাথে সম্পৃক্ত করে। অতঃপর ইমাম আবূ হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম

শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে মু‘তাযিলা (المعتزلة) ও আশ‘আরী (الأشاعرة) আক্বীদার সাথে সম্পৃক্ত করে। এসকল সালাফী ইমামদেরকে জাহিলরা বাতিল আক্বীদার সাথে সম্পৃক্ত করে অথচ ঐ সকল ইমাম মু’তাযিলা ছিলেন না। বরং তারা মু’তাযিলা ও কালাম শাস্ত্র (যুক্তিবিদ্যা) এর আলেমদের বিরোধিতা করতেন।

১৮. নাবী-রসূলগণের বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও তাদের দিকে নিজেদেরকে সম্বন্ধিত করা

নাবীগণের সাথে সম্পৃক্ততার ব্যাপারে বিরোধিতা করা। জাহিলরা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর আনুগত্য ত্যাগ করে প্রকাশ্যে তার বিরোধিতায় লিপ্ত হয়।

....

ব্যাখ্যা: পরস্পর বিরোধপূর্ণ বিষয়ে সম্পৃক্ত করা: ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এমন বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত করা যা তার (আদর্শ) বিরোধী। এ ধরণের সম্পৃক্ততা বাতিল ও মিথ্যা। পক্ষান্তরে তার আদর্শ বিরোধী নয় এমন বিষয়ের সাথে তাকে সম্পৃক্ত করাই (الانتساب الصحيح) আল-ইনতেসাবুস ছহীহ (সঠিক সম্পৃক্ততা) হিসাবে গণ্য। আল্লাহর একত্বতা, তার ইবাদতের একনিষ্ঠতা ও মুশরিকদের থেকে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর মুক্ত থাকার বিষয়ে তিনি যে আদর্শ নিয়ে এসেছেন তার সাথে তাকে সম্পৃক্ত করা যুক্তিযুক্ত, যা তার বিরোধী নয়। ইয়াহুদীদের হজ্জ পালন থেকে বিরত থাকা এবং কাবাকে কেবলা মেনে না নেয়া সত্ত্বেও তারা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর সাথে (নিজেদেরকে) সম্পৃক্ত করে। এ জন্য আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكاً وَهُدىً لِلْعَالَمِينَ.فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِناً وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [آل عمران: 97،96]

নিশ্চয় প্রথম ঘর, যা মানুষের জন্য স্থাপন করা হয়েছে, তা মক্কায়। যা বরকতময় ও হেদায়াত বিশ্ববাসীর জন্য। তাতে রয়েছে স্পষ্ট নির্দশনসমূহ, মাকামে ইবরাহীম। আর যে তাতে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ হয়ে যাবে এবং সামর্থ্যবান মানুষের উপর আল্লাহর জন্য বায়তুল্লাহর হজ্জ করা ফরয। আর যে কুফরী করে, তবে আল্লাহ তো নিশ্চয় সৃষ্টিকুল থেকে অমুখাপেক্ষী *(সূরা আলে-ইমরান ৩:৯৬,৯৭)*

অনুরূপভাবে, যারা চার ইমামের আক্বীদার সাথে সম্পৃক্ত, তারা জাহমিয়াহ, মু'তাযিলা ও আশআ'রিয়াদের আক্বীদা গ্রহণ করা ছাড়াই ইমামদের আক্বীদা গ্রহণ করা তাদের জন্য ওয়াজীব হবে।

১৯. নেককারদের সাথে সম্বন্ধ সৃষ্টিকারীদের কর্মকাণ্ড দ্বারা নেককারদের দোষারোপ করা

নেক লোকদের সাথে সম্পৃক্ত কতিপয়ের কর্মের মাধ্যমে কতেক নেক লোকদের নিন্দাচর্চা করা। যেমন ইয়াহুদীরা ঈসা আলাইহিস সালাম এর ব্যাপারে মন্দ কথা বলে এবং ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে নিন্দা জ্ঞাপন করে।

....

ব্যাখ্যা: নেক লোকদের সাথে সম্পৃক্ততার দাবিদার কতিপয়ের খারাপ কর্মের মাধ্যমে নেকলোকদের দোষ বর্ণনা করা। আর অনুসারীদের মন্দ কর্মের সাথে নেক লোকদের সম্পৃক্ত করা, যা থেকে তারা মুক্ত।

যেমন ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে ইয়াহুদীদের মন্দ কথা বলা যা ধর্মযোদ্ধা অনুসারীদের বিকৃত করে। তারা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তা'আলা তিন উপাস্যের একজন অথবা মাসীহই আল্লাহ অথবা আল্লাহর পুত্র (নাউযুবিল্লাহ)।

অনুরূপভাবে কতিপয় কবর পূজারী, জাহমিয়াহ, মু'তাযিলা ও খারেজীরা তাদের কর্মের দ্বারা তার দীনের দিকে সম্পৃক্ত করে মুহাম্মাদ সম্পর্কে মন্দ কথা বলে।

তাই আমরা বলবো নাবীগণের ব্যাপারে যারা মন্দ কথা বলে, তারা মূসা, ঈসা আলাইহিমাস সালাম ও মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোন দীনেরই অন্তর্ভুক্ত নয়। আর অনুসারীদের বিমুখ হওয়ার কারণে তাদেরকে মূল দ্বীনের প্রতি সম্পৃক্ত করা যায় না। দীনের মূল থেকে যারা বেরিয়ে যায় কেবল তাদের দিকেই তাদেরকে সম্পৃক্ত করা যায়।

মূসা আ. এর রিসালাতের নিন্দা করা যাবে না। কেননা ইয়াহুদীরা তাদের দীনকে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও বিকৃত করেছে। আর খ্রিষ্টানদের শিরক, ধর্মযুদ্ধ ও নিকৃষ্ট কুফরীর কারণে তাদেরকেও ঈসা আ. এর দীনের দিকে সম্পৃক্ত করা যাবে না। আর কবর পূজারীরা যেসব কর্মকান্ড করে নিজেদেরকে ইসলামপন্থী মনে করে ঐ কারণে মুহাম্মাদ এর দীনের দিকে তাদেরকেও সম্পৃক্ত করা যাবে না। আর রাফেযী নাস্তিক ও বাতিনপন্থীরা ইসলামের নাম ব্যবহার করলেও মুহাম্মাদ এর দীনের দিকে তাদেরকে সম্পৃক্ত করা যাবে না। যারা মুহাম্মাদ এর আদর্শ অনুসরণ করে ও তার প্রতি ঈমান আনে কেবল তাদেরকেই মুহাম্মাদ এর দীনের দিকে তাদেরকে সম্পৃক্ত করা যাবে। আর যারা নেকলোকদের অনুসরণ ও অনুকরণ করে তারা নেকলোকদের সাথে সম্পৃক্ত হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضو عنه.. }

আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা অগ্রগামী ও প্রথম এবং যারা, তাদেরকে অনুসরণ করেছে সুন্দরভাবে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট

হয়েছেন আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে *(সূরা আত-তাওবা ৯:১০০)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ} [آل عمران: 68]

নিশ্চয় মানুষের মধ্যে ইব্রাহীমের সবচেয়ে নিকটবর্তী তারা, যারা তার অনুসরণ করেছে, আর এই নাবী ও মুমিনগণ *(সূরা আলে-ইমরান ৩:৬৮)*।

অনুরূপভাবে চার মাযহাবে সম্পৃক্ত অনুসারীদের সঠিক আক্বীদা থেকে বিচ্যুত হওয়া ও দলীল বিরোধিতার কারণে তাদেরকেও চার ইমামের দিকে সম্পৃক্ত করা যাবে না।

২০. যাদুকর্ম ও ভাগ্য গণনাকে অলী-আওলিয়ার কারামাত গণ্য করে তা বিশ্বাস করা

যাদুকর ও তাদের মত লোকদের প্রবঞ্চনাকে নেকলোকদের কারামাত বলে জাহিলদের বিশ্বাস করা ও যাদুকর্মকে নাবীগণের কারামাত গণ্য করা। যেমন জাহিলরা সুলাইমান আ. কে যাদুকর বলে গণ্য করে।

....

ব্যাখ্যা: মাখারিক (المخاريق): হলো অলৌকিক বিষয়। আল্লাহ ছাড়া এর উপর কেউ ক্ষমতা রাখে না। নাবীগণ থেকে অলৌকিক বিষয় প্রকাশিত হলে তা মু'জিযা বলে গণ্য। যেমন মুসা আ. এর লাঠি সাপে পরিণত হওয়া মু'জিযা এবং জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগ ভাল হওয়া এবং আল্লাহ তা'আলার হুকুমে মৃতকে জীবিত করা ঈসা আ. এর মু'জিযা।

আর মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সবচেয়ে বড় মু'জিযা আল-কুরআন দেয়া হয়েছে যা গোটামানব জাতিকে বিস্মিত করে এবং কুরআনের মত অনুরূপ কিছু রচনা করতে জিন ও মানুষ অপারগতা প্রকাশ করে।

নেক, মুত্তাকী ও মু'মিন ব্যক্তির নিকট থেকে অলৌকিক কিছু প্রকাশ পেলে তা কারামাত (كرامة) নামে খ্যাত। তা দীনের জন্য দলীল অথবা মুসলিমদের প্রয়োজনে সংঘটিত হয়। যেমন মুহাম্মাদ এর কাছ থেকে দীনের দলীল হিসাবে অথবা মুসলিমদের প্রয়োজনে কারামাত প্রকাশ পেয়েছিল। এমনিভাবে মারইয়াম আ. এর জন্য কারামাত প্রকাশ পেয়েছিল। মারইয়াম আলাইহিস সালাম এর কুঠরিতে যাকারিয়া আলাইহিস সালাম প্রবেশ করলে তার নিকট রিযিক (খাদ্য ফলমূল) দেখতে পান। ঐ কুঠরিতে মারইয়াম আ. আলাদাভাবে ইবাদত করতেন, তা ছিল ইবাদাতের জায়গা। অনুরূপভাবে আসহাবে কাহাফের দীর্ঘ সময় যাবত ঘুমানো তাদের জন্য কারামাত ছিল। তারা নিজেদের অবস্থায় বহাল ছিল, মাটিতে তাদের শরীর নষ্ট হয়নি। তাদের জীবনে কোন সময়কালের (অনভূতি) অর্জন হয়নি। এটা ওলীদের কারামাত।

অপরপক্ষে কাফিরদের হাতে অলৌকিক সাদৃশ্য যা প্রকাশ পায় তা শয়তানের কর্ম বলে গণ্য। এটাকে ভেলকিবাজি, ফন্দিবাজি ও কাল্পনিক যাদু বলে গণ্য করা হয় অথবা এটা শয়তানের কর্ম যার মাধ্যমে মানুষের বিশ্বাস নষ্ট করা ও তাদের ক্ষতি সাধনের জন্য শয়তান যাদুকরদের খাদেম নির্ধারণ করে। এটা কারামাত নয়। আর যে শূন্যে ভেসে বেড়ায় অথবা পানিতে হাঁটে সে পাপাচারী। এটা শয়তানের কর্ম। কেননা যখন শিরক ও কুফরীর মাধ্যমে যাদুকররা শয়তানের নৈকট্য লাভ করে তখন শয়তানেরা তাদের খাদেম হয়ে যায়। শয়তানেরা তাদেরকে শূন্যে ভাসায় ও পানিতে হাঁটায়।

ঐ সকল পাপাচারীদের হাতে ভেলকিবাজি ও শিরক হতে যা কিছু প্রকাশ পায় তা শয়তানের কর্ম অথবা মানুষের সাথে তাদের ফন্দিবাজি ও ধোঁকা দেওয়ার কৌশল মাত্র। এগুলো এমন কর্ম যা জাহিলদের মাঝে আছে তা থেকে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে। এ জন্য ইয়াহুদীরা সুলাইমান নাবীকে যাদুকর্মের সাথে সম্পৃক্ত করলে আল্লাহ তা'আলা যাদুকর্মকে কুফরী ঘোষণা করে তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেন। নাবীগণের সাথে যাদুকর্মকে সম্পৃক্ত করা যাবে না। নাবীগণের মধ্যে সুলাইমান আলাইহিস সালাম অন্যতম। তার জন্য যাদুকর্ম সমীচিন নয়।

২১. শিষ দেয়া ও করতালির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করা

....

ব্যাখ্যা: যেসব বিষয়য় রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাহিলদের বিরোধিতা করেছেন: জাহিলরা শিষ বাজানো ও হাত-তালির মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করতো অর্থাৎ তার নৈকট্য লাভ করতো। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

: {وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً} [الأنفال: 35]

আর কা'বার নিকট তাদের সালাত শিষ ও হাত-তালি ছাড়া কিছু ছিল না *(সূরা আনফাল ৮:৩৫)*।

কাবা শরীফের নিকটে মুশরিকরা কেবল শিষ বাজিয়ে ও হাত-তালি দিয়ে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করতো। শিষ দেয়া অর্থ হলো মুখে শব্দ করা। আর করতালি অর্থ দু'হাতের তালু একত্র করে শব্দ করা। জাহিলরা বাইতুল্লাহর নিকটে এ আমল করতো। এটাকে তারা ছালাত মনে করে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করতে চাইতো। আর যারা মানুষ ও জিনদের মধ্য থেকে শয়তান, তারা এ কর্মকে সৌন্দর্যময় করে তুলতো। কেননা আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত (توقيفية) নিয়ম ছাড়া ইবাদত হয় না।

মানুষ নিজ থেকে কোন বিধান আবিষ্কার করতে পারে না অথবা অন্য কিছুর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাত পেতে চাওয়া যা তিনি বিধিবদ্ধ করেননি তা আল্লাহর ইবাদত বলে গণ্য করতে পারে না অথচ শরীয়তে এর কোন মৌলিকত্ব নেই। একারণে শিষ দেয়া ও তালি বাজানো এ দু'টি নিষিদ্ধ অভ্যাসকে ইসলামে হারাম গণ্য করা হয়, যদিও এ দু'টির মাধ্যমে ইবাদত করা মানুষের উদ্দেশ্য থাকে না। কেননা তাতে মুশরিকদের আত্মতৃপ্তিই আছে বটে। আর নাবী সা. বিশেষত মহিলাদের জন্য প্রয়োজনে তালি বাজানোকে বৈধ করেছেন। যেমন ইমাম ছলাতে ভুল করলে তাকে সতর্ক করার জন্য মহিলাদের তালি বাজানো বৈধ। উপস্থিত পুরুষ মুক্তাদিদের ফিতনা থেকে বেঁচে থাকার জন্য মহিলাদের জন্য এ

পদ্ধতি নির্ধারিত।[২৮] আর তালি বাজানোর ক্ষেত্রে কাফিরদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য বৈধ নয়।

২২. দীনকে খেল-তামাশা হিসাবে গ্রহণ করা

দীনকে খেল-তামাশা হিসাবে গ্রহণ করেছে।

....

ব্যাখ্যা: প্রমোদ (اللهو) হলো প্রত্যেক এমন বাতিল বিষয় যা হক্ব থেকে মানুষকে বিরত রাখে। আর তামাশা (اللعب) হলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বিপরীত যাতে কোন উপকারীতা নেই। সুতরাং খেল-তামাশাকে দীন হিসাবে গ্রহণ করে তার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা জাহিলী দীন। সূফীদের মাঝেও এটা বিদ্যমান আছে। দ্বফ বা তবলা বাজানো ও গান করাকে সূফীরা আল্লাহর ইবাদত হিসাবে গ্রহণ করেছে। এসবের মাধ্যমে তারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে চায়। আর গান ও বাদ্যযন্ত্র খেল-তামাশা যা নির্দিষ্ট সীমা রেখা ছাড়া হারাম। তাহলে কিভাবে এটাকে আল্লাহর ইবাদত হিসাবে গ্রহণ করা হয়? বর্তমানে সূফীরা সঙ্গীতকে ইসলামী গানের সাথে তুলনা করে তা গ্রহণ করে। তারা এটাকে আল্লাহর দিকে দাওয়াতের মাধ্যম নির্ধারণ করেছে। যেমন তারা বলে, এভাবে

২৮. আবূ হুরাইরা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ»

পুরুষদের জন্য তাসবিহ-সুবহানাল্লাহ ও মহিলাদের জন্য তাছ্বফিক-হাত তালি দেয়া। ছ্বহীহ বুখারী হা/১২০৩, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৪২২।

আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়া দীনের মধ্যে গণ্য। (তাদের ধারণা) এটা গান, গুঞ্জন ও শব্দের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না যা দ্বারা আত্মা মজা পায়।

মানুষ আল্লাহর স্বরণ ও কুরআন তেলাওয়াত ছেড়ে দিয়ে তাতে ব্যস্ত থাকে। এটা দলীয় পদ্ধতির নিদর্শন মাত্র যা দাওয়াতের মাধ্যম নয়। কেননা দা'ওয়াত দেয়ার বিধান নির্ধারিত। আর নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিতাব ও সুন্নাহর মাধ্যমে মানুষকে দা'ওয়াত দিতেন, উপদেশ দিতেন ও সঠিক পথ দেখাতেন। তিনি উত্তম পন্থায় মানুষের সাথে তর্ক করতেন। কোন দলের সঙ্গীতকে তিনি দা'ওয়াতের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেননি।

মুশরিকদের প্রতিহত করা ও ইসলামকে রক্ষা করার জন্য উত্তম কবিতা রচনা করা হতো, যা দোষনীয় নয়। যেমন হাসান ইবনে সাবিত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর রচিত কবিতা দোষমুক্ত ছিল অথবা ভাল আমলের প্রতি উৎসাহিত করা এবং সফরে বের হওয়ার জন্য কবিতা রচনা করা হত, যা বর্তমানে ব্যবহৃত দলীয় সঙ্গীতের মত ছিল না। তাই কবিতার সাথে সঙ্গীতকে তুলনা করা যাবে না। কেননা দু'টির মাঝে স্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান।

২৩. দুনিয়ার মাধ্যমে ধোঁকায় পড়া

পার্থিব জীবন জাহিলদেরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তারা ধারণা করে যে, পার্থিব চাকচিক্যতা আল্লাহর দান যা তার সন্তুষ্টি প্রমাণিত হয়। যেমন জাহিলরা বলে, আল্লাহর বাণী:

{نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالاً وَأَوْلاداً وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ} [سبأ: 35]

আমরা ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে অধিক সমৃদ্ধশালী। আর তাই আমরা শাস্তি প্রাপ্ত হব না *(সূরা সাবা ৩৪:৩৫)*।

....

ব্যাখ্যা: জাহিলরা তাদের সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদকে নিজেদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে সম্মান মনে করতো। তাদের ধারণা, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে শাস্তি দিবেন না। আল্লাহর বাণী:

{وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالاً وَأَوْلاداً وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى} [سبأ: 35،37]

আমরা ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে অধিক সমৃদ্ধশালী। আর তাই আমরা শাস্তি প্রাপ্ত হব না বল, 'আমার রব যার জন্য ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করেন অথবা সঙ্কুচিত করেন। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।' আর তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন বস্তু নয় যা তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করে *(সূরা সাবা ৩৪:৩৫-৩৭)*।

{قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} [سبأ:39]

বল, 'নিশ্চয় আমার রব তার বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করেন এবং সঙ্কুচিত করেন। আর তোমরা যা কিছু আল্লাহর জন্য ব্যয় কর তিনি তার বিনিময় দেবেন এবং তিনিই উত্তম রিযিকদাতা' *(সূরা সাবা ৩৪:৩৯)*।

বেশি ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও প্রাচুর্য বান্দার জন্য আল্লাহর ভালবাসার দলীল নয়। বরং তিনি কাফিরকে ধীরে ধীরে পাঁকড়াও করার জন্য তাদেরকে পার্থিব ধন-সম্পদ দিয়ে থাকেন। হাদীছে বর্ণিত:

"إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وأما الدين فلا يعطيه إلا من يحب"

আল্লাহ তা'আলা যাকে ভালবাসেন অথবা অপছন্দ করেন উভয়কে তিনি পার্থিব প্রাচুর্যতা দান করে থাকেন। আর আল্লাহ তা'আলা যাকে ভালবাসেন তাকে দীনের জ্ঞান দান করেন।[২৯] অন্য হাদীসে এসেছে:

"لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً شربة ماء"

আল্লাহ তা'আলার নিকট যদি মশার পাখা পরিমাণ দুনিয়ার মূল্য থাকতো, তাহলে কোন কাফিরকে তিনি একফোটা পানিও পান করতে দিতেন না।[৩০]

আল্লাহর নিকট সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও অভাবী ছিলেন। অনুরূপভাবে তার ছাহাবীগণেরও অভাব-অনটন ছিল। অথচ নাবীগণের পরে তারা সৃষ্টির মাঝে উত্তম মানুষ। আর কাফিররা অবাধে বিচরণ করে এবং নাবীগণের পরে তারা আল্লাহ তা'আলার নেআ'মত পেয়ে উল্লসিত হয়। কাফিরদেরকে ধীরে ধীরে পাঁকড়াও করা হবে একারণে তারা আল্লাহর নেআ'মত পেয়ে উল্লসিত হয় ও অবাধে চলাফেরা করে। তাই দুনিয়ার চাকচিক্য আল্লাহর নিকট দুনিয়াবাসীর সম্মান প্রমাণ করে না বরং আমলকারী ধনী হোক বা গরিব হোক সৎ আমলের মাধ্যমেই আল্লাহর নিকট বান্দার সম্মান প্রমাণিত হয়।

দুনিয়াপ্রেমীক, সম্পদশালী ও প্রাচুর্যের অধিকারীরাই আল্লাহ তা'আলার নিকট সম্মানিত বলে মানুষ ধারণা করে, আর বলে অভাব-অনটনে নিপতিত লোকজন আল্লাহর নিকট লাঞ্ছিত, তাদের এ ধারণা ভুল।

---

২৯. ছহীহ: মুসনাদে আহমাদ, মুস্তাদরাক হাকীম।
৩০. ছহীহ: তিরমিযী ২৩২৫।

২৪. যখন দুর্বলরা হক্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, তখন জাহিল কর্তৃক হক্ব প্রত্যাখ্যান করা

দুর্বলরা হক্ব গ্রহণে অগ্রবর্তী হলে জাহিলরা তা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। অহংকারের সাথে তারা ধৃষ্টতা দেখায়। আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে আয়াত নাযিল করে বলেন,

{وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ ... } [الأنعام: 52]

আর তুমি তাড়িয়ে দিয়ো না তাদেরকে, যারা নিজ রবকে ডাকে *(সূরা আল আন'আম ৫:৫২)*

....

ব্যাখ্যা: দুর্বলরা হক্বের উপর অবিচল থাকলে জাহিলরা তা প্রত্যাখ্যান করে। এ কারণে তারা বলে,

{أَهَؤُلاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا} [الأنعام: 53]

'এরাই কি, আমাদের মধ্য থেকে যাদের উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন? *(সূরা আন'আম ৬:৫৩)*। অর্থাৎ তারা আমাদের চেয়ে জান্নাতে প্রবেশের দিক থেকে উত্তম নয়। আমরাই দুর্বলদের চেয়ে অগ্রগামী ও আমরা তাদের চেয়ে সম্মানিত। সমাজে ঐ সব দুর্বলদের কোন মূল্য নেই ও তাদের কোন অংশও নেই। মহান আল্লাহ তা'আলা ঐ সব জাহিলদের কথাকে প্রত্যাখ্যান করে বলেন,

{أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ} [الأنعام: 53]

আল্লাহ কি কৃতজ্ঞদের ব্যাপারে পূর্ণ জ্ঞাত নয়? *(সূরা আন'আম ৬:৫৩)*।

আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে ভালবাসেন কেবল তাদেরকে সঠিক দীন দান করেন। অপরপক্ষে যাদের প্রতি আল্লাহর ভালবাসা ও শত্রুতা রয়েছে উভয়কে তিনি দুনিয়ার প্রাচুর্যতা দান করেন।

২৫. কোন বিষয়ে দুর্বলদের অগ্রগামিতার কারণে সেটাকে বাতিল বলে প্রমাণ করা

হক্ব গ্রহণে দুর্বলদের অগ্রগামীতার কারণে হক্বকে বাতিল বলে প্রমাণ করা। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{لَوْ كَانَ خَيْراً مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ} [الأحقاف: 11]

যদি এটা ভাল হত তবে তারা আমাদের থেকে অগ্রণী হতে পারত না *(সূরা আল আহক্বাফ ৪৬:১১)।*

....

ব্যাখ্যা: জাহিলদের অভ্যাস: হক্বের ক্ষেত্রে দুর্বলদের অগ্রগামীতার কারণে হক্ব বিষয়কে বাতিল বলে প্রমাণ করা। যেমন আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের ব্যাপারে বর্ণনা করেন, তারা বলে,

{لَوْ كَانَ خَيْراً مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ} [الأحقاف: 11]

'যদি এটা ভাল হত তবে তারা আমাদের থেকে অগ্রণী হতে পারত না *(সূরা আহক্বাফ ৪৬:১১)*।

তারা বলে, আমরা বুদ্ধিমান, দক্ষ ও চিন্তাশীল তাই আমরা সব বুঝি। কোন বিষয় মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পক্ষ থেকে এসেছে জানতে পারলে আমরা তা সঠিক বলে মনে করি না, তাই প্রত্যাখ্যান করি। যদি তা হক্ব হতো তাহলে আমরাই তার চেয়ে অগ্রগামী হতাম। আর তা হক্ব নয় মনে করে তাকে আমরা প্রত্যাখ্যান করি। এটাই জাহিলদের জঘন্য বাতিল পন্থা।

কেননা, মানুষের মর্যাদার উপর ভিত্তি করে হক্বের অনুসরণ নির্ধারিত নয়। বরং আল্লাহ তা'আলা তার বান্দার মধ্যে থেকে যাকে হক্ব দান করে অনুগ্রহ করেন, সেটাই নির্ধারিত অনুসরণীয়। আর নাবী-রসূলগণের অনুসারীরা অধিকাংশই দুর্বল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ} [الشعراء: 111]

তারা বলল, ‘আমরা কি তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব, অথচ নিম্নশ্রেণীর লোকেরা তোমাকে অনুসরণ করছে? *(সূরা শু‘আরা ২৬:১১১)*।

তিনি আরোও বলেন,

{وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ} [هود: 27]

আমরা দেখছি যে, কেবল আমাদের নীচু শ্রেণীর লোকেরাই বিবেচনাহীনভাবে তোমার অনুসরণ করেছে *(সূরা হুদ ১১:২৬)*।

অর্থাৎ তাদের কোন চিন্তা-ভাবনা নেই। জাহিলরা মনে করে, তারা বুদ্ধিমান ও চিন্তাশীল। আর নূহ আলাইহিস সালাম যা নিয়ে এসেছেন তা যদি হক্ব হতো, তাহলে আহলে রায় ও অধিকাংশ মানুষ তার অনুসরণ করতো। তাই নূহ আলাইহিস সালাম হক্ব পথে ছিলেন না বলে প্রমাণ করে তারা তাকে বর্জন করে।

জাহিলদের এ পদ্ধতি বাতিল। কেননা, মানুষের মধ্যে অধিকাংশ হক্ব অস্বীকারকারীরা প্রাচুর্যের অধিকারী হয়ে থাকে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ} [سبأ: 34]

অপরপক্ষে অধিকাংশ দুর্বল ও অভাবীরা হক্বের অনুসরণ করে। কেননা তারা অহংকারী নন। তাই কোন বিষয়ে প্রাচুর্যের অধিকারী ও মর্যাদাবানরা অনুসরণ করলে তা হক্ব হিসাবে প্রমাণ করা এবং দুর্বল ও অভাবীরা অনুসরণ করলে তা বাতিল প্রমাণ করা জাহিলদের মাপকাঠি। এভাবে বাতিল থেকে হক্ব বুঝার মাপকাঠি গ্রহণ করা বৈধ নয়। একারণে আলেমগণ বলেন, ব্যক্তির দ্বারা হক্ব চেনা যায় না বরং হক্বের মাধ্যমে ব্যক্তিকে চেনা যায়।

২৬. কু-প্রবৃত্তির অনুসরণের কারণে আসমানী কিতাবের প্রমাণাদি জানার পরও তা বিকৃত করা

জেনে বুঝে আল্লাহর কিতাবকে বিকৃত করা।

....

ব্যাখ্যা: ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা আল্লাহর কিতাব তাওরাত ও ইনজিল জেনে-বুঝে বিকৃত করেছে। তারা এ কিতাবগুলো থেকে জ্ঞানার্জন করে বুঝার পর তথ্য বৃদ্ধি অথবা কমতি করার মাধ্যমে তাতে বিকৃতি ঘটিয়েছে। বিশুদ্ধ অর্থ বর্জন করে তার অপব্যাখ্যা করেছে, সবই সম্ভব হয়েছে তাদের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণের কারণে।

মুসলিমরাও এ সমস্যা থেকে মুক্ত নয়। আহলে কিতাবরাই প্রথমত নিজেদের কু-প্রবৃত্তি, ইচ্ছা ও আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটিয়েছে। মূল বিধানকে মিথ্যা প্রতিপন্ন ও অস্বীকার করার পরিমাণ তারা নির্ধারণ করতে পারেনি। আর সুনির্দিষ্ট অর্থ ব্যতিরেকে কিতাবের অপব্যাখ্যা করে তা বিকৃতি ঘটানোর মাধ্যমে কিতাবগুলোর উপর অবিচার করেছে।

প্রবৃত্তি পুজারী, ভ্রষ্ট দল ও কু-প্রবৃত্তির অনুসারী এরূপ সমস্যায় মুসলিমরা জর্জরিত। যখন ঐ সব ভ্রষ্টদেরকে বলা হয়, সুদ হারাম। তখন তারা বলে, সুদ থেকে এ ব্যাখ্যা (বিকৃত ব্যাখ্যা) উদ্দেশ্য। তারা নিজেদের প্রবৃত্তি অনুসারে সুদের ব্যাখ্যা করে। বর্তমানেও তাদের অনেক কিতাবাদী, লিখনী ও ফাতওয়া আছে যা সুদকে বৈধ করে।

এমনিভাবে যখন তাদেরকে বলা হয়, এ বিধান আল্লাহ ও তার রসূল হারাম করেছেন, তখন তারা বলে, এটা কি সে সুদ যা আল্লাহ ও তার রসূল হারাম করেছেন? আল্লাহ ও তার রসূল জাহিলদের সুদ হারাম করেছেন যা অভাবীদের নিকট থেকে অতিরিক্ত হিসাবে গ্রহণ করা হতো। এভাবে জাহিলরা সুদের বর্ধিতাংশ অর্জন করে অথবা তারা বলে, প্রথমে যে সুদের সূচনা হয়েছিল তা হারাম। আর বিনিয়োগে সুদ গ্রহণ ভাল।

ছ্বহীহ সূত্রে বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে:

"الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد"

স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, লবনের বিনিময় লবন। এসব বিক্রয় করা সমান সমান ও নগদ নগদ হতে হবে।[৩১]

এগুলোর বর্ধিতাংশ সুদ হিসাবে গণ্য। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এধরণের সুদ হারাম করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7]

রসূল তোমাদের যা দেয় তা গ্রহণ কর, আর যা থেকে সে তোমাদের নিষেধ করে তা থেকে বিরত হও *(সূরা আল হাশর ৫৯:৭)*।

আল্লাহ তা'আলার কথা (وَحَرَّمَ الرِّبَا) অর্থাৎ তিনি সুদ হারাম করেছেন। এ কথার ব্যাপক অর্থে বর্ধিত সুদ অন্তর্ভুক্ত। ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের মাঝে এমন লোক ছিল যারা যথাক্রমে তাওরাত ও ইনজিল বিকৃত করেছে। আর উম্মাতে মুহাম্মাদীর মাঝে এমন লোক আছে যারা নিজেদের ও অন্যদের রীতিকে বৈধ করার জন্য কুরআন ও সুন্নাহর বিধান পরিবর্তন করে। এমতাবস্থায় কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ করা মুসলিমদের উপর ওয়াজীব।

ইয়াহুদীদের দ্বারা বিধান বিকৃত করার উদাহরণ: যখন আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদীদেরকে বললেন,

{وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّداً وَقُولُوا حِطَّةٌ} [البقرة: 58]

দরজায় প্রবেশ কর মাথা নীচু করে। আর বল 'ক্ষমা' *(সূরা আল বাক্বারাহ ২: ৫৮)*।

---

৩১. ছ্বহীহ বুখারী ২১৩৪, ছ্বহীহ মুসলিম ১৫৮৭।

অর্থাৎ (তোমরা বল) (حط عنا ذنوبنا واغفر لنا) অর্থাৎ আমাদের পাপ মোচন করে দাও ও আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। তারা এ কথাকে বিকৃত করে বললো, (حبة من حنطة) তথা আমাদেরকে তুমি গম দাও। এখানে (حط) হিত্তুন শব্দে ‘নুন’ অতিরিক্ত যোগ করে (حنطة) হিনতাতুন শব্দ ব্যবহার করে আল্লাহর গুণাবলীর পরিবর্তন ঘটায়। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} [طه: 5]

পরম করুণাময় আরশে সমুন্নত *(সূরা ত্ব-হা ২০:৫)*।

তারা বলে, (**اسْتَوَى**) তিনি আরশে সমুন্নত। এর অর্থ (**استولى**) তথা তিনি প্রভাব বিস্তার করলেন।

ইয়াহুদীরা যেমন (حنطة) শব্দে নুন বর্ণ বৃদ্ধি করেছে, তেমনই (استولى) শব্দটিতে তারাও লাম বর্ণ বৃদ্ধি করেছে। এটাই হলো অতিরিক্ত কিছু বৃদ্ধি ও কমবেশি করে শব্দ বিকৃত করা। আর বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা ছাড়া কুরআন ও হাদীছের অপব্যাখ্যা করার নাম অর্থের বিকৃতী। তাই কুরআন ও হাদীছের কথাকে যথাস্থানে না রাখলে তা বিকৃত বলে গণ্য হয়।

২৭. বাতিল কিতাবাদি রচনা করে সেগুলো আল্লাহর দিকে সম্বন্ধিত করা

জাহিলরা বাতিল কিতাবাদী রচনা করে তা আল্লাহর কিতাবের দিকে সম্বোধন করে। আল্লাহ তা'আলার বাণী:

{فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ} [البقرة: 79]

সুতরাং ধ্বংস তাদের জন্য যারা নিজ হাতে কিতাব লিখে। তারপর বলে, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে *(সূরা আল বাক্বারাহ ২:৭৯)*।

....

ব্যাখ্যা: ইয়াহুদীদের দ্বারা ক্ষতিসমূহ: ইয়াহুদীরা নিজ হাতে লিখে কিতাব রচনা করেছে। আর তাতে বাতিল বিষয় বৃদ্ধি করে বলে, এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এসেছে। যাতে তারা মানুষের নিকট থেকে এর বিনিময় অর্জন করতে পারে অথবা এসব রচিত কিতাব বাজারে বিক্রি করে প্রচুর সম্পদ অর্জন করতে পারে।

ভ্রান্ত কিতাবাদী রচনা করা এবং মানুষের মাঝে এর প্রচলন ঘটানোই ইয়াহুদীদের পেশা। উম্মতে মুহাম্মাদীর মাঝেও তাদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী কিছু অনুসারী আছে।

দীনি ইলম-জ্ঞান লেখার সময় আলিমের জন্য আবশ্যকীয় বিষয়:

আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভয় রাখা, কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী কোন কিছু না লেখা। কেননা তার লিখনী সম্পর্কে কিয়ামতের দিন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তাই যা কিছু কুরআন ও সুন্নাহর অনুকূলে হয়, তা কিতাব, রচনা ও ফাতওয়ায় লিপিবদ্ধ করবে। আর কোন কিছু নিজে থেকে ও কু-প্রবৃত্তির অনুসরণ করে লিখে বলবে না যে, এটা শরী'আতে আছে অথবা এটাই শরী'আত।

বর্তমানে অধিকাংশ কিতাব অথবা লিখনী অথবা বাতিল ভ্রান্ত ফাতওয়া ইসলামের নাম ব্যবহার করে রচনা করা হয়। এটা ইয়াহুদীদের কর্মের মতই। যে মুসলিম কিছু লিখতে বা রচনা করতে চায় অথবা ফাতওয়া প্রদান করতে চায়, তাকে এ ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে, আল্লাহর নির্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘন করা যাবে না, আল্লাহকে ভয় করতে হবে এবং হক্বের জন্যই লিখতে হবে যদিও মানুষ তা অপছন্দ করে।

২৮. অপরের নিকট বিদ্যমান হক্ব বর্জন করা

জাহিলরা তাদের দল ছাড়া অন্যর হক্বকে গ্রহণ করে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا} [البقرة: 91]

তারা বলে, আমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে আমরা তা বিশ্বাস করি *(সূরা আল বাক্বারাহ ২:৯১)*।।

....

ব্যাখ্যা: যখন জাহিলদেরকে বলা হয়, মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর যা নাযিল হয়েছে তার উপর ঈমান আনো তখন তারা বলে,

{قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا} [البقرة: 91]

অর্থাৎ মুসা আলাইহিস সালাম এর উপর যা নাযিল হয়েছিল।

{وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ} [البقرة: 91]

আর এর বাইরে যা আছে তারা তা অস্বীকার করে *(সূরা বাক্বারাহ ২:৯১)*।

অর্থাৎ অন্য কিছু

{وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِمَا مَعَهُمْ} [البقرة: 91]

তা সত্য, তাদের সাথে যা আছে তার সত্যায়নকারী *(সূরা বাক্বরাহ ২:৯১)*।

তারা বলে, আমরা তাওরাতের উপর ঈমান আনবো যা আমাদের নাবী মূসা আলাইহিস সালাম এর উপর নাযিল হয়েছে।

{وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ} [البقرة: 91]

আর এর বাইরে যা আছে তারা তা অস্বীকার করে *(সূরা বাক্বরাহ ২:৯১)*।

তা হলো ইনজিল যা ঈসা আলাইহিস সালাম এর উপর নাযিল হয়েছে। আর কুরআন নাযিল হয়েছে মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর।

{وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِمَا مَعَهُمْ}

তা সত্য, তাদের সাথে যা আছে তার সত্যায়নকারী *(সূরা বাক্বরাহ ২:৯১)*।

যা তাওরাতে আছে, ইনজিল ও কুরআন তা সত্যায়নকারী।

আল্লাহ তা'আলা তাদের কথা এভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন যে, মূসা আলাইহিস সালাম এর উপর যা নাযিল হয়েছে তোমরা যদি তার অনুসরণ করেই থাকো, তাহলে নাবীগণকে তোমরা কিভাবে হত্যা করতে পারো? নাবীগণকে হত্যার করার কথা কি মূসা আলাইহিস সালাম এর উপর নাযিল হয়েছিল? জাহিলরা যাকারিয়া ও ইহইয়া আলাইহিমাস সালামকে হত্যা করেছে, ইয়াহুদীরা ঈসা আলাইহিস সালামকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল, আল্লাহ তা'আলা তাকে নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন। তাদের চক্রান্ত থেকে তিনি তাকে বাঁচিয়েছেন। আর তারা মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল। নাবীগণকে হত্যা করাই যেন তাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ} [البقرة: 87]

তবে কি তোমাদের নিকট যখনই কোন রসূল এমন কিছু নিয়ে এল, যা তোমাদের মনঃপূত নয়, তখন তোমরা অহঙ্কার করেছ, অতঃপর (নাবীদের) একদলকে মিথ্যাবাদী বলেছে আর একদলকে হত্যা করেছে *(সূরা বাক্বরাহ ২:৮৭)*।

তারা কতিপয় রসূলকে মিথ্যাবাদী মনে করেছে, কিছু সংখ্যককে হত্যা করেছে। কিন্তু কেন তারা এরূপ করেছিল? কারণ রসূলগণ তাদের নিকট যা নিয়ে এসেছেন তা তাদের কু-প্রবৃত্তি বিরোধী ছিল। তাহলে তারা কিভাবে বলতে পারে আমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে তার উপর আমরা ঈমান আনবো? তাদের উপর যা নাযিল হয়েছে তার প্রতি ঈমান কোথায়? মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বৈশিষ্ট্য, গুণাবলী ও তার রিসালাতের কথা তাওরাতেও বর্ণিত হয়েছে। তাহলে মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি তারা ঈমান আনয়ন করে না কেন? মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি ঈমান আনার অর্থই হলো তাদের উপর যা নাযিল হয়েছে তার প্রতি ঈমান আনয়ন করা। অথচ তারা তাকে অস্বীকার করে বলে,

{نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا} [البقرة: 91]

আমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে আমরা তা বিশ্বাস করি *(সূরা বাক্বরাহ ২:৯১)*।

যারা বলে, আমি অমুক আলেম ছাড়া কাউকে অনুসরণ করি না, এ আয়াত তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে অথচ তার উপর হক্ব গ্রহণ করা ওয়াজীব। ইমাম অথবা দারস দানকারী অথবা শাইখের পক্ষপাতিত্ব করা তার জন্য আবশ্যক নয়। যেমন বিভিন্ন পন্থার পীর রয়েছে। তাদের মুরিদ ও অনুসারীরা পীরদের পক্ষপাতিত্ব করে। পীর যা বলে তা ব্যতিরেকে তারা

হক্বকে গ্রহণ করে না। এটাই বাতিল বিষয়। কেননা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত সুনির্দিষ্টভাবে কারো আনুগত্য করা ওয়াজীব নয়। আর যে বলে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত অন্যের আনুগত্য করাও ওয়াজীব, তাহলে সে হবে মুরতাদ। তাকে তাওবা করতে হবে নচেৎ তাকে হত্যা করা হবে। যেমন কোন এক ব্যক্তিকে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সমজ্ঞানী মনে করা হলে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ তাকে হত্যা করার ব্যাপারে সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

তাই রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত কারো আনুগত্য করা ওয়াজীব নয়। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত ইমাম ও আলেমদের মাঝে হক্ব পাওয়া গেলে তাদের আনুগত্য করতে হবে। ইজতিহাদে তাদের ভুল পরিলক্ষিত হলে তা গ্রহণ করা বৈধ নয়, যদিও তারা ইমাম হন। ইমামগণ বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথার সাথে আমাদের কথার মিল হলে তবেই তা গ্রহণ করবে নচেৎ নয়।

২৯. তারা (ইয়াহূদীরা) যাদের অনুসরণ করে বলে ধারণা করে, তাদের বক্তব্য অনুযায়ীও আমল করে না

ইয়াহুদীরা যা বলে, সে সম্পর্কে না জানা সত্ত্বেও তা মেনে নেয়। আল্লাহ তা‘আলা সতর্ক করে বলেন,

: {قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [البقرة: 91] .

বল, তবে কেন তোমরা আল্লাহর নাবীদেরকে পূর্বে হত্যা করতে, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক? *(সূরা আল বাক্বারাহ ২:৯১)*।

....

ব্যাখ্যা: অর্থাৎ তাওরাতে যা নাযিল হয়েছে তার অনুসরণের দিকে ঐ সব ইয়াহুদীরা আহবান করে। দু'ভাবে এ দাবি মিথ্যাপ্রতিপন্ন হয়।

প্রথমত: নাবীগণকে হত্যা করা। অথচ নাবীগণকে হত্যার কথা তাওরাতে উল্লেখ নেই। বরং নাবীগণের প্রতি ঈমান আনা, তাদেরকে সম্মান করা, অনুসরণ ও অনুকরণ করার কথা উল্লেখ আছে।

দ্বিতীয়ত: তাওরাতে মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুসরণ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহর বাণী:

{الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْأِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ} [الأعراف: 157]

যারা অনুসরণ করে রসূলের যে উম্মী নাবী; যার গুণাবলী তারা নিজেদের কাছে তাওরাত ও ইঞ্জিলে লিখিত পায়, যে তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ দেয় ও বারণ করে অসৎ কাজ থেকে এবং তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করে আর অপবিত্র বস্তু হারাম করে। আর তাদের থেকে বোঝা ও শৃংখল যা তাদের উপরে ছিল- অপসারণ করে *(সূরা আল আরাফ ৭:১৫৭)*।

তাওরাতে মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গুণাবলীর কথা উল্লেখ আছে। অথচ তারা তার প্রতি ঈমান আনেনি। নাবীগণ ও আলেমগণ ঈমানের দিকে যে আহবান করতেন, সেকথা তারা বলতো না। বরং নাবীগণ যা বলতেন তা তারা জানতো না।

৩০. বিভক্ত হওয়া ও ঐক্য বিনষ্ট করা

আল্লাহ তা'আলার আশ্চর্য জনক নিদর্শন! আল্লাহ তা'আলার একতাবদ্ধ হওয়ার উপদেশকে জাহিলরা পরিত্যাগ করে। অথচ তিনি বিভক্ত হতে তাদেরকে নিষেধ করেন আর সেটাই তারা করে এবং প্রত্যেক দল নিজের অবস্থান নিয়ে উল্লাস করে।

....

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ তা'আলার বিস্ময়কর নিদর্শন হলো জাহিলরা যখন আল্লাহর কিতাবের উপর একতাবদ্ধ থাকা ও রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর অর্পিত শরী'আতকে আঁকড়ে ধরা বর্জন করলো তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা, বিক্ষিপ্ততা ও হানাহানি সৃষ্টি করে তাদেরকে পরীক্ষায় ফেললেন। আর তারা নিজেদের বাতিলকে নিয়ে উল্লাসে মেতে উঠলো। এটাই তাদের শাস্তি। কেননা মানুষ বাতিল নিয়ে আনন্দিত হলে তা আর পরিত্যাগ করে না। অপরদিকে যখন বাতিলের প্রতি আনন্দবোধ থাকে না, সন্দেহ জাগে তখন এক্ষেত্রে তাওবা করা ও ফিরে আসার সম্ভবনা থাকে। কিন্তু যখন বাতিলকে নিয়ে শান্তি পায় ও আনন্দিত হয় তখন ব্যক্তির মাঝে পরিবর্তন ঘটে না। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে বাতিলপন্থীদের শাস্তি।

কেননা যে হক্ব পরিত্যাগ করে, সে বাতিলের পরীক্ষায় পড়ে। আর যে একতাবদ্ধ থাকা বর্জন করে, সে বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত, হানাহানি ও সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার পরীক্ষায় পড়ে। তাই দীন ও দুনিয়াবী বিষয়ে ভিন্নমতের ঐসব মানুষের মাঝে কেবল শত্রুতা, গোঁড়ামী ও বিদ্বেষ পাওয়া যায়। কখনো কখনো নিজেরা যুদ্ধে লিপ্ত হয়। আর যারা কুরআন ও সুন্নাহকে একত্রে আঁকড়ে ধরে, তাদের মাঝে হৃদ্যতা ও ভালবাসা সৃষ্টি হয় এবং পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগীতা করতে দেখা যায়। তারা যেন একটি দেহের মত।

তাই কুরআন ও সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা ব্যতীত কোন নিরাপত্তা নেই। আর কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ ছাড়া কোন ঐক্যও নেই। এ ছাড়া যা কিছু আছে সবই বিভেদ ও শাস্তি। যারা নিজেদের কথা অনুযায়ী মুসলিমদেরকে

একতাবদ্ধ দেখতে চায়, তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যদি মুসলিমদের ঐক্য কামনা করেই থাকো, তাহলে আক্বীদার ক্ষেত্রে এক হও। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন সে একত্বে ও আক্বীদার উপর সবাই এক হয়ে যাও। আর এটা আমাদের কবর, এটা আমাদের সূফীমত ও এটা আমাদের শিয়ামত এসব বলে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করো না।

প্রথমেই আক্বীদার উপর এক হও, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তথা আল্লাহ ছাড়া কোন প্রকৃত মা'বুদ নেই এ কালেমা আঁকড়ে ধরো। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত বিধানের ক্ষেত্রে এক হও। আর আল্লাহ তা'আলার কিতাব ও রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাতের দিকে ফিরে আসো। আর যাবতীয় নিয়ম, রীতি ও গোত্রীয় অভ্যাস ইত্যাদি প্রত্যাখ্যান করো এবং কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে আসো যেহেতু তোমরা মুসলিমদের একতাবদ্ধতা ও ঐক্য কামনা করছো। তাই একই আক্বীদা ও উদ্দেশ্য ছাড়া মুসলিমরা কখনোই এক হতে পারবে না।

এটাই হলো আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত বিধান ও নের্তৃত্বের একত্বতা যা মুসলিমদের শাসকের কথা শ্রবণ ও আনুগত্যের মাধ্যমে বাস্তবায়ন হয়। মুসলিমদের শাসকের মাধ্যমে তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করবে। যেমন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إن الله يرضى لكم ثلاثاً: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاّه الله أمركم"

আল্লাহ তা'আলা তোমাদের তিনটি বিষয় পছন্দ করেন, তারই ইবাদত করবে, তার সাথে কাউকে শরীক করবে না ও সকলে আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরবে, দল বিভক্ত হবে না এবং আল্লাহ যাকে তোমাদের শাসক নির্ধারণ করেছেন পরস্পর তোমরা তার কল্যাণ কামনা করবে।[৩২]

৩২. ছ্বহীহ: মুয়াত্তা মালেক, মুসনাদে আহমাদ।

৩১. সঠিক দীনের প্রতি জাহিলদের শত্রুতা আর বাতিল দীনের প্রতি তাদের ভালোবাসা

এটা আশ্চর্যজনক নিদর্শন যে, জাহিলরা তাদের সম্পর্কিত দীনের সাথেই শত্রুতা করে। কাফিরদের দীনের প্রতি জাহিলদের ভালবাসা রয়েছে, যারা ভালবাসা দেখিয়ে তাদের সাথে শত্রুতা করে, তাদের নাবী ও তার দলের সাথে শত্রুতা করে। যেমনভাবে তারা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে শত্রুতা করতো। যখন তিনি তাদের নিকট মূসা আলাইহিস সালাম এর দীন নিয়ে আসলেন, তখন তারা যাদুর কিতাবাদী অনুসরণ করলো অথচ তা ছিল ফেরআউনের বংশধরদের দীন।

....

ব্যাখ্যা: জাহিলদের যে সব সমস্যায় রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিরোধিতা করেছেন: জাহিলদের নিজেদের দীনের প্রতি শত্রুতা রয়েছে, যে দীন তাদেরকে অনুসরণ করতে বলা হয়। জাহিলদের দ্বারা তাদের শত্রুর দীন অনুসরণ করা জাহিলিয়্যাত। জ্ঞাতব্য যে, ইয়াহুদীরা মূসা আলাইহিস সালাম এর দীনের উপর ছিল। আর তাদের শত্রু হলো ফেরআউন ও তার বংশধর যারা তাদের অনুসারীদেরকে কঠিন শাস্তি দিয়েছিল। তাদের পুত্র সন্তানদেরকে তারা হত্যা করতো ও কন্যা সন্তানদেরকে জীবিত রাখতো। আর তারা তাদেরকে হীন কাজে ব্যবহার করতো।

এমতবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তার নাবী মূসা কালিমুল্লাহকে প্রেরণ করেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মূসা আলাইহিস সালাম এর হাতে তাদের শত্রু থেকে তাদেরকে নিষ্কৃতি দেন এবং তিনি তাদেরকে সম্মান ও মর্যাদা দান করেন, তাদের শত্রুকে পরাভূত করেন, তাদের সম্মুখে ফেরআউনকে সমুদ্রে ডুবিয়ে দেন এবং এভাবে তিনি মূসা আলাইহিস সালাম এর অনুসারীদের চক্ষু শীতল করেন। জাহিলদের নিকট তাওরাতে নাবী আলাইহিস সালাম এর বর্ণনা ছিল। আর তাওরাত কিতাব মূসা আলাইহিস সালাম নিয়ে আসেন, তাতে মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গুণ বর্ণিত হয়েছে, তাকে অনুসরণের নির্দেশ রয়েছে।

{النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ} [الأعراف: 157]

যে উম্মী নাবী ; যার গুণাবলী তারা নিজেদের কাছে তাওরাত ও ইঞ্জিলে লিখিত পায়, যে তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ দেয় ও বারণ করে অসৎ কাজ থেকে এবং তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করে আর অপবিত্র বস্তু হারাম করে। আর তাদের থেকে বোঝা ও শৃংখল যা তাদের উপরে ছিল অপসারণ করে *(সূরা আরাফ ৭:১৫৭)*।

তাদের কঠোরতার কারণে আল্লাহ তা'আলাও তাদের প্রতি কঠোর হন। তিনি তাদের কুফরী ও পাপাচারীতার জন্য হালালকে হারাম করে দেন। যদি তারা মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি ঈমান আনতো তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদের থেকে এ পাপাচারীতা ও বাড়াবাড়ি দূর করে দিতেন। কিন্তু তারা বিদ্বেষ পোষণ করে বললো, এ অঙ্গীকারাবদ্ধ নাবী কিভাবে শেষ যুগে আরব ও ইসমাঈলের বংশধর থেকে আগমন করবে? তিনিতো বনী ইসরাঈলের বংশধরদের থেকে আগমনের উপযুক্ত। ইসমাঈলের বংশধরদের মধ্যে থেকে তিনি আগমন করবেন না। তারা এভাবেই বলতো, অতঃপর তারা মুহাম্মাদ ও তার উম্মতের সাথে হিংসা করতো এবং তাকে অস্বীকার করতো অথচ তারা জানতো তিনি মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। হিংসা ও দাম্ভিকতাই তাদেরকে কাফির হতে বাধ্য করে। আমরা আল্লাহর নিকট এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

তারা মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অস্বীকার করার সাথে মূসা আলাইহিস সালাম ও তার কিতাব তাওরাতকেও অস্বীকার করতো। মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি বিদ্বেষ বশত তাওরাতকে তারা অস্বীকার করতো। আর তাদের শত্রু ফেরআউনের দীন যাদুর কিতাবের মাধ্যমে তারা তাওরাত পরিবর্তন করে। কেননা ফেরআউনের সম্প্রদায়ের মাঝে যাদু বিদ্যা ছড়িয়ে পড়ে। তাই তারা

নাযিলকৃত অহীর বিধান পরিত্যাগ করে ও তাদের শত্রুরা যে যাদুকর্ম করতো তারা তা গ্রহণ করে। এটা বিস্ময়কর! আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ} [البقرة:101]

আর যখন তাদের নিকট আল্লাহর কাছ থেকে একজন রসূল এল, তাদের সাথে যা আছে তা সমর্থন করে, আহলে কিতাবের একটি দল আল-াহর কিতাবকে তাদের পেছনে ফেলে দেয়, (এভাবে যে) মনে হয় যেন তারা জানে না *(সূরা আল বাক্বারাহ ২:১০১)*।

{كَأَنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ}অর্থাৎ রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার গুণাবলী এবং তিনি যা নিয়ে এসেছেন তা যেন তারা জানতোই না। যারা তাকে চিনতো না, তারা অহংকার ও ধৃষ্টতার সাথে জাহিলদের মত কর্ম করতো। (لأنهم لا يعلمون) লি আন্নাহুম লা ইয়ালামুনা 'তথা কেননা তারা জানে না' আল্লাহ তা'আলা একথা বলেননি। বরং বলেছেন (كَأَنَّهُمْ لايَعْلَمُونَ)

অর্থাৎ তারা যেন জানেই না। কেননা বিদ্বান তার জ্ঞানানুযায়ী আমল না করলে বুঝতে হবে সে যেন জানেই না। কারণ জ্ঞানের ফলাফল হলো আমল।

আলেম আমল না করলে জাহিল ও আলেম সমান হয়ে যায়। বরং জাহিলের গুনাহ তার চেয়ে হালকা হয়ে থাকে। আল্লাহ বলেন,

{وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ} [البقرة: 102]

আর তারা অনুসরণ করেছে, যা শয়তানরা সুলাইমানের রাজত্বে পাঠ করত *(সূরা আল বাক্বারাহ ২:১০২)*।

এটা যাদু। তাই যাদুর মৌলিকত্ব হলো তা শয়তানের কর্ম। বিভিন্ন যুগে কাফিররা যাদু কর্মের উত্তরাধিকারী হতো। ফেরআউন, তার সম্প্রদায় ও ইয়াহুদীরা তাওরাতের পরিবর্তে যাদু কর্মে উত্তরাধিকারী লাভ করে। তাই

যাদু প্রাচীন বিষয়। আর এক প্রজন্মের পর পরবর্তী প্রজন্মের কাফিররা যাদু কর্মের উত্তরাধিকারী হয়। এটাই কাফিরদের শাস্তি। মানুষ হক্ব পরিত্যাগ করলে বাতিলের পরীক্ষায় পড়ে। এটি এমন রীতি যা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয় না। কতিপয় মুসলিম আল্লাহর কিতাব ও রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহকে পরিত্যাগ করে মানুষের কথা, দর্শন বিদ্যা ও কালাম শাস্ত্র গ্রহণ করেছে। তারাও এদেরই সমগোত্রীয়।

তারা আল্লাহর কিতাব ও রসূলের সুন্নাহ পরিত্যাগ করেছে, অন্যকিছু গ্রহণ করেছে। কেননা, কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বিমুখ হয়ে এ দু'টির আক্বীদা গ্রহণ করেনি। তাই কুফরী ও নাস্তিক্যবাদের আক্বীদা গ্রহণের মাধ্যমে তারা পরীক্ষায় পড়েছে।

গতরাতের সাদৃশ্য কিরূপ হয় ! এরূপ যে হক্ব পরিত্যাগ করবে, সে বাতিলের পরীক্ষায় পড়বে। আর যে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মত পরিত্যাগ করবে, সে ভ্রান্ত দলের মাযহাব গ্রহণের মাধ্যমে পরীক্ষায় পড়বে। আর কিতাব ও সুন্নাহ এবং আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের বিরূদ্ধে যে ভিন্ন মতের ভ্রষ্ট জামা'আতের পক্ষালম্বন করবে, সে ভ্রষ্ট দলে যোগদানের মাধ্যমে পরীক্ষায় পড়বে। এটাই মহান আল্লাহর রীতি। এখানে হক্ব বর্জনের ব্যাপারে মুসলিদের সতর্ক করা হয়েছে। কেননা, হক্ব বর্জন করলে বাতিলের পরীক্ষায় পড়বে। আর হক্বপন্থীদের পরিত্যাগ করলে সর্বদা বাতিলপন্থীদের অনুসারী হয়ে যাবে।

৩২. হক্ব অস্বীকার করা যখন তা অপ্রিয় কারো কাছে থাকে

হক্ব অস্বীকার করা যখন তা অন্যের নিকট বিদ্যমান, যা তাদের অপছন্দনীয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ} [البقرة: 113] .

আর ইয়াহূদীরা বলে, নাসারাদের কোন ভিত্তি নেই এবং নাসারারা বলে ইয়াহূদীদের কোন ভিত্তি নেই *(সূরা আল বাক্বারাহ ২:১১৩)*।

....

ব্যাখ্যা: সবচেয়ে মারাত্মক সমস্যা হলো জাহিলদের হক্ব অস্বীকার করা যখন তা অন্যের নিকট বিদ্যমান, যা তাদের অপছন্দনীয়। অর্থাৎ পছন্দ করে না। ব্যক্তির পক্ষপাতিত্বের কারণে অপছন্দের সাথে অন্যের হক্বকে বর্জন করে। তাদের হক্ব বর্জনের কারণ এটাই। আর যে ব্যক্তিই হক্ব নিয়ে আসবে তা গ্রহণ করা মুসলিমের উপর ওয়াজীব। কেননা বন্ধু অথবা শত্রু যার নিকট হক্ব পাওয়া যাবে সেখান থেকেই তা গ্রহণ করা মু'মিনের উদ্দেশ্য। কারণ মু'মিনতো কেবল হক্ব চায়। কেবল ব্যক্তি কেন্দ্রীক কোন কিছু হলে তা হবে জাহিলী দীন।

আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের উদাহরণ উল্লেখ করেছেন। তারা আহলে কিতাব ও আহলে ইলম। ইয়াহুদীরা খ্রিষ্টানদের হক্ব বর্জন করে। আর খ্রিষ্টানরাও ইয়াহুদীদের হক্ব বর্জন করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ} [البقرة: 113]

আর ইয়াহূদীরা বলে, নাসারাদের কোন ভিত্তি নেই এবং নাসারারা বলে ইয়াহূদীদের কোন ভিত্তি নেই *(সূরা আল বাক্বারাহ ২:১১৩)*।

যারা এরূপ করবে তারা হবে কু-প্রবৃত্তির অনুসারী। ইয়াহুদীরা খ্রিষ্টানদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে তাদের হক্ব অস্বীকার করে। খ্রিষ্টানরাও শত্রুতা বশতঃ ইয়াহুদীদের হক্ব অস্বীকার করে। {وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ} অথচ তারা কিতাব পাঠ করে, তিনি তাদেরকে হক্ব কবুলের নির্দেশ দেন। আল্লাহ বলেন,

{كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ} [البقرة: 113]

এভাবেই, যারা কিছু জানে না, তারা তাদের কথার মত কথা বলে *(সূরা আল বাক্বারাহ ২:১১৩)*।

যাদের নিকট কিতাব নেই তারা এ পদ্ধতির উপর পরিচালিত হয়। প্রত্যেক দল অপর দলকে অস্বীকার করে, তৎসঙ্গে তাদের হক্বকেও অস্বীকার করে।

মোদ্দা কথা হলো ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের রীতি থেকে বিরত থাকা মুসলিমের উপর ওয়াজীব। কারণ যাকে তারা পছন্দ করে না, তাদের হক্বকে অস্বীকার করাই তাদের রীতি। সমাজে এমন কতিপয় ব্যক্তি রয়েছে যারা কেবল নিজেদের হক্বকে ধারণ করতে বলে। যেমন বর্তমানে এদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, কোন দল বা জামা'আত যখন কোন আলেমের সাথে শত্রুতা পোষণ করে, তখন তার নিকট যে হক্ব আছে তা তারা বর্জন করে। ঐ আলেমের সাথে তাদের শত্রুতাই হক্ব বর্জনে তাদেরকে প্ররোচিত করে। আর এ শত্রুতা অন্ধকারে চলতে, আলেমের প্রতি অনাগ্রহীতায় প্ররোচিত করে এবং তার রচিত কিতাবাদী ও পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করে। যদিও আলেম হক্বপন্থী হয়ে থাকেন। কিন্তু কেন এরূপ করে? তারা ঐ আলেমের হক্ব পছন্দ করে না, এটাই একমাত্র কারণ। হে মুসলিম! তুমি যাকে ভালবাস না যদি তার সাথে হক্ব থাকে, তা কবুল করা তোমার উপর ওয়াজীব। আর হক্ব গ্রহণে ব্যক্তিগত শত্রুতা ও নিজের খেয়াল খুশি অন্তরায় হতে পারে না।

নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এক ইয়াহুদী এসে বললো,

إنّكم تشركون، تقولون: ما شاء الله وشاء محمد أمر أن يقولو: " ماشاء الله وحده " ولا يقولو ماشاء الله وشاء محمد

আপনারাতো শিরক করেন। আপনারা বলে থাকেন, আল্লাহ ও মুহাম্মাদ যা চান। 'একমাত্র আল্লাহ যা চান' ইয়াহুদী এ কথা বলতে বলেন। আর 'আল্লাহ ও মুহাম্মাদ যা চান' একথা বলবে না।[৩৩]

অতঃপর নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হক্বকে কবুল করেন। আর তিনি ছাহাবীদের এ ধরণের ভুল কথা ছেড়ে দিতে নির্দেশ দেন।

অনুরূপভাবে ইয়াহুদী আলেমদের থেকে এক আলেম নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে বললো, আল্লাহ তা'আলা ডান হাতে আসমান পেঁচিয়ে ধরবেন, এক আঙ্গুলের উপর পাহাড়, এক আঙ্গুলের উপর জমিন স্থাপন করবেন....হাদীসের শেষ পর্যন্ত বলতে থাকলে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সমর্থনে হাসলেন, এমনকি তার সামনের দাঁত প্রকাশ হলো।[৩৪] আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করে বলেন,

{وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} [الزمر:67]

আর তারা আল্লাহকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়নি। অথচ কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবীই থাকবে তাঁর মুষ্টিতে এবং আকাশসমূহ তাঁর ডান হাতে ভাঁজ করা থাকবে। তিনি পবিত্র, তারা যাদেরকে শরীক করে তিনি তাদের ঊর্ধ্বে *(সূরা যুমার ৩৯:৬৭)*।

---

৩৩. ছহীহ: নাসাঈ, মুসনাদে আহমাদ, বাইহাকী সুনানুল কুবরা। জুহাইনার স্ত্রী কুতাইলা হতে বর্ণিত, এক ইয়াহুদী নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বললো, আপনারাতো অংশীদার স্থাপন করেন, শিরক করেন, আপনারা বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা ও আপনি যা চান। আর কাবার শপথ! এ কথাও বলেন। অতঃপর নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষকে নির্দেশ দিলেন যে, যখন তারা শপথ করতে ইচ্ছা করবে তখন বলবে, কাবার রবের শপথ! আর বলবে, আল্লাহ তা'আলা যা চান অতঃপর আপনি যা চান।

৩৪. ছহীহ বুখারী ৪৮১১, ছহীহ মুসলিম ২৭৮৬।

এ ইয়াহুদী যাজকের কথা সত্যের অনুকূলে হওয়ায় রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কথাকে গ্রহণ করলেন এবং আনন্দিত হলেন।

মোদ্দা কথা হলো, হক্ব গ্রহণ করা মুসলিমের উপর আবশ্যক। ব্যক্তিগত শত্রুতা ও উদ্দেশ্য তাকে প্ররোচিত করতে পারবে না। আর কতিপয় হক্বপন্থীদের ব্যাপারে বিদ্বেষ পোষণ করা যাবে না। হক্বপন্থী আলেম যা বলে তা বর্জনে এ বিষয়গুলো যেন প্ররোচিত না করে। বরং হক্ব গ্রহণের মাধ্যমে যেন উপকার লাভ হয়। এমনকি আলেম যদি সরল পথে না থাকে, তার মাঝে দোষ-ত্রুটি ও নিন্দনীয় কিছু পাওয়া যায়, এমতবস্থায় সে হক্ব প্রচার করলে তার হক্বকে গ্রহণ করা সঠিক হবে। তার ব্যক্তিসত্তার কারণে গ্রহণ করা হতে বিরত হবে না। বরং হক্ব হিসাবেই তা গ্রহণ করা হবে। আর এটাই আবশ্যক। রব প্রদত্ত এ পদ্ধতি অনুসরণ পূর্বক হক্বপন্থীরা যা নিয়ে আসেন তা থেকে হক্ব গ্রহণ করা শিক্ষার্থীর উপর আবশ্যক।

৩৩. তাদের স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতির মধ্যে বৈপরীত্য

জাহিলরা তাদের দীনের অনুমোদিত বিষয় অস্বীকার করে। যেমন তারা হজ্জের ক্ষেত্রে করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ} [البقرة: 130]

আর যে নিজকে নির্বোধ বানিয়েছে, সে ব্যতীত কে ইবরাহীমের আদর্শ থেকে বিমুখ হতে পারে? *(সূরা বাক্বারাহ ২:১৩০)*।

....

ব্যাখ্যা: ইয়াহুদীরা দাবি করে যে, তারা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর আদর্শের উপরই রয়েছে। অথচ যখন কিবলা পরিবর্তন করে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর দ্বারা নির্মিত কা'বাকে কিবলা নির্ধারণ করা হলো

ইয়াহুদীরা তখন চুড়ান্তভাবে কা'বাকে অস্বীকার করলো। আমরা এ থেকে আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। কেননা, কা'বা ও ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর দীনের বিধান হজ্জকে ইয়াহুদীরা স্বীকৃতি দেয় না। তারা কিবলামুখী হওয়াকে অস্বীকার করে অথচ তারা জানে এটা সত্য-হক্ব। কাবা এমন ঘর যা মহান আল্লাহর নির্দেশে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম নির্মাণ করেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ} [الحج: 26] {وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ} [البقرة: 127]

আর স্মরণ কর, যখন আমি ইবরাহীমকে সে ঘরের (বায়তুল্লাহ্‌র) স্থাননির্ধারণ করে দিয়েছিলাম *(সূরা হাজ্জ ২২:২৬)*। আর যখন ইবরাহীম ও ইসমাইল কাবার ভিত্‌গুলো উঠাচ্ছিল *(সূরা বাক্বারাহ ২:১২৭)*।

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর মাধ্যমে আল্লাহর নির্দেশে কা'বা নির্মিত হয়। আর কা'বাকে কেবলা হিসাবে কবুল করা হয়েছে অথচ তারা এটাকে অস্বীকার করে। অনুরূপভাবে হজ্জ পালন করা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর আদর্শ। এটা জানা সত্ত্বেও তারা তা অস্বীকার করে। কিন্তু মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি তাদের শত্রুতাই এসব কিছু অস্বীকার করতে তাদেরকে প্ররোচিত করে। সুতরাং কা'বা হলো ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর মিরাছ বা উত্তরাধীকার। কা'বামুখী হয়ে ছলাত আদায় করা এবং সেখানে হজ্জ ও উমরা পালনের ইচ্ছা করা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর দীনের অন্তর্ভুক্ত। আর ইয়াহুদীরা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর দীনে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করে অথচ তার বৃহৎ নিদর্শনাবলী তারা অস্বীকার করে। তাই এটা বিস্ময়কর দ্বন্দ্বের অন্তর্ভুক্ত।

এমনিভাবে যে নিজেকে ইসলামের দিকে সম্পৃক্ত করে এবং ইসলামের কতিপয় বিধান পরিত্যাগ করে বলে, আমি মুসলিম। অতঃপর সে কবর পূজা করে, সেখানে প্রার্থনা করে, বরকত কামনা করে ও কবরের মাটি দিয়ে শরীর মুছে। যখন তাকে বলা হয়, এগুলো শিরক। তখন সে তা

পরিত্যাগ করে না, বরং এর উপরই অটল থাকে এবং এগুলো থেকে বাধাদানকারীর সাথে শত্রুতা পোষণ করে। এরূপ সম্পৃক্ততা দ্বন্দ্বের অন্তর্ভুক্ত। আর যদিও ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত হয়, কিন্তু ইসলামের মহা নিদর্শন তাওহীদের বিরোধিতা করে।

৩৪. প্রত্যেক দল অন্যদের ব্যতিরেকে শুধু নিজেদেরকে হক্ব মনে করে

প্রত্যেক দল দাবি করে যে, তারা মুক্তি প্রাপ্ত। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [البقرة: 111]

বল, তোমরা তোমাদের প্রমাণ নিয়ে আস, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক *(সূরা বাক্বারাহ ২:১১১)*।

অতঃপর, আল্লাহ সঠিক বিষয় বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

{بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ} [البقرة: 112]

হ্যাঁ, যে নিজকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করেছে এবং সে সৎকর্মশীলও, *(সূরা বাক্বারাহ ২:১১২)*।

....

ব্যাখ্যা:জাহিলদের সমস্যাবলী হচ্ছেঃ জাহিলদের প্রত্যেক দল দাবি করে যে, তারা হক্বের উপর আছে, আর অন্যরা বাতিল। ইয়াহূদী, খ্রিষ্টান ও তাদের মত অন্য জাতির মাঝে এ ধারণা বিদ্যমান। আল্লাহ বলেন,

{وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى} [البقرة: 111]

আর তারা বলে, ইয়াহূদী কিংবা নাসারা ব্যতীত অন্য কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না *(সূরা বাক্বারাহ ২:১১১)*।

ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানরা তাদের হেদায়াত ও জান্নাত লাভের বিষয়কে সীমায়িত করেছে। ভ্রষ্টদলগুলো তাদের মতই। প্রত্যেকে দাবি করে তারাই মুক্তিপ্রাপ্ত, অন্যরা বাতিল। প্রত্যেক দল দাবি করে তাদের মুক্তি লাভের ব্যাপারে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

"ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار، إلا واحدة" ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين العلامة الفارقة لهذه الفرقة عن غيرها لما قالوا: "من هي يا رسول الله؟ قال: "من كان على ما أنا عليه وأصحابي"

আমার উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। একটি দল ছাড়া প্রত্যেকেই জাহান্নামী। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্য দল থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত দলের আলাদা নিদর্শন বর্ণনা করেন। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! তারা কে? জবাবে তিনি বলেন, যারা আমি ও আমার ছাহাবীগণের রীতির উপর থাকবে।[৩৫] একারণে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ} [البقرة: 111]

বল, তোমরা তোমাদের প্রমাণ নিয়ে আস, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক *(সূরা আল বাক্বারাহ ২:১১১)*।

অর্থাৎ তোমরা যা বল তথা ইয়াহুদী-খ্রিষ্টান ছাড়া কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না, একথার প্রমাণ পেশ করো। কেননা, এটি একটি দাবি। আর প্রমাণ ছাড়া কোন দাবি গ্রহণযোগ্য নয়। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ} [البقرة: 112]

---

৩৫. ছহীহ: আবূ দাউদ ৪৫৯৬-৪৫৯৭, তিরমিযী ২৬৪৫-২৬৪৬, ইবনে মাজাহ ৩৯৯১-৩৯৯৩, জামে ছহীহ ১০৮২-১০৮৩।।

হ্যাঁ, যে নিজকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করেছে এবং সে সৎকর্মশীলও, *(সূরা বাক্বারাহ ২:১১২)*।

{أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ} অর্থাৎ (১) আল্লাহর দীনের প্রতি আন্তরিক হয় ও শিরক থেকে বেঁচে থাকে। {وَهُوَ مُحْسِنٌ} অর্থাৎ (২) রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্যকারী। এ দু'টি শর্ত যে পূর্ণ করবে সে জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। পক্ষান্তরে, শর্ত দু'টি অথবা এর কোন একটি ভঙ্গ করলে জাহান্নামী হবে, যদিও সে জান্নাতী দাবি করে।

তার বাণী: { بَلَى مَنْ أَسْلَمَ} এ আয়াতটির মাধ্যমে নির্ধারিত হয় সঠিক পদ্ধতি, যার উপর মুক্তি প্রাপ্ত দল পরিচালিত হয়। কেননা, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

من كان مثل ما أنا عليه وأصحابي

আমি এবং আমার ছাহাবীগণের পদ্ধতি যারা অনুসরণ করে (তারা ফিরকা নাজিয়া)।[৩৬] এটা সুন্নাহর বিধান। আর আয়াতটি কুরআনের বিধান।

যে জান্নাত লাভ করতে চায় সে যেন আল্লাহর উদ্দেশে নিজেকে সমর্পণ করে এবং সুন্নাহ অনুসারে উত্তমরূপে আমল করে। আর বিদ'আত ও নবাবিষ্কৃত বিষয় থেকে বিরত থাকবে, এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা যুক্তি-প্রমাণ পেশ করেননি।

৩৬. হাসান: তিরমিযী ২৬৪১, মুস্তাদরাক হাকীম ৪৪৪, কিতাবুর ইলম।

৩৫. হারাম কাজের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করা

লজ্জাস্থান প্রকাশের মাধ্যমে ইবাদত করা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

: {وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا} [الأعراف: 28]

আর যখন তারা কোন অশ্লীল কাজ করে তখন বলে, আমরা এতে আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছি এবং আল্লাহ আমাদেরকে এর নির্দেশ দিয়েছেন *(সূরা আরাফ ৭:২৮)*।

....

ব্যাখ্যা: জাহিলরা কা'বা ঘর তাওয়াফের সময় লজ্জাস্থান প্রকাশের মাধ্যমে ইবাদত করতো। তারা আহলে হারামের অন্তর্ভুক্ত নয় এ মর্মে শয়তান এহেন খারাপ কর্মকে তাদের জন্য সৌন্দর্য মন্ডিত করে তুলে ধরে। সে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগমন করতো। শয়তান যে পোশাকে আগমন করতো, একই পোশাকে হারাম এলাকায় প্রবেশ করতো না। এখানে সে আল্লাহর অবাধ্য কর্ম করতো। আহলে হারামের কাউকে পেলে শয়তান তাকে পোশাক দিয়ে দিত, যাতে সে ঐ পোশাকে তাওয়াফ করে নচেৎ শয়তান হারাম এলাকার সীমানায় পোশাক খুলে ফেলতো এবং উলঙ্গ অবস্থায় হারামে প্রবেশ করতো। এমনিভাবে শয়তান তাদের জন্য সৌন্দর্য তুলে ধরতো। এ অশ্লীল কর্মের সময় তারা বলতো, আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে আমরা এর উপরই পেয়েছি।

{وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا} [الأعراف: 28] .

আল্লাহ আমাদেরকে এর নির্দেশ দিয়েছেন *(সূরা আরাফ ৭:২৮)*।

লক্ষণীয় যে, কাশফুল আওরাহ (উলঙ্গপনার) নাম ফাহিসাহ (অশ্লীলতা)। আর যা কিছু জঘন্যতার শেষ সীমায় পৌঁছে তা ফাহিসাহ বলে গণ্য। অবাধে এমন মন্দ কর্ম সংঘটিত হওয়াকে বর্তমান যুগের অনেক মানুষ সংস্কৃতি ও অগ্রগতি গণ্য করে।

আল্লাহ তা‘আলা জাহিলদের এরূপ কর্ম প্রত্যাখ্যান করে বলেন,

{قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ} [الأعراف: 28]

বল, আল্লাহ অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহর ব্যাপারে এমন কিছু বলছ, যা তোমরা জান না? *(সূরা আরাফ ৭:২৮)*।

অর্থাৎ বান্দার জন্য উলঙ্গপনা শরী‘আত সম্মত নয়। তাদের জন্য আবৃত থাকাকে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, যাতে ফিতনা মুক্ত থাকা যায়, আর স্বভাবজাত পাপাচার থেকেও দুরে থাকা যায়। তারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে, জ্ঞান ছাড়াই বিরোধীতা করে। তারা দু’টি বাতিল-মিথ্যা যুক্তি পেশ করে, যার একটি অপরটি থেকে বেশি মিথ্যা।

প্রথমত: [الأعراف: 28] {وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا} আমরা আমাদের বাপ-দাদার রীতির উপরই বিদ্যমান (সূরা আল আরাফ ৭:২৮)।

দ্বিতীয়ত: বড়ই মারাত্মক। {وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا} আল্লাহ আমাদেরকে এরূপ নির্দেশ দিয়েছেন।

এভাবে তারা আল্লাহ তা‘আলার উপর মিথ্যারোপ করে, আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন,

{قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ} [الأعراف: 28]

বল, আল্লাহ অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহর ব্যাপারে এমন কিছু বলছ, যা তোমরা জান না? *(সূরা আরাফ ২:২৮)*।

জ্ঞান ছাড়া আল্লাহ তা‘আলার বিরুদ্ধে কথা বলা মারাত্মক জঘন্য অন্যায়।

আল্লাহ তা‘আলা যা নিষেধ করেছেন তা তিনি বর্ণনা করেন,

{قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ} [الأعراف: 33]

বল, আমার রব তো হারাম করেছেন অশ্লীল কাজ যা প্রকাশ পায় এবং যা গোপন থাকে, *(সূরা আরাফ ৭:৩৩)*।

(فاحشة) শব্দটির বহুবচন (فواحش) আর নিষিদ্ধ অন্যায় কর্মই হলো ফাহিসাহ। আর উলঙ্গপনা অন্যায় কর্মের অন্তর্ভুক্ত। {مَا ظَهَرَ مِنْهَا} এআয়াতাংশ জনসম্মুখে প্রকাশ্যে অশ্লীলতার কথা বুঝায়। আর {وَمَا بَطَنَ} এ অংশটুকু মানুষের গোপন অপকর্ম বুঝায় যা আল্লাহ ও মানুষের মাঝে সীমায়িত থাকে।

{وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا} [الأعراف: 33]

আল্লাহর সাথে তোমাদের শরীক করা, যে ব্যাপারে আল্লাহ কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি (সূরা আরাফ ৭:৩৩)

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের জন্য কখনোই প্রমাণ নাযিল করেননি। তার একত্বের উপরই তিনি দলীল নাযিল করেছেন। আল্লাহ তা'আলা শিরককে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ} [الأعراف: 33]

আল্লাহর উপরে এমন কিছু বলা যা তোমরা জান না *(সূরা আরাফ ৭:৩৩)*।

কোন জ্ঞান ছাড়াই আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধে কথা বলা শিরকের চেয়েও জঘন্য। আর একারণে জাহিলদের কথা হলো, আল্লাহ আমাদের উলঙ্গপনার নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহর কিতাব ও রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহর দলীল ব্যতীরেকে যারা হালাল ও হারামের ব্যাপারে কথা বলে, তারা যেন সতর্ক হয়। আল্লাহর বাণী:

{يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ}

হে বণী আদম, তোমরা তোমাদের বেশ-ভূষা গ্রহণ কর *(সূরা আরাফ ৭:৩১)*।

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের গোপ্তাঙ্গ আবৃত করো।

{عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31] অর্থাৎ প্রতি ছলাতে

অর্থাৎ প্রত্যেক ছ্বলাতের সময় সাজ-সজ্জা গ্রহণ করতে হয় এবং বাইতুল্লাহ তাওয়াফের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য। জাহিলরা উলঙ্গপনার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে চাইতো, এটাকে তারা আল্লাহর ইবাদত গণ্য করতো। এটা মিথ্যা ও বক্রতার মধ্যে অধিক অশ্লীল। আমরা এ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

জরুরী অবস্থা ছাড়া আমরা উলঙ্গ হওয়াকে হারাম হিসাবেই গ্রহণ করবো। জরুরী অবস্থাঃ যেমন (মলত্যাগ) ও চিকিৎসা অথবা স্বামী-স্ত্রী পরস্পর মিলনের সময় উলঙ্গ হওয়া। এ দু'টি অবস্থা ছাড়া কঠোরতার সাথে উলঙ্গ হওয়া হারাম। কেননা তা অশ্লীলতা ও পাপাচারীতার দিকে ধাবিত করে। শয়তান জানে; উলঙ্গপনা ব্যভিচারীতা ও সমকামিতার দিকে ঠেলে দেয়। এ কারণে মানুষ উলঙ্গপনায় আগ্রহী হয়। আর এটার নাম রাখা হয়েছে অগ্রগতি, সভ্যতা ও সংস্কৃতি। পক্ষান্তরে শরীর আবৃত রাখা ও মার্জিত পোশাককে অপছন্দ করে বলা হয়, এটা অনগ্রগতি, পশ্চাদগামিতা ও প্রাচীন রীতি। বর্তমানে হিজাবকে ত্যাগ করতে বলা হয়, পুস্তিকায়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও সমাবেশে এ ভাল বিষয়টি নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হয়। কিন্তু ঈমানদারগণ দীন আঁকড়ে ধরায় এসব তাদের কোন ক্ষতি করতে পারে না।

৩৬. হালালকে হারাম ও হারামকে হালালে পরিণত করার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশা করা

জাহিলরা শিরকের মাধ্যমে যেমন ইবাদত করে তেমনি হালালকে হারাম করার মাধ্যমেও ইবাদত করে।

....

ব্যাখ্যা: জাহিলী সমস্যা: আল্লাহ তা'আলা যা আবশ্যকীয়ভাবে হারাম করেছেন, তার মাধ্যমে জাহিলদের ইবাদত করা তথা নৈকট্য লাভ করা। তাওয়াফের সময় তারা লজ্জাস্থান আবৃত রাখাকে হারাম করেছে যেমন মুশরিকদের এ অবস্থা সম্পর্কে পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরাও এরূপ করেছে। খ্রিষ্টানরা অনেক পবিত্র জিনিসকে নিজেদের উপর হারাম করেছে। অপরদিকে, আল্লাহ তা'আলা যা কিছু হারাম করেছেন ইয়াহুদীরা তা নিজেদের জন্য বৈধ করে নিয়েছে, যেমন সুদ। অথচ হারাম কাজ থেকে বিরত থাকতে ও মানুষের সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।

আর মুশরিকরা বিভিন্ন প্রকার চতুষ্পদ জন্তু হারাম করেছে। এর মধ্যে (البحيرة) বাহিরাহ তথা ঝুলন্ত কান বিশিষ্ট উষ্ট্রী, (السائبة) সায়িবাহ তথা মুক্ত উষ্ট্রী ও (الوصيلة) ওয়াসিলাহ বা দু'বার বাচ্চা প্রসব করেছে এমন উষ্ট্রী উল্লেখ যোগ্য। এ চতুষ্পদ জন্তুকে তারা এসব নামকরণ করেছে। আর মূর্তির কারণে পশুগুলোকে তারা হারাম করেছে। আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে এসব থেকে নিষেধ করে বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [المائدة: 87] ،

হে মুমিনগণ, আল্লাহ যে সব পবিত্র বস্তু তোমাদের জন্য হালাল করেছেন, তোমরা তা হারাম করো না এবং তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না *(সূরা আল মায়িদা ৫:৮৭)*।

আল্লাহ তা‘আলা যা হালাল করেছেন, মু’মিনগণ তা হারাম করতে কঠোর হবে না, সহজেই হারাম হোক তাও চাইবে না এবং হারামকে বৈধও মনে করবে না। বরং ন্যায়নীতি অবলম্বন করবে।

সুতরাং হালালকে হারাম ও হারামকে হালালে পরিনত করা জাহিলী দীনের অন্তর্ভুক্ত। তাই আল্লাহর কিতাবের দলীল-প্রমাণ ছাড়া কারো জন্য হালাল ও হারাম পরিবর্তন করে তা ইবাদত গণ্য করা বৈধ নয়। যেমন খ্রিষ্টানদের বৈরাগ্যতা ও মুশরিকদের বাইতুল্লাহ তাওয়াফের মাধ্যমে যে ইবাদত হয় তা আল্লাহ তা‘আলা শরী‘আত সম্মত করেননি। আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে তার ইবাদত ও নৈকট্য লাভ করা বিধিসম্মত নয়। মহান আল্লাহ এ ধরণের শরী‘আতের অনুমোদন দেননি।

এটি অত্যান্ত মারাত্মক সমস্যা। যেমনভাবে জাহিলরা শিরকের মাধ্যমে ইবাদত করতো, যা মহা অন্যায়। পূর্বযুগের শিরক, বর্তমানেও বিদ্যমান। তাই যারা কবর প্রদক্ষিণ করে, সেখানে প্রাণী উৎসর্গ ও মান্নত করে বলে, এগুলো আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম; তাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন,

{مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى} [الزمر: 3] ،

‘আমরা কেবল এজন্যই তাদের ‘ইবাদত করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে *(সূরা আয যুমার ৩৯:৩)*।’

{هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ} [يونس: 18]

এরা আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী *(সূরা ইউনূস ১০:১৮)*।

প্রাচীন কালের মুশরিক ও বর্তমানে নিজেকে ইসলামের সাথে সম্পৃক্তকারী মুশরিকরাও এসব শিরকে লিপ্ত। তারা বলে, ঐ সকল নেক লোকদের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়। তারা আমাদের জন্য সুপারিশ করবে ও আল্লাহর নিকটবর্তী করে দিবে।

৩৭. আল্লাহ তা‘আলা ব্যতীত ধর্মগুরু ও সংসারবিরাগীদেরকে রব হিসাবে গ্রহণ করা

আল্লাহ তা‘আলা ব্যতীত তাদেরকে রব হিসাবে গ্রহণ করে ইবাদত করা।

....

ব্যাখ্যা: ইয়াহুদী খ্রিষ্টানদের ব্যাপারে আল্লাহ ত‘আলা বলেন,

{اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهاً وَاحِداً} [التوبة: 31]

তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পন্ডিতগণ ও সংসার-বিরাগীদের রব হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং মারইয়ামপুত্র মাসীহকেও। অথচ তারা এক ইলাহের ইবাদত করার জন্যই আদিষ্ট হয়েছে, তিনি ব্যতীত কোন (হক) ইলাহ নেই। তারা যে শরীক করে তিনি তা থেকে পবিত্র *(সূরা তাওবা ৯:৩১)*।

এখানে পন্ডিত বলতে আলেম ও সংসারবিরাগী বলতে ইবাদতকারী বুঝানো হয়েছে। ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানরা পন্ডিত ও সংসারবিরাগীদেরকে অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলার অবাধ্যতা সত্ত্বেও তাদের ইবাদত করে। তারা হালালকে হারাম ও হারামকে হালালে পরিণত করে। তারা তাদের আনুগত্যকে ইবাদত বলে গণ্য করে।

যেমন তারা বলে আলেমদের আনুগত্য করা ওয়াজীব। আমরা বলবো আল্লাহর আনুগত্যে তাদের আনুগত্যে ওয়াজীব। আর আল্লাহর অবাধ্যতায় তাদের আনুগত্য নেই। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির কোন আনুগত্য নেই।[৩৭]

---

৩৭. ছহীহ: তিরমিযী ১৭০৭।

যদিও আলিম বা ইবাদতকারীরা মানুষের মাঝে বেশি ইবাদতে লিপ্ত থাকে। তারা হক্কের উপর অটল না থাকলে তাদের আনুগত্য করা বৈধ নয়। আল্লাহ তা'আলা যা হারাম করেছেন তারা তা হালাল করে ও হালাল কে হারাম করে এটা জানা সত্ত্বেও যারা তাদের আনুগত্য করে, তারা মূলতঃ তাদেরকে রব হিসাবেই মেনে নেয়। অর্থাৎ তারা আল্লাহ তা'আলার সাথে তাদেরকে শরীক করে। কেননা হালাল-হারাম নির্ধারণ করা আল্লাহর অধিকার। আল্লাহর কিতাব ও রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ ছাড়া হালাল-হারামের পরিবর্তন ও শরীয়ত নির্ধারণ করা কারো জন্য বৈধ নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النحل: 117-116]

আর তোমাদের জিহ্বা দ্বারা বানানো মিথ্যার উপর নির্ভর করে বলো না যে, এটা হালাল এবং এটা হারাম, আল্লাহর উপর মিথ্যা রটানোর জন্য। নিশ্চয় যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা রটায়, তারা সফল হবে না। সামান্য ভোগ এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব *(সূরা নাহাল ১৬:১১৬,১১৭)*।

আলেমের সঠিক অথবা ভুল যা-ই হোক, আমরা সাধারণভাবে তাদের অনুসরণ করবো না। তারা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনিত হলে তবেই আমরা তাদের অনুসরণ করবো। আর তাদের দ্বারা সংঘটিত ভুল থেকে বিরত থাকবো। তাই যারা আল্লাহর আনুগত্য করে আমরা তাদের অনুসরণ করবো। পক্ষান্তরে, যারা আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য হয়, তাদেরকে অমান্য করবো এবং তাদের ভুলের বিরোধিতা করবো। এটাই সঠিক দীন। আর আলেমের ভুল বুঝতে না পারলে তা অজুহাত হিসাবে গণ্য হবে। আর যারা বলে, আলেমদের ভুল তাদের উপরই বর্তাবে, আমরা বলবো, এটা বলা বৈধ নয়। কিয়ামতের দিন তা কোন কাজে আসবে না। নিজ দায়িত্ব নিজের উপর ও তাদের দায়ভার তাদের উপরই বর্তাবে। আর আল্লাহর কিতাব ও রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহ ব্যতিরেকে

কোন ফাতওয়ার উপর নির্ভর করা যাবে না। ফাতওয়া দলীল সম্মত নয় জানা গেলে তা গ্রহণ করা হারাম, অন্যথায় অজুহাত বলে গণ্য হবে। তবে সঠিক বিষয় অনুসন্ধান করা ও বেশি নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক।

৩৮. আল্লাহ্ তা'আলার নাম ও গুণাবলী অবিশ্বাস করা

গুণাবলী অবিশ্বাস করার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لا يَعْلَمُ كَثِيراً مِمَّا تَعْمَلُونَ} [فصلت: 22] .

তোমরা মনে করেছিল যে, তোমরা যা কিছু করতে আল্লাহ তার অনেক কিছুই জানেন না *(সূরা হা-মিম সাজদা ৪১:২২)*।

....

ব্যাখ্যা: (الصفات) আস-সিফাত তথা গুণসমূহ: অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার এমন গুণাবলী যা তিনি নিজের জন্য নির্ধারণ করেছেন। আর (الإلحاد) ইলহাদ তথা অবিশ্বাস এর আভিধানিক অর্থ হলো কোন বিষয় সাব্যস্ত করা হতে বিচ্যুত হওয়া। এখানে উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর গুণাবলী থেকে সরে যাওয়া। এ জন্য মহান আল্লাহ তার গুণাবলী অস্বীকার করাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাই আল্লাহর গুণাবলী অবিশ্বাস করা নাস্তিকতা। কেননা তা হক্ব থেকে দুরে সরিয়ে দেয় এবং হক্ব বিমুখ করে। জাহিলরা আল্লাহর গুণাবলী অবিশ্বাস করে অর্থাৎ তারা অস্বীকার করে এবং আল্লাহর গুণাবলী প্রত্যাখ্যান করে। এ বিষয়ে দলীল-প্রমাণ রয়েছে। আল্লাহ বলেন,

{وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصَارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لا يَعْلَمُ كَثِيراً مِمَّا تَعْمَلُونَ} [فصلت:22]

তোমরা কিছুই গোপন করতে না এই বিশ্বাসে যে, তোমাদের কর্ণ, চক্ষুসমূহ ও চর্মসমূহ তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে না। বরং তোমরা মনে করেছিল যে, তোমরা যা কিছু করতে আল্লাহ তার অনেক কিছুই জানেন না *(সূরা হা-মিম সাজদা ৪১:২২)*।

জাহিলরা মনে করে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের কর্মকান্ড সম্পর্কে বেশি কিছু জানেন না। তাই আল্লাহ তা'আলার (العلم) ইলম তথা জানার গুণকে তারা প্রত্যাখ্যান করে। আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী হতে (العلم) ইলম তথা 'সর্বজ্ঞাত' একটি গুরুত্বপূর্ণ সিফাত বা গুণ যা এ আয়াতটি দ্বারা প্রমাণিত। তাই আল্লাহ তা'আলা সব কিছুই জানেন। বান্দার কর্মসমূহ ও অন্যান্য বিষয় তার নিকট গোপন থাকে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ} [التغابن: 4]

আসমানসমূহ ও যমীনে যা কিছু আছে তিনি তা জানেন এবং তিনি জানেন যা তোমরা গোপন কর এবং যা তোমরা প্রকাশ কর। *(সূরা আত-তাগাবুন ৬৪:৪)*।

যা সংঘটিত হয় এবং হয় না তিনি তা সবই জানেন। যা সংঘটিত হয়নি তা কিভাবে হবে তিনি সেটাও জানেন। আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান সব কিছুকে অন্তর্ভুক্ত ও বেষ্টন করে রয়েছে। তাই যারা ধারণা করে যে, কতিপয় আমল সম্পর্কে তিনি জানেন না, তারা আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে নাস্তিক ও তার (العلم) ইলম-সর্বজ্ঞাত সিফাতকে প্রত্যাখ্যানকারী। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ} [فصلت: 23]

আর তোমাদের এ ধারণা যা তোমরা তোমাদের রব সম্পর্কে পোষণ করতে, তাই তোমাদের ধ্বংস করেছে *(সূরা হা-মিম সাজদা ৪১:২৩)*। অর্থাৎ তোমাদেরকে যা ক্ষতির মাঝে রেখেছে, সেটাই হলো ধ্বংস সাধন।

{فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ} [فصلت: 23]

ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলে *(সূরা হা-মিম সাজদা ৪১:২৩)*।

আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যারা আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীর মধ্যে হতে কোন গুণকে প্রত্যাখ্যান করে তারা জাহিলদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তির হুমকি। জাহমিয়্যাহ, মু'তাযিলা, আশআ'রীয়া ও মাতুরিদীয়্যা সম্প্রদায় আল্লাহর গুণাবলীকে প্রত্যাখ্যান করে। জাহিলদের এ নিকৃষ্ট স্বভাবে তারা অভ্যস্ত। তারা কঠিন ভীতিপ্রদর্শনকে পরোয়া করে না। তারা আল্লাহর প্রতি জঘন্য খারাপ ধারণা পোষণ করে। আল্লাহর গুণাবলীর সঠিক অর্থকে (বাতিল) ভুল অর্থের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা ও শুদ্ধ অর্থ গ্রহণ হতে বিরত থাকা নাস্তিকতার অন্তর্ভুক্ত। যেমন আল্লাহ তা'আলার আরশে 'সমুন্নত' হওয়া অর্থটিকে 'কর্তৃত্ব' অর্থে ব্যাখ্যা করা ও আল্লাহর 'হাত' অর্থকে 'ক্ষমতা' অর্থে ব্যবহার করা ইত্যাদি। আর গুণাবলীর ভুল অর্থকে আল্লাহর দিকে ন্যস্ত করা ও দলীল ভিত্তিক সঠিক অর্থকে অস্বীকার করা নাস্তিকতার অন্তর্ভুক্ত।

৩৯. আল্লাহ তা‘আলার নামসমূহ অবিশ্বাস করা।

আল্লাহ তা‘আলার নাম সমূহ অবিশ্বাস করার ব্যাপারে তিনি বলেন,

{وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ} [الرعد: 30]

তারা রহমানকে অস্বীকার করে *(সূরা রা‘দ ১৩:৩০)*।

....

ব্যাখ্যা: জাহিলরা আল্লাহ তা‘আলার গুণাবলী ও তার নাম সমূহকে অবিশ্বাস করে। তাই এগুলোকে তারা প্রত্যাখ্যান করে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ}

তারা রহমানকে অস্বীকার করে *(সূরা রা‘দ ১৩:৩০)*।

(الرحمن) আর-রহমান শব্দটি আল্লাহ তা‘আলার নাম সমূহের একটি।

أن الرسول صلى الله عليه وسلم لمّا أراد أن يكتب الصلح بينه وبين المشركين في الحديبية، فجاء سهيل بن عمرو، فقال: هات اكتب بيننا وبينكم كتاباً. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "بسم الله الرحمن الرحيم"، قال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو

এজন্য রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুশরিকদের সাথে হুদাইবিয়ার সন্ধি লিখতে চাইলে সুহাইল ইবনে আমর এসে বললো, আসেন আমরা উভয়ের মাঝে একটি সন্ধিনামা লেখি। অতঃপর লেখককে ডেকে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম "بسم الله الرحمن الرحيم" লিখতে বললেন, সুহাইল বললো, আল্লাহর কসম! ‘রহমান’ কে আমি তা জানি না।[৩৮]

---

৩৮. ছহীহ বুখারী ২৭৩১-২৭৩২।

তারা বললো, ইয়ামামার রহমান অর্থাৎ মুসাইলামাহ ছাড়া আমরা কোন রহমানকে চিনি না। কেননা, মুসাইলামাকে রহমান নামে ডাকা হতো। এমর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ} [الرعد:30]

এমনিভাবে আমি তোমাকে পাঠিয়েছি এমন এক জাতির নিকট, যার পূর্বে অনেক জাতি গত হয়েছে, যেন আমি তোমার প্রতি যে ওহী প্রেরণ করেছি, তা তাদের নিকট তিলাওয়াত কর। অথচ তারা রহমানকে অস্বীকার করে। বল, তিনি আমার রব, তিনি ছাড়া আর কোন সত্য ইলাহ নেই, তাঁরই উপর আমি তাওয়াক্কুল করেছি এবং তাঁরই দিকে আমার প্রত্যাবর্তন *(সূরা রা'দ ১৩:৩০)*।

এমনিভাবে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় ছলাত আদায় করতেন আর (يا أﷲ) হে আল্লাহ! (يا رحمن) হে দয়াময়! এভাবে আল্লাহকে ডাকতেন। আর মুশরিকরা বলতো, এ লোকের দিকে খেয়াল কর, মনে হয় সে এক উপাস্যের ইবাদত করে। অথচ সে (يا أﷲ) হে আল্লাহ! (يا رحمن) হে দয়াময়! বলে ডাকে, এতে দু' উপাস্যের ইবাদত করা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ} [الإسراء: 110]

বল, 'তোমরা '(তোমাদের রবকে) আল্লাহ' নামে ডাক অথবা 'রাহমান' নামে ডাক, যে নামেই তোমরা ডাক না কেন, তার জন্যই তো রয়েছে সুন্দর নামসমূহ *(সূরা বনী ইসরাঈল ১৭:১১০)*।

আল্লাহ তা'আলার অনেক নাম রয়েছে। নির্দিষ্ট সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ তা প্রমাণিত নয়। আল্লাহর নামগুলো মহানত্বের ভিত্তিতে করা হয়েছে।

মোদ্দাকথা, মুশরিকরা আল্লাহর নাম সমূহকে অস্বীকার করে। ভ্রষ্ট দলের মধ্যে জাহমিয়ারা (الجهمية) আল্লাহর নাম সমূহকে প্রত্যাখ্যান করে অথবা মু'তাযিলারা (المعتزلة) নামের অর্থ প্রত্যাখ্যান করে এবং নামের শব্দগুলোকে সমর্থন করে অথবা আশআ'রী (الأشاعرة) সম্প্রদায় কতিপয় গুণকে অস্বীকার করে এবং কতিপয়কে সমর্থন করে। জাহিলদের উত্তরাধিকারী হওয়ার কারণে তারা এসব করে অথচ আল্লাহ তা'আলা তার নামসমূহকে সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} [لأعراف: 180]

আর আল্লাহর জন্যই রয়েছে সুন্দরতম নামসমূহ। সুতরাং তোমরা তাকে সেসব নামের মাধ্যমে ডাক *(সূরা আরাফ ৭:১৮০)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} [طه:8]

আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন (সত্য) ইলাহ নেই; সুন্দর নামসমূহ তাঁরই *(সূরা ত্বা-হা ২০:৮)*। তিনি আরোও বলেন,

{لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى}

সুন্দর নামসমূহ তাঁরই *(সূরা ত্বা-হা ২০:৮)*।

নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو علمته أحداً من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به" في علم الغيب عندك

আমি তোমার প্রত্যেক নামের মাধ্যমে তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি। যে নাম তুমি নিজেই রেখেছ অথবা সৃষ্টির কাউকে তা শিক্ষা দিয়েছে অথবা তোমার কিতাবে ঐ নাম সমূহ বর্ণনা করেছ অথবা যে নামের মাধ্যমে তোমার অদৃশ্য জ্ঞানের কর্তৃত্ব রয়েছে।[৩৯]

---

৩৯. ছহীহ: মুসনাদ আহমাদ, ১/৩৯১ হাকীম, হা/১৯২০; ছহীহ ইবনে হিব্বান, হা/৯৬৮।

সুতরাং জানা গেল মহান আল্লাহর অনেক নাম রয়েছে। পবিত্র কুরআনে তার অনেক নাম তিনি বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে الرحمن، الرحيم، العزيز، الحكيم، الرؤوف، التواب، الغفار ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সূরা হাশরের শেষে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} [الحشر: 22،24] .

তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতিত কোন ইলাহ নেই; দৃশ্য-অদৃশ্যের জ্ঞাতা; তিনিই পরম করণাময়, দয়ালু। তিনিই আল্লাহ; যিনি ব্যতিত কোন ইলাহ নেই, তিনিই বাদশাহ, মহাপবিত্র, ত্রুটিমুক্ত, নিরাপত্তাদানকারী, রক্ষক, মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রতাপশালী, অতীব মহিমান্বিত, তারা যা শরিক করে তা হতে পবিত্র মহান। তিনিই আল্লাহ, স্রষ্টা, উদ্ভাবনকর্তা, আকৃতিদানকারী; তার রয়েছে সুন্দর নামসমূহ; *(সূরা হাশর ৫৯:২২-২৪)*।

আল্লাহ তা'আলার নাম সমূহের প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছ্বহীহ হাদীছে বলেন,

"إن لله تسعة وتسعين اسماً، من أحصاها دخل الجنة"

আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বইটি নাম রয়েছে, যে তা মুখস্থ করবে সে জান্নাত লাভ করবে।[৪০]

আল্লাহ তা'আলার নাম সমূহের অনেক দলীল-প্রমাণ রয়েছে। যে আল্লাহর নাম বিশ্বাস করে না সে আল্লাহকেও বিশ্বাস করে না।

৪০. ছ্বহীহ বুখারী, হা/২৭৩৬, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/২৬৭৭।

৪০. মহান পবিত্র রবকে অস্বীকার করা

ফেরআউনের সম্পদায় রবকে অস্তিত্বহীন মনে করতো।

....

ব্যাখ্যা: (التعطيل) আত-তা‘তিল তথা শূন্যকরণ এর প্রকৃত অর্থ হলো কোন জিনিসকে মুক্ত করা। যেমন বলা হয়, عطل المكان (আত্তালাল মাকান) অর্থাৎ সে জায়গাটি খালি করেছে। আরোও বলা হয়, امرأة عاطل (ইমরাতুন ‘আতিল) তথা মুক্ত মহিলা অর্থাৎ গয়না মুক্ত মহিলা। সুতরাং (التعطيل) শূন্য করণ অর্থ হলো কোন কিছু হতে কোন জিনিস বিলুপ্ত করা। আর এখানে উদ্দেশ্য হলো স্রষ্টার অস্তিত্বকে বাতিল জ্ঞান করা। এ জগতের স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা। যেমন জাহিলরা বলে, এ জগতকে কেবল প্রকৃতির ফলাফল হিসাবে পাওয়া যায়। আর আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকারকারী নাটেরগুরু ফেরআউন বলতো,

{يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي}[القصص: 38]

হে পরিষদবর্গ, আমি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ আছে বলে আমি জানি না *(সূরা ক্বাছাছ ২৮:৩৮)*।

আর এটি অহংকার ও ধৃষ্টতার অন্তর্ভুক্ত। অন্য আয়াতে আছে, সে বলতো,

{يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحاً لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِباً} [غافر: 36، 37]

(ফের‘আউন বলল), ‘হে হামান, আমার জন্য একটি উঁচু ইমারত বানাও যাতে আমি অবলম্বন পাই। আসমানে আরোহণের অবলম্বন, যাতে আমি মূসার ইলাহকে দেখতে পাই, আর আমি কেবল তাকে মিথ্যাবাদী মনে করি।’ আর এভাবে ফের‘আউনের কাছে তার মন্দ কাজ শোভিত করে

দেয়া হয়েছিল এবং তাকে বাঁধা দেয়া হয়েছিল সৎপথ থেকে। আর ফের‘আউনের ষড়যন্ত্র কেবল ব্যর্থই হয়েছিল *(সূরা মু‘মিন ৪০: ৩৬,৩৭)*।

{فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحاً لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ} [القصص: 38]

অতএব হে হামান, আমার জন্য তুমি ইট পোড়াও, তারপর আমার জন্য একটি প্রাসাদ তৈরী কর। যাতে আমি মূসার ইলাহকে দেখতে পাই। আর নিশ্চয় আমি মনে করি সে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত *(সূরা ক্বাছাছ ২৮:৩৮)*।

এটাই হলো অস্তিত্বহীনতার কথা যেটাকে স্বভাব ও বিবেক-বুদ্ধি মিথ্যা বলে প্রমাণ করে। কেননা স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টির অস্তিত্ব সম্ভব নয়। কর্তা ছাড়া কর্ম কখনোই সংঘটিত হয় না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ} [الطور: 35،36]

তারা কি স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টি হয়েছে, না তারাই স্রষ্টা? তারা কি আসমান ও যমিন সৃষ্টি করেছে? বরং তারা দৃঢ় বিশ্বাস করে না *(সূরা তুর ৫২:৩৫,৩৬)*।

কোন কিছু সৃষ্টি করার ব্যাপারে জাহিলদের কোন জবাব নেই। তারা কোন কিছুকে সৃষ্টি করতে পারে না এবং নিজেকেও নয়। স্রষ্টা ব্যতীত তারা অস্তিত্বহীন। কাজেই একজন স্রষ্টা থাকা আবশ্যক। এখানে যখন স্রষ্টার অস্তিত্ব বিদ্যমান, তাহলে কি তারাই এই স্রষ্টা? তারা কি নিজেদেরকে সৃষ্টি করতে পেরেছে? তাদের মূর্তিগুলো কি আসমান ও জমিনের কোন কিছু সৃষ্টি করতে পেরেছে? কখনোই পারেনি। স্বভাব ও বিবেক-বুদ্ধি এ কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।

৪১. আল্লাহকে অপূর্ণাঙ্গ ও ত্রুটিপূর্ণ গুণে গুণান্বিত করা

আল্লাহ তা'আলার প্রতি অপূর্ণাঙ্গতার সম্বন্ধ করা। যেমন, সন্তান গ্রহণ, প্রয়োজন অনুভব ও উপভোগ করা। অথচ এসব গুণাবলীর কতিপয় হতে পাদ্রীকেও পবিত্র মনে করা হয়।

....

ব্যাখ্যা: পূর্ণাঙ্গতার বিপরীত হলো অপূর্ণাঙ্গতা। আল্লাহ তা'আলার প্রতি অপূর্ণাঙ্গতার সম্বন্ধ করা বলতে তার প্রভূত্বের উপর যুলুম করা। যেমন, তার প্রতি সন্তানের সম্বোধন করা। কেননা, পিতার সন্তান প্রয়োজন হয়। আর সন্তান পিতার সাদৃশ্য হয়। ইয়াহুদীরা বলে, উযাইর আল্লাহর পুত্র। আর খ্রিষ্টানরা বলে, ঈসা মাসিহ আল্লাহর পুত্র। অপরদিকে, আরবের মুশরিকরা বলে, ফেরেস্তামন্ডলী আল্লাহর কন্যা। অথচ খ্রিষ্টানরা তাদের পাদ্রীদেরকে স্ত্রী-সন্তানাদী থেকে পবিত্র মনে করে। তাদের দাবী অনুযায়ী এটা অপূর্ণাঙ্গতা হিসাবে গণ্য। এ সত্ত্বেও তারা আল্লাহ তা'আলাকে পবিত্র মনে করে না, অথচ তাদের পন্ডিতদেরকে তারা পবিত্র বলে ঘোষণা দেয়, এটা কেমন!

অনুরূপভাবে আরব জাতি কন্যা সন্তানকে অপছন্দ করতো অথচ আল্লাহ তা'আলার দিকে কন্যা সন্তানকে তারা সম্পৃক্ত করতো। তারা নিজে যা অপছন্দ করতো তা আল্লাহর দিকে আরোপ করে সেটাকেই দোষ-ত্রুটি ও অপূর্ণাঙ্গতা বলে আখ্যা দিতো।

{وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ} [النحل:57]

আর তারা আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান নির্দিষ্ট করে। তিনি পবিত্র এবং নিজেদের জন্য তা (নির্দিষ্ট করে) যা তারা পছন্দ করে *(সূরা আন নাহাল ১৬: ৫৭)*।

এ সম্পর্কিত একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায়, একজন মুসলিম আলেম রোমের (পারস্যের) এক রাজার উদ্দেশ্যে বার্তা নিয়ে রওনা হলেন।

অতঃপর তার নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, রাজা মহোদয়! আপনার স্ত্রী-সন্তানাদী কেমন আছে? এ কথা শুনে সেখানে উপস্থিত সকলেই এ মর্মে রাগান্বিত হলো যে, এ আলেম কিভাবে তাদের রাজাকে স্ত্রী-সন্তানাদী দ্বারা গুণান্বিত করছে? অতঃপর আলেম তাদেরকে বললেন, আপনাদের রাজাকে আপনারা স্ত্রী-সন্তানাদী থেকে কলুষ মুক্ত মনে করেন, অথচ আল্লাহ তা'আলার দিকে তাদেরকে সম্পৃক্ত করেন?! আল্লাহ তা'আলাকে আপনারা পবিত্র মনে করেন না। আলেম এ ব্যাপারে তাদেরকে বুঝালেন, তর্ক-বিতর্ক করলেন ও অত্যাধিক লজ্জা দিলেন।

৪২. মালিকানায় শিরক

মালিকানায় শিরক বিদ্যমান; যেমন অগ্নিপূজকদের কথা-কর্ম।

....

ব্যাখ্যা: জাহিলী সমস্যা হচ্ছে মালিকানায় শিরক করা। যেমন অগ্নিপূজকদের কথা। আর অগ্নিপূজক হলো পারস্যের একটি দল যারা অগ্নিপূজা করে এবং বলে, এ জগতের দু'জন স্রষ্টা আছে, তা হলো আলো ও অন্ধকার। তাদের ধারণা, আলো কল্যাণ সৃষ্টি করে আর অন্ধকার সৃষ্টি করে অকল্যাণ। এ জন্য তাদেরকে ছানাবিয়্যাহ নামে ডাকা হয়। এটা রুবুবিয়্যায় (প্রভুত্বে) শিরক। তাদের রীতি: মুহরিমদের বিবাহ করা বৈধ, ধন-সম্পদ ও স্ত্রীদের মালিকানায় অংশিদার হওয়া বৈধ।

তারা কারো জন্য নির্দিষ্ট মালিকানা মেনে নেয় না। তাই স্ত্রী ও ধন-সম্পদে তারা অন্যদেরকে অংশিদার করতো। এর উপর ভিত্তি করেই বর্তমানে সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে। এটা দীন ও স্বভাবকে বিনষ্ট করার বাতিলপন্থা। সুতরাং একজনই জগতের স্রষ্টা, তিনি একক, তিনি অমুখাপেক্ষী, তিনি কাউকে জন্ম দেননি, তাকে জন্ম দেয়া হয়নি এবং তার সমকক্ষ কোন কিছু নেই। তিনি একক মালিকানাকে বৈধ করেছেন এবং মুহরিমকে বিবাহ করা হারাম করেছেন।

৪৩. আল্লাহ তা‘আলার তাক্বদীরকে অস্বীকার করা

....

ব্যাখ্যা: সকল বিষয়-বস্তু সম্পর্কে আল্লাহর জ্ঞানই হলো ক্ষমতা। কোন বিষয় বা বস্তুর অস্তিত্ব লাভের পূর্বে আল্লাহ তা‘আলা তার ভাগ্যলিপি নির্ধারণ করেন। আর লাওহে মাহফুযে তা লেখা থাকে। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা তা সৃষ্টি করেন। ঈমানের ছয়টি রুকুনের একটি হলো ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাস রাখা। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره"

আল্লাহ, ফেরেস্তামন্ডলী, কিতাবসমূহ, রসূলগণ, আখেরাত এবং ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস রাখা হচ্ছে ঈমান।[৪১] আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} [القمر:49]

নিশ্চয় আমি সব কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাণ অনুযায়ী *(সূরা ক্বামার ৫৪:৪৯)*।

ভাগ্য নির্ধারণ আল্লাহ তা‘আলার কর্মসমূহের একটি। মহান আল্লাহ যা নির্ধারণ করেন ও যা চান তার রাজত্বে কেবল তাই ঘটে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই জানেন, যা ঘটেছে ও ঘটবে। তিনি তার চিরন্তন জ্ঞানের মাধ্যমে সর্বদা গুণান্বিত। যা কিছু ঘটবে এ ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা তা লাওহে মাহফুযে লিখে রাখেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا} [الحديد: 22]

---

৪১. ছ্বহীহ বুখারী ৫০, ছ্বহীহ মুসলিম ১০।

যমীনে এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যে এমন কোন মুসীবত আপতিত হয় না, যা আমি সংঘটিত করার পূর্বে কিতাবে লিপিবদ্ধ রাখি না। *(সূরা হাদীদ ৫৭:২২)*। অর্থাৎ আমি তা সৃষ্টি করি।

{إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ} [الحديد: 22]

নিশ্চয় এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ *(সূরা হাদীদ ৫৭:২২)*।

নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطأك لم يكن ليصيبك"

তুমি জেনে রাখো তোমার ব্যাপারে যা কিছু ঘটে তা তোমার ভুল কিংবা সঠিকতার কারণে নয়।[৪২] তিনি আরোও বলেন,

"رفعت الأقلام وجفت الصحف"

কলম তুলে নেওয়া হয়েছে এবং ছহীফা লিপিবদ্ধ বন্ধ হয়েছে।[৪৩]

তাই আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই ঘটে না। আল্লাহ তা'আলা যা কিছু সৃষ্টি করেন কেবল তাই ঘটে। তার বাণী:

{اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} [الزمر: 62]

আল্লাহ সব কিছুর স্রষ্টা *(সূরা যুমার ৩৯:৬২)*।

তিনি ভাল-মন্দ উভয়ই সৃষ্টি করেন এবং তার ভাগ্য নির্ধারণ করেন। ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান আনয়ন নাম করা হয়, এর কতিপয় পর্যায় রয়েছে।

প্রথম: আল্লাহ তা'আলা সবকিছু জানেন এ ব্যাপারে বিশ্বাস রাখা ।

দ্বিতীয়: আল্লাহ তা'আলা সবকিছু লাওহে মাহফুযে লিখে রেখেছেন ।

---

৪২. আবূ দাউদ, হা/৪৬৯৯-৪৭০০, ইবনে মাজাহ, হা/৭৭।

৪৩. ছহীহ: মুসনাদে আহমাদ, হা/২৬৬৯, ছহীহ জামে, হা/৭৯৫৭।

তৃতীয়ঃ আল্লাহ তা'আলা যা কিছু ইচ্ছা করেন তা এ জগতে ঘটে। তার ইচ্ছা ব্যতীরেকে কোন কিছুই ঘটে না

চতুর্থঃ আল্লাহ তা'আলা সব কিছুর স্রষ্টা এবং কর্মবিধায়ক।

এটাকেই বলা হয়, ভাগ্যের প্রতি ঈমান। জাহিলরা ভাগ্য বিশ্বাস করতো না।

জাহিলদের ভাগ্য অস্বীকার করার ব্যাপারে কুরআনের তিনটি আয়াত রয়েছে।

প্রথমত সূরা আন'আমে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ} [الأنعام: 148] ،

অচিরেই মুশরিকরা বলবে, আল্লাহ যদি চাইতেন, আমরা শিরক করতাম না এবং আমাদের পিতৃ-পুরুষরাও না এবং আমরা কোন কিছু হারাম করতাম না *(সূরা আন'আম ৬:১৪৮)*। তিনি সূরা নাহলে বলেন,

{وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ} [النحل: 35] ،

আর যারা শির্ক করেছে, তারা বলল, যদি আল্লাহ চাইতেন তবে আমরা তাকে ছাড়া কোন কিছুর ইবাদত করতাম না এবং আমাদের পিতৃ-পুরুষরাও না *(সূরা নাহাল ১৬:৩৫)*। তিনি সূরা যুখরুফে আরোও বলেন,

{وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ} [الزخرف:20] .

তারা আরো বলে, পরম করুণাময় আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমরা এদের ইবাদত করতাম না, এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই *(সূরা যুখরূফ ৪৩:২০)*।

দু'টি কথার উপর ভিত্তি করে আলিমগণ এ আয়াত তিনটির তাফসির করেছেন।

প্রথমত: জাহিলদের এ কথার উদ্দেশ্য হলো ভাগ্য অস্বীকার করা। তারা বলতো, আল্লাহ তা'আলার যদি ইচ্ছাই থাকতো, তাহলে আমরা এসব কর্ম ছেড়ে দিতাম। তাদের উদ্দেশ্যেই হলো ভাগ্যকে অস্বীকার করা। আর যারা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ব্যতিরেকে এসব কর্ম করে তারা ভাগ্যকে অস্বীকার করে। তারা নিজেদেরকে এ কর্মসমূহের দিকে সম্পৃক্ত করে এবং নিজেদেরকে স্বাধীন মনে করে। এটা সম্পূর্ণরূপে মু'তাযিলা মতের দৃষ্টান্ত। কেননা তারা বলে: কুফরী, ঈমান, ভাল ও মন্দের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার কোন ইচ্ছা নেই, এসব বান্দারই কর্ম। সুতরাং মু'তাযিলারা জাহিলদের মতই কথা বলে।

দ্বিতীয়ত: তাদের কথা ("لو شاء الله ما أشركنا") অর্থ আল্লাহ তা'আলা চাইলে আমরা শিরক করতাম না। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আমাদের এসব কর্মের ব্যাপারে সন্তুষ্ট আছেন। তিনি যদি সন্তুষ্ট না হতেন তাহলে এসব শিরকী আমল করার জন্য তিনি আমাদেরকে ছেড়ে দিতেন না। এভাবে তারা ভাগ্যে বিশ্বাস করে। তাদের কুফরীকে সঠিক বলে প্রমাণ করার জন্য তারা ভাগ্যে বিশ্বাস প্রয়োজন মনে করে।

তাদের ভাগ্যে বিশ্বাস এমন পর্যায় পৌঁছেছে; যার কারণে তারা বলে, এ শিরকী কর্ম আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য সমতুল্য। কেননা, তিনি চান যে, আমরা তার ইচ্ছার আনুগত্য করি ও ভাগ্যকে মেনে নেই।

দ্বিতীয় কথায় তাদের মন্দ কর্মের উপর তারা ভাগ্যকে প্রমাণ স্বরূপ পেশ করে। আর জাবরিয়্যাদের কথা হলো তাদের মধ্যে থেকে আল্লাহ তা'আলা এ মন্দ কর্ম চান। আর তাদের মন্দ কর্মকে ভাল সাব্যস্ত করার উপর ভাগ্যকে তারা দলীল হিসাবে পেশ করে বলে, বান্দা তার কর্মের জন্য বাধ্য। এ ব্যাপারে তারাও জাহিলদের উত্তরসূরী। (তাদের কথা) ভাগ্যকে অস্বীকার অথবা বিশ্বাস করা দু'টি অর্থের কোন একটির উপর আয়াতটি প্রমাণ করে। এর মাধ্যমে তারা আল্লাহ তা'আলার কথাকে দলীল হিসাবে পেশ করে। মহান আল্লাহ তাদের কথাকে প্রত্যাখান করে বলেন,

{قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا} [الأنعام: 148] ،

বল, তোমাদের কাছে কি কোন জ্ঞান আছে, যা তোমরা আমাদের জন্য প্রকাশ করবে ? *(সূরা আন'আম ৬:১৪৮)*।

আল্লাহ তা'আলা কুফরীর ইচ্ছা করেননি এ কথার প্রমাণ কি?

দ্বিতীয় ব্যাখ্যার কথা: আল্লাহ তা'আলা জাহিলদের এসব মন্দ কর্ম, কুফরী, শিরক ও অশ্লীলতার ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়েছেন এ কথার দলীল কি? কোথাও কি দলীল আছে? আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ} [الأنعام: 148، 149] ،

তোমাদের কাছে কি কোন জ্ঞান আছে, যা তোমরা আমাদের জন্য প্রকাশ করবে ? তোমরা তো শুধু ধারণার অনুসরণ করছ এবং তোমরা তো কেবল অনুমান করছ। বল, 'চূড়ান্ত প্রমাণ আল্লাহরই। সুতরাং যদি তিনি চান অবশ্যই তোমাদের সবাইকে হিদায়াত দেবেন *(সূরা আন'আম ৬:১৪৮,১৪৯)*।

আল্লাহ তা'আলা যাকে চান হেদায়াত দান করেন এবং যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার হেকমত রয়েছে, তিনি জানেন কে হেদায়াত লাভের উপযুক্ত আর কে উপযুক্ত নয়। অধিক উপযুক্ত ব্যক্তিকেই তিনি হেদায়াত দান করেন। আর জাহিলদের কথাকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন এভাবে যে, তিনি যদি তাদের মন্দ কর্মের প্রতি সন্তুষ্টই হতেন, তাহলে শিরক অস্বীকার করা ও তাওহীদ মেনে নেয়ার নির্দেশ দিয়ে তিনি রসূলগণকে পাঠাতেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} [النحل: 36]

،

আর আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতিতে একজন রসূল প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং পরিহার কর তাগুতকে *(সূরা নাহাল ১৬:৩৬)*।

ত্বাগুতের ইবাদত, শিরক ও কুফরী যা তারা ধারণা অনুযায়ী করে যদি তিনি এসবের প্রতি সন্তুষ্ট হতেন তাহলে তা নিষেধ করার জন্য তিনি রসূলগণকে পাঠাতেন না। তাই এটাই প্রমাণ করে যে, তিনি যদি কুফরী, শিরক, অবাধ্যতা ও মতানৈক্য পছন্দ করতেন তাহলে রসূলগণকে পাঠাতেন না। বরং এসবের প্রতি আল্লাহ তা'আলা শত্রুতা পোষণ করেন এবং তা প্রত্যাখ্যান করেন। সূরা যুখরূফে আল্লাহ তা'আলা জাহিলদেরকে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন,

{مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ} [الزخرف: 20]

তারা আরো বলে, পরম করুনাময় আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমরা এদের ইবাদাত করতাম না, এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই। তারা শুধু মনগড়া কথা বলছে *(সূরা যুখরুফ ৪৩:২০)*।

{هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا} [الأنعام: 148] ،

বল, তোমাদের কাছে কি কোন জ্ঞান আছে, যা তোমরা আমাদের জন্য প্রকাশ করবে ? *(সূরা আন'আম ৬:১৪৮)*।

তারা যা জানে না সে ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার প্রতি তারা মিথ্যা আরোপ করে। এসব ব্যাপারে শরী'আত, কিতাব ও সুন্নাহর দলীল ছাড়া কথা বলা ঠিক নয়। এ বিষয়ে বিবেক-বুদ্ধি, চিন্তা-ভাবনা ও রায়ের (সিদ্ধান্তের) উপর নির্ভর করাও যাবে না।

৪৪. আল্লাহ তা'আলা ভাগ্যে কুফরী নির্ধারণ করেছেন বলে অজুহাত পেশ করা

কুফরীর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার কথার দলীল পেশ করা।

....

ব্যাখ্যা: অর্থাৎ ভাগ্যের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার কথার উপর এভাবে প্রমাণ পেশ করা যে, কুফরী ও অবাধ্যতায় জাহিলরা ওযর গ্রস্থ; আল্লাহ তা'আলাই তাদের জন্য এসবের ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য কোন দলীল পেশ করেননি। বরং তাদেরকে তিনি স্বাধীনতা, শক্তিমত্তা ও ইচ্ছাশক্তি দান করেছেন। আর তাদের জন্য বর্ণনা করেছেন ভাল-মন্দ উভয় পন্থা। আর তাদেরকে তিনি দান করেছেন ক্ষমতা, এর মাধ্যমে তারা কিছু করা বা না করার সক্ষমতা রাখে। তারা যা বলে তাতে তারা বাধ্য নয়। আল্লাহ তা'আলা এটাও বর্ণনা করেন, তিনি তার বান্দার কুফরীকে পছন্দ করেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ} [الزمر: 7]

আর তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য কুফরী পছন্দ করেন না *(সূরা যুমার ৩৯:৭)*।

তিনি যদি কুফরীকে নির্ধারণই করতেন এবং তা চাইতেন তাহলে তার সন্তুষ্টি অর্জন আবশ্যক হত না। আল্লাহ তা'আলা কুফরীর প্রতি শত্রুতা রেখে এর পরিণাম নির্ধারণ করেন। যাতে তিনি কতিপয় মানুষ থেকে কতিপয়কে যাচাই করতে পারেন, মিথ্যাবাদী হতে সত্যবাদী এবং কাফির হতে মুমিন বাছাই করতে পারেন। আর খাঁটি মুমিন হতে মুনাফিককে স্পষ্ট করতে পারেন। আল্লাহ তা'আলা হিকমতের জন্য এসব অপছন্দনীয় বিষয়ের নিয়তি নির্ধারণ করেন। তিনি অনর্থক এসব পরিণাম নির্ধারণ করেননি। স্বাধীনভাবে এসব কৃত কর্মের উপর জাহিলদের জন্য তিনি মন্দ প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন।

এ কারণে পাগল, নির্বোধ, নিরুপায় ও অচেতন ব্যক্তিকে পাঁকড়াও করা হবে না। কেননা তাদের কোন স্বাধীনতা নেই এবং বিবেক-বুদ্ধিও নেই।

তাদের মাধ্যমে কুফরী সংঘটিত হলে তাদেরকে পাঁকড়াও করা হবে না। তাই আল্লাহ তা'আলা যাকে বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি দান করেছেন এবং কুফরী করতে বাধ্য করা হয়নি, তাকে জবাবদিহী করা হবে। কেননা স্বাধীনভাবে সে মন্দ গ্রহণে অগ্রগামী। সুতরাং ব্যভিচারী তার ইচ্ছায় ব্যভিচার করে, ছ্বলাত পরিত্যাগকারী তার ইচ্ছায় ছ্বলাত পরিত্যাগ করে অথচ তার সক্ষমতা আছে যে, সে ছ্বলাত প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

এরূপই ব্যভিচারীর জন্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, ব্যভিচার হারাম। এর জন্য শাস্তি ও লাঞ্ছনা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ব্যভিচারের সুনির্দিষ্ট শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। আর শিরক ও কুফরী হতে নিষেধ করার জন্য তিনি রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। সুতরাং অবাধ্যতা, কুফরী, শিরক ও ভ্রষ্টতার মাধ্যমে জাহিলরা কিভাবে আল্লাহ তা'আলার উপর দলীল পেশ করে? অথচ তাদের নিকট কোন দলীলই নেই। বরং তাদের বিরূদ্ধে আল্লাহ তা'আলারই দলীল রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

{قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ} [الأنعام: 149] .

সুতরাং যদি তিনি চান অবশ্যই তোমাদের সবাইকে হিদায়াত দেবেন *(সূরা আন'আম ৬:১৪৮,১৪৯)*।

কেবল বালা-মুছীবত, বিপদাপদে তাক্বদীরকে দলীল হিসাবে পেশ করা যাবে। কেউ বিপদগ্রস্থ হলে যেন ধৈর্য না হারায়। বরং মেনে নিবে, বিপদাপদ আল্লাহরই ক্ষমতা, তিনি যা চান তাই করেন। তাই বিপদে ধৈর্য ধারণ ও ছাওয়াবের প্রত্যাশা করবে। আর অবাধ্যতার ক্ষেত্রে ভাগ্যের কৈফিয়ত পেশ করা যাবে না। বরং আল্লাহ তা'আলার নিকট তাওবাহ করা, পাপাচারীতা ও মন্দকর্ম হতে বিরত থাকাই বান্দার উপর আবশ্যক। আর অন্যায় কাজের উপর ভাগ্যের মাধ্যমে দলীল পেশ করাই জাহিলী কর্ম।

৪৫. আল্লাহ তা‘আলার শরী‘আত ও তাক্বদীরের মাঝে বৈপরীত্যের অভিযোগ করা

ভাগ্যের মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলার শরী‘আতের বিরোধিতা করা।

....

ব্যাখ্যা: এ বিষয়টিও ভাগ্য সম্পর্কিত। কেননা ভাগ্যের মাধ্যমে যারা আল্লাহর শরী‘আতের বিরোধিতা করে বলে, আল্লাহ তা‘আলা কুফরী ও ঈমানকে কিভাবে নির্ধারণ করতে পারেন? অতঃপর আল্লাহর আদেশাবলী পালন ও নিষেধসমূহ বর্জনকে বান্দার জন্য তিনি বিধিবদ্ধ করে দেন অথচ সকল বিষয় ফায়ছালা ও নির্ধারণ হওয়ার পর আদেশ-নিষেধ পালন করায় কোন উপকার থাকে না। মানুষ কি এরূপ ভাগ্যের উপর নির্ভর করবে? এটি জাহিলদের একটি মারাত্মক সমস্যা। যারা ধারণা করে, শরী‘আত ও ভাগ্যের মাঝে বৈপরীত্য আছে তাদের প্রত্যেকেই কিয়ামত পর্যন্ত এ বিতর্কের পদ্ধতিই অনুসরণ করবে। এটিই হলো বাতিল পদ্ধতি। শরী‘আত ও ভাগ্যের মাঝে কখনোই বৈপরীত্য নেই। আল্লাহ তা‘আলা শিরক, পাপ এবং কুফরী নির্ধারণ করেছেন এবং তা নিষেধও করেছেন। আর ঈমান, প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং সংশোধন হওয়াকে তিনি বিধিবদ্ধ করেছেন। শরী‘আত ও ভাগ্যের মাঝে কোন বিরোধ নেই। কেননা বান্দা স্বাধীনভাবে তার উদ্দেশ্য ও ইচ্ছা অনুযায়ী এসব কর্ম করে। তাই কর্ম বান্দার দিকেই সম্পৃক্ত হবে। আর একারণেই বান্দার পাপের কারণে তাকে শাস্তি দেয়া হবে এবং আনুগত্যের কারণে ছাওয়াব দেয়া হবে। যদিও ভাগ্য আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়, তবুও বান্দার কর্মের উপর তাকে প্রতিদান দেয়া হয়, ভাগ্যের উপর নয়। কেননা, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাহাবীদের উদ্দেশে বর্ণনা করে বলেন,

ما منكم من أحد إلا ومقعده معلوم من الجنة أو النار" قالوا: يا رسول الله، ألا نتكل على كتابنا ونترك العمل؟ قال صلى الله عليه وسلم: "اعملوا، فكل ميسر لما خلق له

তোমাদের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি নেই যার স্থান জান্নাত বা জাহান্নামে নির্ধারিত হয়নি। একথা শুনে সকলেই বললেন, হে আল্লাহর রসূল! তাহলে কি আমরা ভাগ্যের উপর নির্ভর করে বসে থাকবো? উত্তরে তিনি বললেন, তোমরা আমল করতে থাক। কারণ যাকে যে আমলের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সে আমল সহজ করে দেয়া হয়েছে।[৪৪] আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন,

{فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى} [الليل: 5–10]

সুতরাং যে দান করেছে এবং তাকওয়াহ অবলম্বন করেছে এবং উত্তম কে সত্য বলে বিশ্বাস স্থাপন করেছে আমি তার জন্যে সুগম করে দিব সহজ পথ। আর যে কার্পন্য করেছে এবং নিজেকে স্বয়ং সম্পূর্ণ মনে করে, এবং উত্তম কে মিথ্যা বলে মনে করেছে, আমি তার জন্যে সুগম করে দিব কঠিন পথ *(সূরা লাইল ৯২:৫-১০)*।

নেক বান্দা ভাল আমল করে এবং মন্দ পরিহার করে। আর ভাগ্য আল্লাহ তা'আলার একটি গোপনীয় বিষয়। এ বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক না করাই ভাল। কারণ তাতে লাভ হবে না এবং এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছা যাবে না।

ভাগ্য সংক্রান্ত বিষয়ের সার-সংক্ষেপঃ উদাহরণস্বরূপ, ভাগ্য বিষয়ে মানুষ চার ভাগে বিভক্তঃ

প্রথমঃ জাবরিয়্যাগণ (الجبرية) ভাগ্যকে মেনে নেয় ও শরী'আতকে অস্বীকার করে।

দ্বিতীয়ঃ কাদরিয়্যাগণ (القدرية) শরী'আত মেনে নেয় এবং ভাগ্যকে অস্বীকার করে।

তৃতীয়ঃ মুশরিকরা (المشركون) শরী'আত ও ভাগ্যকে সাব্যস্ত করে এবং তারা মনে করে যে উভয়ের মাঝে বৈপরীত্য আছে।

---

৪৪. ছহীহ বুখারী, হা/ ৪৯৪৫, ৪৯৪৭, ছহীহ মুসলিম, হা/২৬৪৭।

চতুর্থ: আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের (أهل السنة والجماعة) অনুসারীরা শরী‘আত ও ভাগ্য উভয়টি স্বীকার করে এবং তারা উভয়টির মাঝে বৈপরীত্য অস্বীকার করে।

৪৬. ঘটমান দুর্ঘটনাকে সময় ও যুগের দিকে সম্বন্ধিত করা এবং তাকে গালি দেওয়া

যুগকে গালি দেয়া সম্পর্কে জাহিলদের কথা,

{وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ} [الجاثية: 24] .

আর কালই কেবল আমাদেরকে ধ্বংস করে *(সূরা জাছিয়া ৪৫:২৪)*।

....

ব্যাখ্যা: নাস্তিকরা (الدهرية) ঘটমান অবস্থাকে যুগের সাথে সম্পৃক্ত করে। জাহিলদের নিকট কোন বিষয় অপছন্দ হলে তারা সেটাকে যুগের দিকে সম্পৃক্ত করে। আর পছন্দ না হওয়ার কারণে যুগকে তিরস্কার করে, অথচ সকল বিষয়-বস্তু মহান স্রষ্টার দিকেই সম্পৃক্ত করা আবশ্যক। আর যুগ হলো সময়, যা মহান আল্লাহর সৃষ্টি সমূহের অন্তর্ভুক্ত। আর যুগের কোন পরিবর্তন নেই। চলমান অবস্থাকে যারা যুগের সাথে সম্পৃক্ত করে আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেন,

{وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ} [الجاثية: 24

আর তারা বলে, ‘দুনিয়ার জীবনই আমাদের একমাত্র জীবন। আমরা মরি ও বাঁচি এখানেই। আর কালই কেবল আমাদেরকে ধ্বংস করে *(সূরা জাছিয়া ৪৫:২৪)*।

আর গালির মাধ্যমে আখেরাত ও পুনরুত্থানকে অস্বীকার হয়। {نَمُوتُ وَنَحْيَا} আমরা মরবো ও জীবিত হবো। অর্থাৎ মানুষ মরে ও জীবিত থাকে। আর জাহিলরা বলে, দয়াকে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে আর জমিনকে গ্রাস করা হয়েছে। আর তারা বলে, এটাই জীবনের স্বভাব। {وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ} যুগই আমাদের ধ্বংস করে দিল। জাহিলরা ধ্বংস হওয়াকে যুগের সাথে সম্পৃক্ত করে তাই দিন-রাত্রির অতিক্রম তাদের নিকট মৃত্যুর কারণ বলে গণ্য হয়। এখানে কোন নির্দিষ্ট কাল এবং নির্দিষ্ট ফেরেস্তাও নেই যে, যুগের সময় শেষ হলে প্রাণ হরণ করবে। নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুগকে গালি দিতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন,

"لا تسبوا الدهر، فإن الله هو الدهر"

তোমরা যুগকে গালি দিও না। কেননা আল্লাহ তা‘আলাই যুগ।[৪৫]

অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলাই যুগের স্রষ্টা। আর যুগের মাঝে যা কিছু বিরাজমান তা আল্লাহ তা‘আলা কর্তৃক নির্ধারিত। হাদীছে কুদছিতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

"يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر، وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار"

আদম সন্তান আমাকে কষ্ট দেয়। তারা যুগকে গালি দেয়; অথচ আমিই যুগ। আমার হাতেই সকল ক্ষমতা; রাত ও দিন আমিই পরিবর্তন করি।[৪৬]

আর যুগকে গালি দেয়া হলে মূলতঃ যুগের স্রষ্টা মহান আল্লাহকেই গালি দেয়া হয়। এভাবেই আদম সন্তান পবিত্র মহান রবকে কষ্ট দেয়। কেননা, যুগের তিরস্কার আল্লাহর উপর আরোপিত হয়। কারণ আল্লাহ তা‘আলাই সকল বিষয়ের পরিবর্তনকারী আর সময়, বিপদাপদ এবং সবকিছু নির্ধারণকারী। যুগ মহান আল্লাহ তা‘আলারই সৃষ্টি। গালি ও তিরস্কার থেকে বিরত থাকা মুসলিমদের উপর আবশ্যক। মুসলিমরা কোন বিপদের

---

৪৫. ইমাম বুখারী কিতাবুল আদাবে ছহীহ সূত্রে باب "لا تسبوا الدهر" নামক পরিচ্ছেদ বর্ণনা করেছেন। ছহীহ মুসলিম হা/২২৪৬।

৪৬ . ছহীহ বুখারী হা/ ৪৮২৬, ৬১৮১,৭৪৯১ ছহীহ মুসলিম হা/ ২২৪৬।

সম্মুখ হলে তারা নিজেদের ব্যাপারে ভেবে দেখবে আর তাদের পাপকে তারা স্বীকার করে নেবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ} [الشورى: 30]

আর তোমাদের প্রতি যে মুসীবত আপতিত হয়, তা তোমাদের কৃত কর্মেরই ফল। আর তোমাদের অনেক কিছুই তিনি ক্ষমা করে দেন *(সূরা শুরা ৪২:৩০)*।

মানুষের উচিত নিজেদেরকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করা, যুগকে নয়।

৪৭. আল্লাহ তা'আলার নি'আমত অস্বীকার করা

আল্লাহ তা'আলার নি'আমতকে অন্যের দিকে সম্বন্ধ করা। যেমন আল্লাহর বাণী:

{يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا} [النحل: 83]

তারা আল্লাহর নি'আমত চিনে, তারপরও তারা তা অস্বীকার করে *(সূরা নাহাল ১৬:৮৩)*।

....

ব্যাখ্যা: আল্লাহ ছাড়া কারো দিকে আল্লাহ তা'আলার নেআ'মতকে সম্বন্ধ করা শিরক ও কুফরী এবং এটা জাহিলী কর্মের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা জাহিলদের সম্পর্কে বলেন,

{يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ} [النحل:83]

তারা আল্লাহর নি'আমত চিনে, তারপরও তারা তা অস্বীকার করে, আর তাদের অধিকাংশই কাফির *(সূরা নাহাল ১৬:৮৩)*।

বলা হয়, আয়াতের অর্থ হলো জাহিলরা রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তিনি যে বার্তাবাহক তা জানে। অতঃপর অবাধ্যতা ও অহংকার বশতঃ তারা রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অস্বীকার করে। অথচ তারা জানে এবং স্বীকার করে তিনি আল্লাহর রসূল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ} [الأنعام:33]

আমি অবশ্যই জানি যে, তারা যা বলে তা তোমাকে দুঃখ দেয়। কিন্তু তারা তো তোমাকে অস্কারকরে না, বরং যালিমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে *(সূরা আন'আম ৬:৩৩)*।

রসূল প্রেরণ আল্লাহ তা'আলার নি'আমত তারা তা জানে। তাই মানব জাতির বৃহৎ নি'আমত হলো রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। অতঃপর তারা রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অস্বীকার করে এবং তার বিরোধিতায় লিপ্ত হয়। আয়াতের তাফসিরে এ কথাটিই উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় কথা: জাহিলরা তাদের উপর আল্লাহ তা'আলার নি'আমতকে অস্বীকার করে, যা আল্লাহ তা'আলা সূরা নাহলে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তারা নি'আমতকে অস্বীকার করে অর্থাৎ গাইরুল্লাহর দিকে নি'আমতকে সম্পৃক্ত করে। যোগ্যতা, শক্তি, প্রচেষ্টা ও কর্মের মাধ্যমে নি'আমত অর্জিত হয় বলে তারা মনে করে। যেমন ক্বারূন বলেছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي} [القصص: 78]

সে বলল, আমি তো এ ধনভান্ডার প্রাপ্ত হয়েছি আমার কাছে থাকা জ্ঞান দ্বারা *(সূরা ক্বাছাছ ২৮:৭৮)*।

অর্থাৎ যোগ্যতা, দক্ষতা ও কর্মের মাধ্যমে আমি তা লাভ করেছি। সুতরাং সে আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত নি'আমতকে অস্বীকার করে। আর কারূন

ছাড়াও অনেকে এরূপ (অস্বীকার করে)। তাই আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেন যে, মানুষকে যখন তিনি নি'আমত দান করেন তখন সে বলে, এটা আমার। অর্থাৎ আমি এ নি'আমতের উপযুক্ত এবং এর অধিকার রাখি। এটা আল্লাহ তা'আলার জন্য নয়। যে কল্যাণ সে অর্জন করে তা নিজের দিকে সম্পৃক্ত করে। আর স্বীকার করে না, এ কল্যাণ আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমতের কারণে অর্জন হয়েছে।

৪৮. আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহ অস্বীকার করা

আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করা।

....

ব্যাখ্যা: জাহিলী সমস্যা হচ্ছে তাওরাত, ইনজিল, যাবুর ও কুরআনে আল্লাহ তা'আলা তার রসূলগণের উপর যে আয়াত নাযিল করেছেন তা এবং অন্যান্য আসমানী কিতাব অস্বীকার করা। যারা এরূপ করবে, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ভীতি প্রদর্শন করে বলেন,

{إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ} [الأعراف: 40]

নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে এবং তার ব্যাপারে অহঙ্কার করেছে, তাদের জন্য আসমানের দরজাসমূহ খোলা হবে না *(সূরা আরাফ ৭:৪০)*।

، {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي} [العنكبوت: 23]

،

আর যারা আল্লাহর আয়াতসমূহ ও তাঁর সাক্ষাৎ অস্বীকার করে তারা আমার রহমত হতে হতাশ হয় *(সূরা আনকাবূত ২৯:২৩)*।

বিভিন্ন আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাফিররা আল্লাহ তা'আলার আয়াতকে অস্বীকার করে। আর বিকৃত বুদ্ধি ও মিথ্যা সন্দেহ-সংশয়ের কারণে তারা আল্লাহর আয়াতের বিরোধিতা করে।

রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে যে ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তা আল্লাহর নিদর্শন। কেননা তা আল্লাহর পক্ষ থেকে অহীয়ে গাইরে মাতলু। কিছু প্রবঞ্চিত মানুষ ও শিক্ষকের চিন্তা-চেতনা এবং বিবেক-বুদ্ধি অনুকূল না হলে তারা কতিপয় ছহীহ হাদীছকে মিথ্যা মনে করে। যেমনভাবে বিবেক সম্পন্নরা মিথ্যা মনে করে। এটা মূলতঃ আল্লাহ তা'আলার আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর আয়াতের প্রতি বিশ্বাস রাখা, সত্যায়ন এবং আমল করা মুমিনের উপর আবশ্যক। কেননা আল্লাহর আয়াতকে বাতিল আক্রমন করতে পারে না। আল্লাহর বাণী:

{لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ} [فصلت:42]

বাতিল এতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না, না সামনে থেকে, না পেছন থেকে, এটি প্রজ্ঞাময়, স্বপ্রশংসিতের পক্ষ থেকে অবতারিত *(সূরা হা-মিম সাজদা ৪১:৪২)*।

আর সন্দেহ- সংশয়ের কাছেও যেতে পারে না।

৪৯. আল্লাহর কতিপয় আয়াতকে অস্বীকার করা।

কতেক আয়াত অস্বীকার করা।

....

ব্যাখ্যা: আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার ব্যাপারে জাহিলদের মধ্যে বৈপরীত্য দেখা যায়। তাদের কতিপয় আল্লাহর সকল আয়াতকে মিথ্যা মনে করে এবং আল্লাহর কোন কিতাব বিশ্বাস করে না। যেমনভাবে মুশরিকরা নাবী-রসূলগণকে বিশ্বাস করে না। আর চুড়ান্ত কথা হলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কোন কিতাবই তারা বিশ্বাস করে না।

আর জাহিলদের কতিপয় কিছু আয়াতকে বিশ্বাস করে এবং কতেককে অস্বীকার করে। যেমন ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টান। যারা কতিপয় আয়াত বিশ্বাস করে এবং কতিপয়কে বিশ্বাস করে না, তারা মূলতঃ তাদের মতই যারা সকল আয়াতকেই অস্বীকার করে। মহান আল্লাহ বলেন,

{أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ} [البقرة: 85]

তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখ আর কিছু অংশ অস্বীকার কর? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা তা করে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ব্যতীত তাদের কী প্রতিদান হতে পারে? *(সূরা বাক্বারাহ ২:৮৫)*।

কেবল তাদের কুপ্রবৃত্তি অনুসারেই তারা বিশ্বাস করে। তাদের কু-প্রবৃত্তি বিরোধী যা মনে করে সেটাকেই তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। কিতাবের আংশিক অস্বীকার করার কারণে অবশিষ্ট আংশিক বিশ্বাস জাহিলদের কোন কাজে আসবে না। যদিও কুরআনের একটি আয়াত বা কথা হয়ে থাকে তা জাহিলদের কোন উপকারে আসবে না। জাহিলদের মধ্যে আশা'ইরা (أشاعرة) বলে, কুরআনের শব্দ ও অর্থ উভয়ই সৃষ্ট অথবা কুরআনের অর্থ ব্যতীত শুধু শব্দাবলী সৃষ্ট। এটা কুরআনের প্রতি মিথ্যারোপ করা বুঝায়।

আর জাহমিয়্যাহ (الجهمية) সম্প্রদায়ও বলে, কুরআনের শব্দ ও অর্থ উভয়ই সৃষ্ট অথবা শুধু শব্দ সৃষ্ট ও অর্থ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত, এটাও কুফরী।

শুধু শব্দ অথবা অর্থের অনুসরণ অথবা অপব্যাখ্যা করলে বিপথগামী হবে। কেননা শব্দ ও অর্থের সমন্বয়ে কুরআন আল্লাহর কালাম। কুরআনের অক্ষর ও সমুদয় অর্থ মিলেই মহান আল্লাহর বাণী হিসাবে গণ্য। অর্থ ছাড়া অক্ষর আল্লাহর কালাম নয়, তেমনই অক্ষর ছাড়া অর্থও আল্লাহর কালাম নয়।

৫০. রসূলগণের উপর কিতাব নাযিল হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করা

জাহিলদের কথা: আল্লাহ তা'আলার বাণী:

{مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ} [الأنعام: 91]

আল্লাহ কোন মানুষের উপর কিছুই নাযিল করেননি *(সূরা আন'আম ৬:৯১)*।

....

ব্যাখ্যা: ইয়াহুদীরা বলে, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ} [الأنعام: 91]

আল্লাহ কোন মানুষের উপর কিছুই নাযিল করেননি *(সূরা আন'আম ৬:৯১)*।

এর অর্থ হলো নাবী-রসূলগণের রিসালাত-বার্তা ও অহীকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা। মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি হিংসা করার কথা বলে জাহিলরা যে প্ররোচনা দেয়, সে ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন,

{قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُوراً وَهُدىً لِلنَّاسِ} [الأنعام: 91]

বল, কে নাযিল করেছে সে কিতাব, যা মূসা নিয়ে এসেছে মানবজাতির জন্য আলো ও পথনির্দেশস্বরূপ? *(সূরা আন'আম ৬:৯১)*।

এটা হলো ইয়াহুদীদের বিরোধিতা। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অভিশাপ দেন। মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হিংসা করতে তারা উদ্বুদ্ধ হয়। মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কুরআনের কারণে সকল রসূল, কিতাবসমূহকে তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট এ থেকে আশ্রয় চাই। ভেবে দেখা দরকার যে, হিংসুকরা কি করেছিল? জাহমিয়্যাদের কথা হলো কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়নি। আবার কেউ বলে, সুন্নাহ অহী নয় বরং তা রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা।

৫১. কুরআনকে মানুষের কথা মনে করা

কুরআন সম্পর্কে জাহিলদের কথা:

{إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ} [المدثر:25]

এটা তো মানুষের কথা মাত্র *(সূরা মুদ্দাস্সির ৭৪:২৫)*।

....

ব্যাখ্যা: জাহিলী সমস্যা: জাহিলরা বলে, কুরআন মানুষের কথা। যেমন ওয়ালিদ ইবনুল মুগিরাহ বলেছিল। অথচ কুরআন আল্লাহ তা'আলার কালাম। প্রকৃত অর্থে আল্লাহ তা'আলাই কুরআনে কথা বলেছেন অথবা জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এর মাধ্যমে তার নাবী মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর তিনি কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। তাই সত্যিকার অর্থেই কুরআন আল্লাহর কালাম। আর অনেক আয়াতে কুরআনকে তিনি 'আল্লাহর কালাম' নামে অভিহিত করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ} [التوبة: 6] ،

এমনকি সে আল্লাহর কালাম শুনে *(সূরা আত-তাওবা ৯:৬)*।

{يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللَّهِ ... } [الفتح: 15] .

তারা আল্লাহর বাণী পরিবর্তন করতে চায় *(সূরা আল-ফাতাহ ৪৮:১৫)*।

কুরআন আল্লাহর কালাম এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত এবং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসারীদের বিশ্বাস। আর মুশরিকরা জানে যে, কুরআন আল্লাহর কালাম এবং তা মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী নয়। কেননা, কুরআন যদি মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী হতো, তাহলে তারাও মুহাম্মাদের মত কুরআনের অনুরূপ কিছু রচনা করতে সক্ষম হতো। কিন্তু তা সম্ভব নয়, কেননা মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মতই

একজন মানুষ। তাই কুরআন তার কথা হলে মুশরিকরাও তার মত করে বর্ণনা করতে পারতো। আর আল্লাহ তা'আলাও কুরআনের অনুরূপ কিছু রচনা করা অথবা দশটি অথবা একটি সূরা রচনা করে দেখাতে তাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ করেছেন। তারা কুরআনের অনুরূপ কিছুই রচনা করতে সক্ষম হয়নি। অথচ কুফরী, অবাধ্যতা এবং আল্লাহ ও তার রসূলকে কষ্ট দেয়ার লিপ্সা তাদের রয়েছে।

কুরআনের অনুরূপ সূরা রচনা করতে সক্ষম হলে তারা বিলম্ব করতো না। কিন্তু তারা অক্ষমতাই প্রকাশ করেছিল। তাই প্রমাণিত, কুরআন আল্লাহর কালাম, অন্যের কালাম নয় এবং জিবরাঈল ও মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কালামও নয়। তারা আল্লাহ তা'আলার পক্ষে তার কালামের আমানাত স্বরূপ প্রচারক মাত্র। প্রথমে যিনি কথা বলেন, তার দিকেই কথার সম্বন্ধ করা হয়, ঐ কথা প্রচারকের দিকে সম্বন্ধ করা হয় না। কাফিররা দম্ভ করে বলতো, কুরআন যাদু গ্রন্থ। তারা এটাও বলতো, আহলে কিতাবের আলেমদের নিকট থেকে মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআন শিক্ষা করেছে। তারা বিভিন্ন রকমের কথা বার্তা বলতো। যা কুরআনের ব্যাপারে জাহিলদের মিথ্যা বলা ও দোষারপ করাই প্রমাণ করে।

যারা বিশ্বাস করে যে, কুরআন মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কালাম আর তা মানুষের কথা। তা জাহিলদের কথার মতই। জাহমিয়্যাহ, মু'তাযিলা ও তাদের মত অন্য গোষ্ঠিদের মধ্যে কেউ বলে, কুরআন আল্লাহর কালাম নয়। তাদের কথা, কুরআনকে আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈলের মাঝে সৃষ্টি করে দিয়েছেন অথবা তিনি লাওহে মাহফুযে তা সংরক্ষণ করেছেন। এরূপ আরোও বাতিল-মিথ্যা কথা তারা বলে থাকে, যা জাহিলদের কথার মতই।

৫২. আল্লাহ তা'আলার কর্মের প্রজ্ঞা অস্বীকার করা

আল্লাহ তা'আলার হেকমত-প্রজ্ঞা সম্পর্কে দোষারোপ করা।

....

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ তা'আলা নিজেকে হেকমত-তাৎপর্যের সাথে গুনান্বিত করেছেন যে, তিনি প্রজ্ঞাময়। আর (الحكمة) হেকমত-প্রজ্ঞা হলো কোন জিনিসকে তার স্ব স্থানে রাখা। তাই যিনি কোন বিষয়-বস্তুকে যথাস্থানে রাখেন তিনিই প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ তা'আলা নিজেকে হেকমতের সাথে হাকীম বা প্রজ্ঞাময় গুনান্বিত করেছেন। কারণ হাকীম অর্থ পূর্ণ প্রজ্ঞার অধিকারী। তাই সৃষ্টিকুল হেকমতের উপর নির্মিত। আল্লাহ তা'আলা হেকমত ছাড়া অনর্থক কোন জিনিস সৃষ্টি করেন না। তিনি আকাশ-জমিন, পাহাড়-পর্বত, জীন-মানব, পশু-পক্ষি সবকিছুই হেকমতের সাথেই সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি জগতের পূর্ণাঙ্গতা ও ফলাফল নিয়ে গভিরভাবে চিন্তা করলে আল্লাহ তা'আলার হেকমত বুঝা যায়। আর এ সৃষ্টি জগতের স্রষ্টা প্রজ্ঞাময়, যিনি পূর্ণ প্রজ্ঞার অধিকারী তাকে চেনা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى} [طه: 50] ،

যিনি সকল বস্তুকে তার আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর সঠিক পথ নির্দেশ করেছেন (সূরা ত্বা-হা ২০:৫০)। তিনি আরোও বলেন,

{وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرض وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ} [ص: 27] .

আর আসমান, যমীন এবং এ দু'য়ের মধ্যে যা আছে তা আমি অনর্থক সৃষ্টি করিনি। এটা কাফিরদের ধারণা, সুতরাং কাফিরদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের দুর্ভোগ *(সূরা ছোয়াদ ৩৮:২৭)*।

আল্লাহ তা'আলার সকল সৃষ্টি, তার আদেশ, নিষেধ ও শরী'আতের ব্যাপারে তিনি প্রজ্ঞাময়। আর যে বিষয়ে নিশ্চিত ক্ষতি রয়েছে অথবা ক্ষতির সম্ভাবনা আছে সে ব্যাপারেই তিনি নিষেধ করেন। পক্ষান্তরে, যে বিষয়ে নিশ্চিত ও সম্ভাব্য কল্যাণ রয়েছে সে ব্যাপারে তিনি আদেশ করেন। আল্লাহ তা'আলার আরোও হেকমত হলো তিনি সৃষ্টি জগতের হিসাব সংরক্ষণ করেন, অতঃপর ইহসানকারীর ইহসান এবং পাপীর পাপ অনুযায়ী তিনি প্রতিদান দেন। তিনি মানুষের প্রত্যেক কর্মের বিনিময় নির্ধারণ করে ছেড়ে দিয়েছেন। অতঃপর তিনি কর্মের প্রতিফল না দিলে তা হবে তার হেকমত বিরোধী। এ কারণে তিনি বলেন,

{وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لاعِبِينَ} [الأنبياء:16]

আসমান–যমীন ও তাদের মাঝখানে যা কিছু আছে তার কোন কিছুই আমি খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি *(সূরা আম্বিয়া ২১:১৬)*। তিনি আরোও বলেন,

{وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ} [ص:27] ،

আর আসমান, যমীন এবং এ দু'য়ের মধ্যে যা আছে তা আমি অনর্থক সৃষ্টি করিনি। এটা কাফিরদের ধারণা, সুতরাং কাফিরদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের দুর্ভোগ *(সূরা সা'দ ৩৮:২৭)*।

যারা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে তাদেরকে তিনি প্রত্যাখ্যান করে বলেন,

{أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ} [المؤمنون:115] ،

তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে কেবল অনর্থক সৃষ্টি করেছিলাম এবং তোমরা আমার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে না?' (সূরা মু'মিনিন ২৩:১১৫)।

{أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً} [القيامة:36]

মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে? *(সূরা কিয়ামাহ ৭৫:৩৬)*।

অর্থাৎ আদেশও দেয়া হবে না, নিষেধও করা হবে না, আবার প্রতিদান ও দিবেন না?! জাহিলরা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি ও কর্মের হেকমত অস্বীকার করে। আশা'ইরা ও মু'তাযিলারাও আল্লাহ তা'আলার কর্মের হেকমত অস্বীকার করে। আশা'ইরা আল্লাহ তা'আলার কর্মের হেকমত অস্বীকার করে বলে, আল্লাহ তা'আলা প্রজ্ঞার সাথে কোন কিছু করেন না। বরং তার ইচ্ছা প্রকাশের জন্যই কোন কিছু সৃষ্টি করেন, হেকমতের জন্য নয়। কেননা, হেকমত অর্থ হলো কোন উদ্দেশ্যে কর্ম সম্পাদন করা। আর আল্লাহ তা'আলা সকল উদ্দেশ্য থেকে মুক্ত। আর হেকমত তার উপর প্রভাবিত হলে এ কারণেই তখন সবকিছু সৃষ্টি বলে গণ্য হবে। তাই আল্লাহ তা'আলা কেবল ইচ্ছা ও কল্পনার মাধ্যমেই সব কিছু সৃষ্টি করেন, হেকমতের জন্য নয়।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলাকে বিভিন্ন উদ্দেশ্য হতে তার পবিত্রতা বজায় রাখার জন্য ধারণা বশতঃ তার কর্ম ও শরী'আতে নিহীত হেকমতকে তারা অস্বীকার করে। আর এ কারণেই তারা বলে, কুফরী, ফাসেকী ও অবাধ্যতার নির্দেশ দেয়াও আল্লাহর জন্য বৈধ। আর আনুগত্য, ছলাত প্রতিষ্ঠা, আত্মীয় স্বজনের প্রতি দয়া প্রদর্শন এবং ভাল কাজের আদেশ করা হতেও তিনি নিষেধ করতে পারেন। কেননা, তিনি যা চান তাই করতে পারেন। এ ব্যাপারে আমরা তাদেরকে বলবো, আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন তবে তিনি হেকমত ছাড়া কোন কিছু করেন না। তারা আরোও বলে, কাফিরকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহ তা'আলার জন্য বৈধ। আর মু'মিন-মুত্তাক্বিকে জাহান্নামে প্রবেশ করানোও তার জন্য বৈধ।

কেননা এ বিষয় কেবল তার দিকেই ফিরে আসে। কোন কিছুই তাকে আদেশ করতে পারে না। আমরা বলবো, এ ধরণের কথা-বার্তা বাতিল যা আল্লাহ তা'আলার হেক্বমতের সাথে মানানসই নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

{أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ} [صٓ:28]

যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে আমি কি তাদেরকে যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের সমতুল্য গণ্য করব? নাকি আমি মুত্তাকীদেরকে পাপাচারীদের সমতুল্য গণ্য কর? *(সূরা ছুদ ৩৮:২৮)*। তিনি আরো বলেন,

{أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ} [الجاثية:21]

না কি যারা দুস্কর্ম করেছে তারা মনে করে যে, জীবন ও মৃত্যুর ক্ষেত্রে আমি তাদের এ সব লোকদের সমান গণ্য করব যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে? তাদের বিচার কতই না মন্দ! *(সূরা জাছিয়া ৪৫:২১)*।

সুতরাং যারা এ সব কথা রচনা করে এবং আল্লাহ তা'আলাকে মন্দ ও পাপ সংক্রান্ত ব্যাপারে গুণান্বিত করে তাদের রীতিই হচ্ছে জাহিলী রীতি। আর আশা'ইরা ও অন্যান্য দল কর্তৃক আল্লাহ তা'আলার হেকমতকে অস্বীকার করা থেকে আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৫৩. আল্লাহর শরী'আত বাতিল করণে ফন্দি-ফিকির ও ষড়যন্ত্র করা

রসূলগণ যা নিয়ে এসেছেন সে ব্যাপারে প্রকাশ্যে ও গোপনে ষড়যন্ত্র করা। যেমন আল্লাহ তা'আলার কথা:

{وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ} [آل عمران: 54]

আর তারা কুটকৌশল করেছে এবং আল্লাহ কৌশল করেছেন *(সূরা আলে-ইমরান ৩:৫৪)*। তিনি আরোও বলেন,

{وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ ... } [آل عمران: 72]

আর কিতাবীরা একদল বলে, মুমিনদের উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তোমরা তার প্রতি দিনের প্রথম ভাগে ঈমান আন, আর শেষ ভাগে তা কুফরী কর *(সূরা আলে-ইমরান ৩:৭২)*।

....

ব্যাখ্যা: কিতাবধারী ও নিরক্ষর জাহিলদের কর্ম হলো আল্লাহ তা'আলার শরী'আত হতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য কৌশল করে তা পরিবর্তন করা এবং তাদের কুফরী ও ভ্রষ্টতাকে বাস্তবায়ন করা। কেননা তারা সত্য গ্রহণে অনীহা। তাই শরী'আত পরিবর্তনে গোপন ষড়যন্ত্রে তারা লিপ্ত হয়। একারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে বলেন,

{وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ} [آل عمران: 54]

আর তারা কুটকৌশল করেছে এবং আল্লাহ কৌশল করেছেন। আর আল্লাহ উত্তম কৌশলকারী *(সূরা আলে-ইমরান ৩:৫৪)*।

আর গোপন কুট-কৌশলের মাধ্যমে অপছন্দনীয় বিষয় পরিচালনা করাকে বলা হয় ষড়যন্ত্র। নাবীগণকে হত্যার অভ্যাস অনুযায়ী ইয়াহুদীরা যখন মরিয়মের পুত্র ঈসা আলাইহিস সালামকে হত্যা করতে চাইলো তখন তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে নিয়ে তারা মূর্তি পূজক কাফির রাজার নিকট গেল।

অতঃপর তারা তাকে বললো, যদি আপনি এ লোককে ছেড়ে দেন তাহলে সে আপনার শাসন ব্যবস্থা পরিবর্তন করে ফেলবে। অতঃপর ঈসা মাসিহকে হত্যার উদ্দেশে রাজা একটি দল প্রেরণ করলো এবং তারা ঈসা আলাইহিস সালাম এর ঘরে প্রবেশ করে তাকে হত্যা করতে চাইলো। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তার নাবীর জন্য কৌশল করলেন। ঈসা আলাইহিস সালাম এর অনুসারীর মধ্যে একজনকে আল্লাহ তা'আলা ঈসা আলাইহিস সালাম এর চেহারার সাদৃশ্য করে দিলেন। সে নিজেকে তাদের সামনে তুলে ধরে আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রতিদান চাইলো। সে যেন ঈসা মাসিহ রূপেই প্রকাশ পেল। অতঃপর তারা তাকে পাঁকড়াও করে হত্যা করলো এবং তাকে কাষ্ঠ খন্ডে শুলে চড়িয়ে ছিল। তারা ধারণা করেছিল

তিনিই মাসিহ। আর আল্লাহ তা'আলা তাদের মাঝ থেকে ঈসা মাসিহকে তার নিকট তুলে নিলেন, অথচ তারা বুঝতেই পারল না। আর এ কারণে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

: {وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ} [النساء: 157] .

তারা তাকে হত্যা করেনি এবং তাকে শূলেও চড়ায়নি। বরং তাদেরকে ধাঁধায় ফেলা হয়েছিল *(সূরা নিসা ৪:১৫৭)*। এটাই আল্লাহ তা'আলার কথার অর্থ:

{وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ} [آل عمران: 54] ،

আর তারা কুটকৌশল করেছে এবং আল্লাহও কৌশল করেছেন *(সূরা আলে-ইমরান ৩:৫৪)*।

এ কৌশল তাদের সাথে মোকাবেলা ও শাস্তির অন্তর্ভুক্ত বিষয়। আল্লাহ তা'আলা ঈসা আলাইহিস সালাম এর ব্যাপারে ন্যায়পরায়ণ। সৃষ্টির ষড়যন্ত্র (আল্লাহর কৌশলের) বিপরীত। কেননা, তা যুলুম ও সঠিক নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ} [آل عمران: 72]

আর কিতাবীরা একদল বলে, মুমিনদের উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তোমরা তার প্রতি দিনের প্রথম ভাগে ঈমান আন, আর শেষ ভাগে তা অস্বীকার কর *(সূরা আলে-ইমরান ৩:৭২)*। এটাও ছিল ইয়াহুদীদের ষড়যন্ত্র।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় হিজরত করলেন, আল্লাহ তা'আলা বিধান জারী করলেন, আর বদর যুদ্ধে মুশরিকদের বিরূদ্ধে মুসলিমদের সাহায্য করলেন, তাতে হক্বপন্থী ও বাতিলপন্থী সুস্পষ্ট হলো। আর মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দীন থেকে মানুষকে বিমুখ করতে ইয়াহুদীরা অক্ষম হলো, ফলে তারা ষড়যন্ত্র ও প্রতারণার আশ্রয় নেয়। তাদের একদল বললো, তোমরা দিনের প্রথম ভাগে ইসলাম

গ্রহণ করো। আর দিনের শেষে ইসলাম পরিত্যাগ করো। আর তোমরা বল, মুহাম্মাদের দীনে আমরা কোন উপকারীতা পাইনি। তাহলে মানুষ তোমাদের অনুসরণ করবে, কেননা তোমরা আহলে কিতাব।

আর তারা বলে, যদি ইয়াহুদীরা মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দীনের উপকার লাভ করতোই তাহলে তার দীন থেকে তারা বেরিয়ে যেত না। তাই তারা তোমাদের অনুসরণ করবে। আল্লাহ তা‘আলা তাদের কুটকৌশল প্রকাশ করে দেন। তিনি বলেন,

{وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ} [آل عمران: 72]

আর কিতাবীদের একদল বলে, মুমিনদের উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তোমরা তার প্রতি দিনের প্রথম ভাগে ঈমান আন, আর শেষ ভাগে তা অস্বীকার কর *(সূরা আলে-ইমরান ৩:৭২)*। অর্থাৎ এখানে দিনের প্রথম ভাগ সময় বুঝানো হয়েছে। আর কোন জিনিসের সূচনা বলতে তার শুরুর পর্যায় ও তার প্রারম্ভিকা বুঝায়।

যারাই আল্লাহর শরী‘আত পরিবর্তন ও তার অনুসারীদের ক্ষতি করার জন্য প্রতারণার আশ্রয় নেয়, তারাই জাহিলী রীতির উপর বিদ্যমান। আহলুস সুন্নাহ ও তাওহীদপন্থীদের মধ্যে থেকেও কেউ যদি দুনিয়া লাভের জন্য এরূপ কাজ করে তবে সেটাও জাহিলী পন্থা।

৫৪. হক্ব প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে হক্বের স্বীকৃতি প্রদান

প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে জাহিলরা হক্ব স্বীকার করে। যেমনভাবে আল্লাহ তা'আলা পূর্বের আয়াতে উল্লেখ করেন।

....

ব্যাখ্যা: জাহিলী রীতি হলো কেবল হক্বকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে তারা তার স্বীকৃতি দেয়, আনুগত্যের উদ্দেশ্যে নয়। যেমনভাবে ইয়াহুদীরা স্বীকৃতি দিয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} [آل عمران: 72]

আর কিতাবীরা একদল বলে, মুমিনদের উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তোমরা তার প্রতি দিনের প্রথম ভাগে ঈমান আন, আর শেষ ভাগে তা কুফরী কর *(সূরা আলে-ইমরান ৩:৭২)*। এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

শত্রুদের মধ্যে যারা মুসলিমদের মধ্যে গোপনে প্রবেশ করে, তাদের এ ষড়যন্ত্রের বর্ণনা মুসলিমদের নিকট দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। শত্রুরা প্রকাশ্যে হক্ব গ্রহণের স্বীকৃতি দিয়ে ইসলামের পরিবর্তন ও ফাসাদ সৃষ্টি করতে চায়।

নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে এমনটা ঘটেছিল। বর্তমান সময় পর্যন্ত তা ঘটেই চলছে, আল্লাহ তা'আলা যতদিন চান চলবে। ইসলামের শত্রুরা গোপনে ইসলামে প্রবেশ করে, মুসলিমদের মাঝে বিশৃঙ্খলা, সন্দেহ, কালিমার বিভক্তি, তাদের মাঝে শত্রুতা ও তাদেরকে দলে দলে বিভক্ত করার জন্যই ইসলাম পালন করছে। এটাই শত্রুদের কৌশল ও ষড়যন্ত্র।

এ জঘন্য ষড়যন্ত্র সম্পর্কে মুসলিমদের উপর আবশ্যক হলো সতর্ক হওয়া এবং প্রত্যেক উদ্যমী ব্যক্তির প্রতি আস্থাভাজন না হওয়া। বরং মানুষকে যাচাই বাছাই এবং গভীরভাবে পরখ করে দেখাও তাদের উপর

আবশ্যক। আর মানুষের সততা প্রমাণিত হলে তখনই তাদেরকে বিশ্বাস করবে।

৫৫. তারা যে বাতিলের উপর রয়েছে, তার প্রতি অন্ধভক্তি

নিজ মাযহাবের পক্ষপাতিত্ব করা। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{وَلا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ} [آل عمران: 73] .

আর তোমরা কেবল তাদেরকে বিশ্বাস কর, যারা তোমাদের দীনের অনুসরণ করে *(সূরা আলে-ইমরান ৩:৭৩)*।

....

ব্যাখ্যা: কোন জিনিসের জঘন্যতম পক্ষপাতিত্ব হলো মিথ্যা জানা সত্ত্বেও তা আঁকড়ে ধরা। জাহিলী সমস্যা হলো মিথ্যা মতের পক্ষ অবলম্বন করা। এ কারণে ইয়াহুদীরা বলেছিল,

{وَلا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ} [آل عمران: 73]

আর তোমরা কেবল তাদেরকে বিশ্বাস কর, যারা তোমাদের দীনের অনুসরণ করে *(সূরা আলে-ইমরান ৩:৭৩)*। অন্য আয়াতে আছে,

{نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا} [البقرة: 91]

আমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে আমরা তা বিশ্বাস করি *(সূরা আল-বাক্বারাহ ২:৯১)*। অর্থাৎ কেবল আমাদের নাবীগণের উপর (যা নাযিল হয়েছে)।

আল্লাহ তা'আলা নাবীগণের উপর যা নাযিল করেছেন তার প্রতি ঈমান আনা ওয়াজীব। অথচ নাবীগণের উপর যা নাযিল করা হয়েছে তারা তা বিশ্বাস করে না। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ} [البقرة: 91]

বল, তবে কেন তোমরা আল্লাহর নাবীদেরকে পূর্বে হত্যা করতে, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক? *(সূরা আল-বাক্বারাহ ২:৯১)*।

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর যা নাযিল করেছেন তাতে কি নাবীগণকে হত্যার কথা আছে, যা তোমরা করো?

আর এ কারণে বিভিন্ন মাযহাবপন্থীরা দলীল ছাড়াই তাদের মাযহাবের পক্ষপাতিত্ব করে। তাই হক্ব নিজের মাযহাব অথবা অন্যের মাযহাবে থাকুক সাধারণ মুসলিম ও শিক্ষার্থীর উপর তা অনুসরণ ওয়াজীব।

যে মাযহাবে সঠিক ও ভুল দুটোই রয়েছে আমরা তার সবই গ্রহণ করবো না। বরং আমরা সঠিকটাই গ্রহণ করবো এবং ভুল অংশ পরিত্যাগ করবো। কেউ হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী হলে মালেকী বা হানাফী বা শাফেয়ী মাযহাবে সঠিক মাস'আলা পেলে তা গ্রহণ করবে, হোক তা নিজের মাযহাবের বিরোধী।

কেননা, এখানে উদ্দেশ্যে হলো হক্ব গ্রহণ করা, আর যে শিক্ষায় দলীল বিদ্যমান তা আহলুল ইলম বা বিদ্বানগণের গ্রহণ করা ওয়াজীব। আর যদি কেউ বিদ্বান না হয়, তাহলে কোন নির্ভরযোগ্য আহলুল ইলম বা বিদ্বানের নিকট জেনে নেয়া আবশ্যক। তারা যে ফাতওয়া দিবেন তা গ্রহণ করবে, এটাই সঠিক পন্থা। অপর দিকে মাযহাব হক্ব অথবা বাতিল যাই হোক তার পক্ষপাতিত্ব করা জাহিলী রীতি। যেমনভাবে আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদীদের ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন।

৫৬. তাওহীদকে শিরক গণ্য করা

ইসলামের অনুসরণকে শিরক মনে করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَاداً لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ} [آل عمران: 79] الآية]

কোন মানুষের জন্য সংগত নয় যে, আল্লাহ তাকে কিতাব, হিকমাত ও নবুয়্যত দান করার পর সে মানুষকে বলবে, তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে আমার বান্দা হয়ে যাও *(সূরা আলে-ইমরান ৩:৭৯)*।

....

ব্যাখ্যা: জাহিলী সমস্যা হলো তাওহীদ ও হক্বের অনুসরণকে শিরক মনে করা। তাওহীদকে শিরক গণ্য করা বাস্তবতা ও স্বভাব বিরোধী। নাজরানের খ্রিষ্টান প্রতিনিধি দলের ব্যাপারে আয়াতটি নাযিল হয়েছে। দলটি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে পারস্পারিক আলোচনা করার জন্য মসজিদে প্রবেশ করে এবং আলোচনায় লিপ্ত হয়। তিনি তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের প্রস্তাব দেন। আর তাদের নিকট বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা সকল নাবীর কাছে থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। তিনি আরো বর্ণনা করেন, মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রেরিত নাবী; যে কেউ জীবিত থাকলে অবশ্যই তার অনুসরণ করবে। তাদের একজন বললো, হে মুহাম্মাদ! আপনি কি চান যে, আমরা আপনার ইবাদত করি? এভাবে শিরকের সাথে হকের অনুসরণ ও রসূলের ইবাদতের নামকরণ করা হলে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন। তিনি বলেন,

{مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَاداً لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ ... } [آل عمران: 79]

কোন মানুষের জন্য সংগত নয় যে, আল্লাহ তাকে কিতাব, হিকমাত ও নবুয়্যত দান করার পর সে মানুষকে বলবে, তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে আমার বান্দা হয়ে যাও *(সূরা আলে-ইমরান ৩:৭৯)*।

কেননা, নাবীগণ তাওহীদ নিয়ে এসেছেন, শিরক নিয়ে আসেননি এবং তাদের ইবাদতের উদ্দেশ্যে মানুষের নিকট দাওয়াত নিয়ে আসেননি। বরং শিরককে অস্বীকার করার উদ্দেশ্যে তারা প্রেরিত হয়েছেন। কিন্তু ঐসব লোক পক্ষপাতিত্ব করে এ সব বলে। আল্লাহ তা'আলা তাদের কথা প্রত্যাখ্যান করে আয়াত নাযিল করেন।

গতরাতের সাদৃশ্য কেমন হয়! যারা আল্লাহ তা'আলার একনিষ্ঠভাবে ইবাদতকে কুফরী গণ্য করে এবং দীন থেকে বের হওয়া ও শিরক মনে করে। আর বলে: কবরের ইবাদত করা তাওহীদ এবং এটাই ইসলাম। কারণ তা নেকলোকদের সাথে সাক্ষাত ও তাদেরকে ভালবাসার মাধ্যম।

তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, যে ব্যক্তি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইবাদত করবে না, তার নিকট সাহায্য চাইবে না, সে হবে রসূলের শত্রু এবং রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হক্বের ব্যাপারে সে অন্যায়কারী বিবেচিত হবে। এটা রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনুগত্যের ব্যাপারে নাজরান খ্রিষ্টানদের কথার মতই, (তাদের কথা) রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য ইবাদত সাব্যস্ত। এভাবে জাহিলী মতের বিস্তার ঘটে। জাহিলদের প্রত্যেকেই হক্বকে বাতিল ও বাতিলকে হক্ব হিসাবে নামকরণ করেছে। এ থেকে আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

জাহমিয়া ও মু'তাযিলারা আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীকে শিরক সাব্যস্ত করে।

৫৭-৫৮. আল্লাহর কিতাবের ভাষা বিকৃতি ও পরিবর্তন করা

আল্লাহর কিতাবের কথা স্ব-স্থান হতে বিকৃতি ও ভাষা পরিবর্তন করা।

....

ব্যাখ্যা:কিতাবের কথা স্ব-স্থান হতে পরিবর্তন করা বলতে ভাষার বর্ণের পরিবর্তন অথবা অর্থের বিকৃতি সাধন। আহলে কিতাবদের জঘন্য স্বভাব হলো তারা কিতাবের কথাকে স্ব-স্থান হতে পরিবর্তন করে। ফলে শব্দাবলী ও অর্থের পরিবর্তন এবং অপব্যাখ্যার মাধ্যমে এ বিকৃতি ঘটে। তাই যারাই আল্লাহর কালামের বিকৃতি সাধন করে, তারাই জাহিলী রীতির উপর বিদ্যমান। আর ইসলামের দিকে সম্পৃক্তকারী বাতিলপন্থী ও ইসলাম বিরোধী ভ্রষ্টদল তাদের উদ্দেশ্যে বাস্তবায়ন ও মাযহাবের অনুসরণের জন্য আল্লাহর কিতাবের (نص) নছ্ব-মূল অংশ পরিবর্তন করে। আর শব্দের পরিবর্তন অথবা অর্থের বিকৃতি সাধন অথবা অপব্যাখ্যার মাধ্যমে যাই তারা তা করুক না কেন তা জাহিলদের উত্তরাধীকার হিসাবে গণ্য হবে।

আল্লাহ তা'আলা শব্দ-অর্থসহ যা নাযিল করেছেন তার প্রতি ঈমান আনা এবং কোন পরিবর্তন ও বিকৃতি ছাড়াই বিধান অনুসারে আমল করা ওয়াজীব। চাই তা প্রবৃত্তি ও আকাঙ্খার অনুকূল অথবা প্রতিকূলে হোক। (তা মেনে নেয়া আবশ্যক)।

বর্তমানে নিকৃষ্ট পথ অবলম্বনকারী ও মিথ্যা মাযহাবীরা কুরআনের (نص) নছ্ব-মূল রচনা ও রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত ছহীহ হাদীছের(متن) মতন-মূলপাঠ প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা প্রতিহত ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে অক্ষম হয়ে পরিবর্তন করেছে এবং মূল তাফসীর বাদ দিয়ে অপব্যাখ্যা করছে। এটাই হলো জাহিলী ও ইয়াহুদীদের রীতি।

আল্লাহর কিতাব ও রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাহকে সম্মান করা মুমিনের উপর ওয়াজীব। তাই আল্লাহ তা'আলা ও তার রসূল যেভাবে চেয়েছেন সেরূপেই শব্দ ও অর্থ উভয় দিক থেকে মুমিন এ

দু'টিকে বিশ্বাস করবে। আর (نص) নছ্ব-মূল অংশের অর্থ পরিবর্তন করবে না এবং শব্দের সাথে অতিরিক্ত সংযোজন অথবা বিয়োজনের মাধ্যমে পরিবর্তনও করবে না, অথবা মিথ্যা কিছু যোগও করবে না।

৫৯. হক্বপন্থীদেরকে মন্দ উপাধি দেয়া

হিদায়াত ও সঠিক পথের অনুসারীদেরকে সাবয়ী-দীনত্যাগী ও মন্দ উপাধী দেয়া।

....

ব্যাখ্যা: জাহিলদের রীতি হলো হেদায়াত পন্থীদেরকে অবজ্ঞা করা এবং তাদেরকে নোংরা মন্দ শব্দের মাধ্যমে উপাধী দেয়া। তারা হক্বপন্থীদেরকে সাবয়ী-দীনত্যাগী নামে ডাকে। আর (الصابئ) সাবয়ী হলো যে দীন থেকে বেরিয়ে যায়। তাই জাহিলরা হক্বপন্থীদেরকে সাবয়ী-দীনত্যাগী নামে ডাকে, যেন হক্ব থেকে বেরিয়ে গিয়েছে! কেননা, জাহিলরা যে কুফরী ও ভ্রষ্টতার উপর আছে তাদের পরিভাষায় সেটাই হক্ব। আর যারা রসূলের আনুগত্য করে, তারা সাবয়ী-দীনত্যাগী অর্থাৎ জাহিলদের অভ্যাস, অন্ধঅনুকরণ, পদ্ধতি, প্রথা এবং তাদের বাপ-দাদাদের রীতি থেকে তারা বেরিয়ে গেছে। আর জাহিলরা তাদেরকে (الحَشَوِيَّة) হাশাবীয়া তথা অনর্থক কর্মকারী নামেও ডাকে। (الحَشَوِيَّة) আল-হাশাবীয়া শব্দটি (الحشو) আল-হাশবু থেকে উদ্ভুত। আর হাশবু হলো অনর্থক বিষয় যাতে কোন উপকারীতা নেই। আর হাশবুল কালাম অনর্থক কথা হলো যাতে কোন কল্যাণ নেই। জাহিলরা তাদেরকে অদক্ষ, পশ্চাদমুখী, স্থুলবুদ্ধি সম্পন্ন এবং এরূপ অন্যান্য শব্দাবলীর মাধ্যমে নাম দেয়। কিন্তু এসব হক্বপন্থীদের কোন ক্ষতি করতে পারে না। নূহ আলাইহিস সালাম এর জাতি বলেছিল,

{وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ} [هود: 27]

আমরা দেখছি যে, কেবল আমাদের নীচু শ্রেণীর লোকেরাই বিবেচনাহীনভাবে তোমার অনুসরণ করেছে *(সূরা হুদ ১১:২৭)*। অর্থাৎ হক্বপন্থীরা অদক্ষ, তাদের চিন্তা-চেতনা নেই। হে নূহ! চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই তারা তোমার অনুসরণ করে। বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্নদের চিন্তা-চেতনা আছে তাই তারা তোমার অনুসরণ করেনি।

৬০-৬১. আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করা এবং হক্বকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা

....

ব্যাখ্যা: আল্লাহ, তার রসূল এবং হক্বের প্রতি মিথ্যারোপ করা জাহিলী রীতির অন্তর্ভুক্ত। যেমন জাহিলরা নগ্ন হয়ে কাবা তাওয়াফের সময় বলতো,

{وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا} [الأعراف: 28]

আমরা এতে আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছি এবং আল্লাহ আমাদেরকে এর নির্দেশ দিয়েছেন *(সূরা আরাফ ৭:২৮)*। এটাই আল্লাহ তা'আলার প্রতি মিথ্যারোপ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً} [الأنعام: 21]

আর তার চেয়ে বড় যালিম আর কে যে আল্লাহর উপর মিথ্যা রটনা করে *(সূরা আন'আম ৬:২১)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [آل عمران: 78]

তারা আল্লাহর উপর মিথ্যা বলে, অথচ তারা জানে *(সূরা আল ইমরান, ৩:৭৮)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ} [النحل: 105]

একমাত্র তারাই মিথ্যা রটায়, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে না। আর তারাই মিথ্যাবাদী *(সূরা আন নাহল, ১৬:১০৫)*।

{وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ} [النحل: 116]

তোমাদের জিহ্বা দ্বারা বানানো মিথ্যার উপর নির্ভর করে বলো না যে, এটা হালাল এবং এটা হারাম, আল্লাহর উপর মিথ্যা রটানোর জন্য। নিশ্চয় যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা রটায়, তারা সফল হবে না *(সূরা আন নাহল ১৬:১১৬)*।

অনুরূপভাবে যারা রসূলের উপর মিথ্যারোপ করে, (তারা বলে) তিনি যে হাদীছ বর্ণনা করেন, তা মিথ্যা। আর যে, বিশস্ততা ও প্রমাণ ছাড়া হাদীছ বর্ণনা করে, সে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। এ কারণে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"من حدّث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين"

যে আমার পক্ষ থেকে এমন হাদীছ বর্ণনা করে অথচ সে জানে তা মিথ্যা, সে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।[৪৭]

আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যারোপ করাই জাহিলদের অভ্যাস। যেমন তারা ধারণা করে, আল্লাহ তাদেরকে নগ্ন হয়ে কাবা তাওয়াফ করতে আদেশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা যা হালাল করেছেন তারা তা হারাম করে। তারা আরোও ধারণা করে যে, আল্লাহ তা'আলা এটা তাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ... } [النحل: 35]،

আর যারা শির্ক করেছে, তারা বলল, যদি আল্লাহ চাইতেন তবে আমরা তাকে ছাড়া কোন কিছুর ইবাদত করতাম না *(সূরা নাহাল ১৬:৩৫)*।

{لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا} [الأنعام: 148]

আল্লাহ যদি চাইতেন, আমরা শিরক করতাম না *(সূরা আন'আম ৬:১৪৮)*।

{لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ} [الزخرف: 20] ،

---

৪৭. মুসলিম হা/১, বিশস্ত রাবী হতে হাদীছ বর্ণনা করা ওয়াজীব এবং মিথ্যুক রাবীদের হাদীছ পরিত্যাজ্য। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি মিথ্যারোপে সতর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়।

পরম করনাময় আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমরা এদের ইবাদাত করতাম না *(সূরা যুখরূফ ৪৩:২০)*।

এসবই আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যারোপ। কেননা, জাহিলরা যে রীতির উপর আছে তা অস্বীকার করার জন্য আল্লাহ তা'আলা রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন।

সার কথা হলো আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি মিথ্যারোপ করা জাহিলী কর্ম। সুতরাং এ নিকৃষ্ট কর্ম থেকে মুসলিমদের সতর্ক থাকা আবশ্যক। মুসলিম কখনো আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করে না। আর সে আল্লাহ ও তার রসূলের নির্দেশ ও ফাতওয়া পরিবর্তনের চেষ্টা করে না। আর যে ব্যক্তি কোন কিছু বর্ণনা করে, যা ভুল ও দলীলবিহীন, আর তা মানুষের মাঝে প্রচার করে, সে হবে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। আর এরূপ বর্ণনা ও প্রচারের মাধ্যমে সে মানুষের ক্ষতি সাধন করে।

আবশ্যক-ওয়াজীব হলো মিথ্যা-জাল হাদীছ যেন প্রচার ও বর্ণনা করা না হয়, বরং প্রচারণার পথ বন্ধ করা ও তাতে কঠোরতা আরোপ করা হবে। আর উপদেশ দাতা ও দা'ঈগণ আল্লাহ ও রসূল সম্পর্কে যা বলেন সে ব্যাপারে যেন তারা সাবধানতা অবলম্বন করেন। অনুরূপভাবে হালাল, হারাম ও ফাতওয়া সম্পর্কেও তাদের সতর্ক হওয়া উচিত। এ ব্যাপারে যেন তারা তাড়াহুড়া না করেন। কেননা, ইলম-জ্ঞান ছাড়া আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে ভুল বলার সম্ভাবনা আছে। অনুরূপভাবে আল্লাহ ও রসূল থেকে প্রমাণিত হক্ব সম্পর্কে মিথ্যারোপ করা থেকেও তারা সতর্ক হবে। আর আল্লাহ ও রসূল সম্পর্কে অন্যায়ভাবে মিথ্যারোপ করে তারা যেন কোন কিছু বর্ণনা না করেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

{فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ} [الزمر: 32]

সুতরাং তার চেয়ে অধিক যালিম আর কে? যে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে এবং তার কাছে সত্য আসার পর তা অস্বীকার করে। জাহান্নামেই কি কাফিরদের আবাসস্থল নয়? *(সূরা যুমার ৩৯:৩২)*।

আল্লাহ ও তার রসূলের কথা যখন কু-প্রবৃত্তির অনুকূলে না হয়, তখন প্রবৃত্তি পূজারীদের মত আল্লাহ ও রসূলের কথা মিথ্যা দ্বারা পরিবর্তন করে তাতে তারা সন্দেহ সৃষ্টি করে।

৬২. হক্বপন্থীদের বিরুদ্ধে শাসক শ্রেণীকে ক্ষেপিয়ে তোলা

জাহিলরা দলীল-প্রমাণে পরাজিত হলে শাসকের নিকট অভিযোগ করে। যেমন জাহিলরা বলেছিল, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ} [الأعراف: 127]

আপনি কি মূসা ও তার জাতিকে ছেড়ে দেবেন যাতে তারা যমীনে ফাসাদ করে *(সূরা আরাফ ৭:১২৭)*।

....

ব্যাখ্যা: জাহিলী সমস্যা হলো দলীল প্রমাণে পরাজিত হলে, তারা শাসকের নিকট আশ্রয় গ্রহণের দাবি পেশ করে। আর এখানে ("غلبوا بالحجة") গুলিবু বিল হুজ্জাহ তথা দলীলের মাধ্যমে পরাভূত হওয়া বলতে জাহিলরা যে বাতিল-মিথ্যা রীতির উপর বহাল ছিল তার বিরুদ্ধে দলীল পেশ করা হয়েছে। জাহিলদের নিকট এমন কোন দলীল নেই, যা তারা পেশ করবে। বরং হক্ব প্রতিষ্ঠায় বাধাদানের জন্য তারা শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে। যেমন মূসা আলাইহিস সালামকে ফেরআউন বলেছিল,

{لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهاً غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ} [الشعراء: 29]

ফের'আউন বলল, 'যদি তুমি আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে ইলাহরূপে গ্রহণ কর, তাহলে অবশ্যই আমি তোমাকে কয়েদীদের অন্তর্ভুক্ত করব *(সূরা শু'আরা ২৬:২৯)*।

فإنهم يلجأون إلى القوة لمنع القائم بالحق، كما قال فرعون لموسى عليه السلام {لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهاً غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ} [الشعراء: 29]

আল্লাহর নাবীকে পরাভূত করার জন্য তার নিকট যখন কোন দলীল ছিল না, তখন রাজত্বের শক্তিকে আশ্রয় করে সে বলেছিল,

{لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ} [الشعراء: 29]

অবশ্যই আমি তোমাকে কয়েদীদের অন্তর্ভুক্ত করব *(সূরা শু'আরা ২৬:২৯)*।

এটাই পরাজিত দলের পন্থা। অনুরূপভাবে ফেরআউনের অনুসারী সম্প্রদায়ের বিরূদ্ধে তাদের চুক্তিকৃত মহা সমাবেশে মূসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তা'আলা সাহায্য করেছিলেন। আর মূসা আলাইহিস সালাম এর নিকট যে নিদর্শন ছিল তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য ফেরআউন পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তের সব যাদুকরকে একত্রিত করে। কেননা, ফেরআউন ধারণা করেছিল মূসা আলাইহিস সালাম একজন যাদুকর। তাই সে সব যাদুকরদের ডেকেছিল। আর ফেরআউন মূসা আলাইহিস সালাম এর নিকট থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিল, যাতে মূসা আলাইহিস সালাম যাদুকরদের সামনে তার নিদর্শন তুলে ধরে এবং যাদুকররাও তাদের যাদু প্রদর্শন করে। তার উদ্দেশ্যে ছিল, যাদুকররা যেন মূসা আ. কে জনগণের সামনে পরাজিত করে এবং তার নিকট যে মু'জিযা আছে তা প্রতিষ্ঠিত করতে না পারে।

অতঃপর অঙ্গীকার পূরণের সময় হলো এবং যা ঘটবে তা প্রত্যেক্ষ করার জন্য জনগণ একত্রিত হয়। যাদুকররা তাদের যাদু প্রদর্শন করলে তা দ্বারা প্রাঙ্গণ পূর্ণ হয়, আর তাদের নিকট যে লাঠি, দড়ি ছিল তা তন্ত্র দিয়ে প্রদর্শন করলে কিছুক্ষণ পর অনেক সাপে পরিনত হয়ে নড়াচড়া করতে আরম্ভ করে। আর যাদুকররা মূসা আলাইহিস সালাম এর মু'জিযার প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে চায়। এমতবস্থায় মূসা আলাইহিস সালাম এর লাঠি সাপে পরিণত হয়। অতঃপর তারা বড় বড় যাদু প্রদর্শন করে যেমনভাবে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন যে, মূসা আলাইহিস সালাম ভীত হয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى} [طه: 67]

মূসা তার অন্তরে কিছুটা ভীতি অনুভব করল *(সূরা ত্ব-হা ২০:৬২)*।

যাদুকররা জনগণের সামনে ধ্রূমজাল তৈরি করতে পারে এ ব্যাপারে তিনি শঙ্কিত ছিলেন। যেহেতু মূসা আলাইহিস সালাম মু'জিযা ও আল্লাহর সাহায্য পাবেন বলে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু আশঙ্কাবোধ করছিলেন যে, যাদুকররা জনগণের সামনে সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারে। কেননা, যাদুকররাও ভীত ছিল যে, মূসার মু'জিযা তাদের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ} [الأعراف: 118-122]

ফলে সত্য প্রকাশ হয়ে গেল এবং তারা যা কিছু করছিল তা বাতিল হয়ে গেল। তাই সেখানে তারা পরাজিত হল এবং লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে গেল। আর যাদুকররা সিজদায় পড়ে গেল। তারা বলল, 'আমরা সকল সৃষ্টির রবের প্রতি ঈমান আনলাম, মূসা ও হারূনের রবের প্রতি *(সূরা আরাফ ৭:১২২-১১৮)*।

কেননা, তারা বুঝতে পেরেছিল যে, মূসা আলাইহিস সালাম এর নিকট যা আছে তা যাদু নয়। অবশেষে যখন যাদুকররা ঈমান আনয়ন করলো এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট সিজদায় অবনত হলো, তখন ফেরআউন তাদেরকে হত্যা করা ও শুলে চড়ানোর হুমকি দেয়। পরিশেষে ঈমানদার ও তাওবাকারী যাদুকরদেরকে সে হত্যা করে এবং শুলে চড়ায়। আর বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা ঈমান আনে তাদের দিকে তারা মনোযোগ দিল এবং ফেরআউনকে তারা বললো, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا

إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ} [الأعراف: 127-128]

'আপনি কি মূসা ও তার জাতিকে ছেড়ে দেবেন যাতে তারা যমীনে ফাসাদ করে এবং আপনাকে ও আপনার উপাস্যগুলোকে বর্জন করে?' সে বলল, 'আমরা অতিসত্বর তাদের ছেলেদেরকে হত্যা করব আর মেয়েদেরকে জীবিত রাখব। আর নিশ্চয় আমরা তাদের উপর ক্ষমতাবান।' মূসা তার কওমকে বলল, আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও এবং ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয় যমীন আল্লাহর। তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে তিনি চান তাকে তার উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন। আর শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য *(সূরা আল আরাফ ৭:১২৭-১২৮)*।

এখান থেকে বুঝা গেল যে, তারা রাষ্ট্রশক্তির নিকট আশ্রয় চেয়েছিল এবং তারা ফেরআউনের নিকট অভিযোগ পেশ করেছিল যাতে হক্ব ও ঈমান পরাভূত হয়। আর জাহিলদের মত এহেন কর্মকান্ড সবযুগেই ঘটে চলছে।

৬৩-৬৭. নির্দোষ হক্বপন্থীদেরকে অপবাদ দেয়া

পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা-অরাজকতা সৃষ্টি করছে মনে করে মন্দ গুণাবলীর মাধ্যমে হক্বপন্থীদেরকে অপবাদ দেয়া। যেমনভাবে আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। আর শাসকের দীন ও তার উপাস্যের অনুসারীদের অসম্মান করা এবং দীনের বিকৃতী সাধনের জন্য তাদেরকে অপবাদ দেয়া।

....

ব্যাখ্যা: (৬৩) জাহিলদের রীতি হলো শক্তিসম্পন্ন ও প্রতিশোধ গ্রহণকারীদের নিকট (হক্বপন্থীদের বিরূদ্ধে) অভিযোগ পেশ করেই ক্ষান্ত

না হওয়া। বরং ঈমানদারদেরকে তারা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী বলে দোষারোপ করে। যেমন ফেরআউন সম্প্রদায় তাকে বলেছিল,

{أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ} [الأعراف: 127]

'আপনি কি মূসা ও তার জাতিকে ছেড়ে দেবেন যাতে তারা যমীনে ফাসাদ করে এবং আপনাকে ও আপনার উপাস্যগুলোকে বর্জন করে?' *(সূরা আরাফ ৭:১২৭-১২৮)*।

(৬৪) জাহিলরা হক্বকে ফাসাদ (বিশৃঙ্খলা) মনে করতো অথচ ফাসাদের বিপরীত হচ্ছে হক্ব। আর হক্ব হলো ঈমান ও তাওহীদ যার মাধ্যমে মানুষ সংশোধন হতে পারে। পক্ষান্তরে কুফরী, অবাধ্যতা, ফাসেকী, যুলুম এবং সীমা লঙ্ঘনের মাধ্যমে পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। তাই মূসা ও তার সম্প্রদায় যে রীতির উপর ছিলেন তা ছিল হক্ব।

অপরদিকে ফেরআউন ও তার সম্প্রদায় যে রীতি অনুসরণ করতো তা ছিল ফাসাদ (বিশৃঙ্খলা)। তারা হক্বের বিরোধিতা করতো আর হক্বকে ফাসাদ মনে করতো। এটা কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকদের চিরাচরিত স্বভাব। আর নেকলোক ও প্রমাণসহ আল্লাহর দিকে আহবানকারীদেরকে জাহিলরা মন্দ নামে ডাকতো। আর আল্লাহর একত্ব ও ইবাদতের দিকে আহবানকারী তাওহীদপন্থী মুমিনদেরকে তারা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী বলে আখ্যা দিত। জাহিল লোকদের মাঝে মন্দ নামে ডাকার প্রবণতা কিয়ামত অবধি চালু থাকবে। কাফির, অত্যাচারী ও সীমালঙ্ঘনকারীরা নেকলোকদেরকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী বলে অভিহিত করতেই থাকবে।

ফেরআউন ও তার সম্প্রদায়ের শাসনামলের প্রথম যুগ থেকে মন্দ নামে ডাকা বর্তমানেও চালু আছে। ঈমানদার ও হক্বপন্থীদেরকে মন্দ নামের উপাধী দেয়া হলে তা কখনোই তাদের ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। আর হক্বপন্থী ও দা'ঈদেরকে অনেক মন্দ নামের উপাধী দেয়া হতো। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাকে খারাপ উপাধী দেয়া হয়েছিল এবং মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহবকে খারাপ উপাধী 'খারেজী' বলে আখ্যা দেয়া হয়েছিল। তারা বলেছিল, তিনি মানুষের আক্বীদা পরিবর্তন করে

তাদেরকে কাফির বানাতে চেয়েছেন। শেষ পর্যন্ত জাহিলরা বলে শাইখদের কিতাবে তাদের সংশোধনীয় নীতির নামে অপবাদ, মিথ্যাচারীতা ও মন্দ বিষয় আছে। আর শাসকের দীনের অনুসারীদের মর্যাদাহানীর কারণে জাহিলরা হক্বপন্থীদের বিরুদ্ধে যে অপবাদ দিতো সে প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ} [الأعراف: 127]

আপনার উপাস্যগুলোকে বর্জন করে?'*(সূরা আরাফ ৭:১২৭-১২৮)*। তিনি আরোও বলেন,

{إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ} [غافر: 26]

নিশ্চয় আমি আশঙ্কা করি সে তোমাদের দীন পাল্টে দেবে অথবা সে যমিনে বিপর্যয় ছড়িয়ে দেবে *(সূরা মু'মিন ৪০:২৬)*।

(৬৫) জাহিল ও তাদের অনুসারীদের রীতি হলো মুমিন এবং যারা আল্লাহর দিকে দলীল-প্রমাণসহ এবং সঠিক পন্থায় মানুষকে আহবান করে, তাদের বিরুদ্ধে শাসকদেরকে এভাবে উদ্বুদ্ধ করা যে, শাসকশ্রেণী, তাদের দীন ও রাজনীতির বিরুদ্ধে তারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। অথচ মুমিন ও দাঈগণ তাদেরকে এমন বিষয়ে সদুপদেশ দেন ও সঠিক পথপ্রদর্শন করেন, যাতে তাদের ও রাজত্বের কল্যাণ রয়েছে। যেমনভাবে আল্লাহ তা'আলা ফেরআউনের কাহিনীতে বর্ণনা করেছেন। আর তারা ফেরআউন সম্পর্কে কুৎসা রটনা করতো না।

ফেরআউনের সংশোধন, তার রাজত্বের সংস্কার এবং প্রজাদের সংশোধনের জন্য মূসা আলাইহিস সালাম শরীকহীন একক আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিলে প্রজা সাধারণ ফেরআউনকে বলে: অচিরেই মূসা আলাইহিস সালাম ও তার দলবল আপনার বিরুদ্ধে জনসম্মুখে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। ফলে জনসাধারণের উপর আপনার কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব থাকবে না। তারা আপনার ইবাদত করা হতে আল্লাহর ইবাদতের দিকে জনগণকে ধাবিত করছে। এসব কথার মাধ্যমে ফেরআউন প্ররোচিত হয়। কেননা, ফেরআউনের ধারণা যদি মূসা আ. ও তার দলবলকে ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে তারা

জনগণকে তার প্রভুত্বে স্বীকৃতি দেয়া ও ইবাদত করা থেকে ফিরিয়ে রাখবে। একারণে জনসাধারণকে সে বলেছিল,

{أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى} [النازعات: 24]

‘আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ রব’ *(সূরা নাযি‘আত ৭৯:২৪)*। অন্য আয়াতে আছে,

{مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي} [القصص: 38]

আমি ছাড়া তোমাদের কোন ইলাহ আছে বলে আমি জানি না *(সূরা কৃছাছ ২৮:৩৮)*।

তাই রসূলগণের দাওয়াতকে বিশৃঙ্খলা বলে ও কুফরীকে সঠিক মনে করে জাহিলরা অপব্যাখ্যা করতো। এটিই মূলতঃ বাস্তব বিষয়াদীর পরিবর্তন এবং শাসক ও প্রজার প্রতারিত হওয়ার অন্তর্ভুক্ত বিষয়। বর্তমানে অধিকাংশ শ্রেণীই এ নিকৃষ্ট শয়তানী কর্মে তৎপর, যারা মানুষকে হাবিয়া নামক জাহান্নামের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আর তারা সৎলোকদের বিরোধিতা করছে, বাস্তবতাকে মিথ্যায় পরিণত করছে এবং ক্ষমতার মাধ্যমে প্রতারিত হচ্ছে। এরাই হলো নিকৃষ্ট ব্যক্তিবর্গ যারা দায়িত্বশীলদের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং সদুপদেশ গ্রহণে বাঁধা দেয়।

হে আল্লাহ! তুমি মুসলিমদের শাসক ও তাদের দায়িত্বশীলদের সংশোধন করো। আর তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করো।

(৬৬) শাসকের উপাস্যের মর্যাদাহানীর কারণে জাহিল কর্তৃক হক্বপন্থীদেরকে পরিত্যাগ করার বিষয়টি আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এটি সে বিষয় যা ফেরআউন সম্প্রদায়ের ঘটনা সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা আয়াতে উল্লেখ করেছেন। যেমন ফেরআউনের সম্প্রদায় বলেছিল, আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ} [الأعراف: 127]

'আপনি কি মূসা ও তার জাতিকে ছেড়ে দেবেন যাতে তারা যমীনে ফাসাদ করে এবং আপনাকে ও আপনার উপাস্যগুলোকে বর্জন করে?' *(সূরা আরাফ ৭: ১২৭)*।

অর্থাৎ জনগণের সামনে আপনার প্রভুত্ব ও আপনার জন্য তাদের ইবাদত সাব্যস্ত হবে। তারা বলতো, পৃথিবীতে আপনার মর্যাদা ও মহানত্ব আছে। যদি আপনি তাদেরকে ছেড়ে দেন তাহলে তারা মানুষকে আল্লাহর দিকে আহবান করবে। ফলে তারা আপনার মর্যাদাহানী করে জনগণের সম্মুখে আপনাকে হেয় প্রতিপন্ন করবে। তাই আপনার প্রভাব ও ক্ষমতা বহাল থাকার কারণে আপনি তাদের বিরূদ্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্যোগ নিন। এটাই ফেরআউনের জন্য প্রতারণা ও তার ধ্বংসের কারণ।

হায় সুবহানাল্লাহ! জাহিলরা আকাশ ও পৃথিবীর প্রভু মহান আল্লাহর মর্যাদাহানী করছে, অথচ তারা নিজেদেরকে দোষী মনে করছে না। বরং মূসা আলাইহিস সালাম ও তার জাতি ফেরআউন ও তার সম্প্রদায়কে সদুপদেশ দিলে তারাই তাদেরকেই দোষারোপ করে। অথচ মূসা আলাইহিস সালাম ও তার দলবল তাদেরকে কল্যাণ ও মুক্তির পথ দেখিয়েছেন।

শাসক ফেরআউনের ক্ষমতা কি বহাল ছিল, সে কি সংশোধন হয়েছিল?! নিকৃষ্ট শ্রেণীর দায়িত্বশীলরা সর্বদা এরকমই করে থাকে। এ জন্য কল্যাণকামী নেক ব্যক্তিবর্গদের গ্রহণ করা ও নিকৃষ্ট দায়িত্বশীল, ধ্বংসের নীতিনির্ধারক এবং ভ্রান্ত চিন্তাশীলদের ব্যাপারে সতর্ক হওয়া শাসকদের উপর আবশ্যক। তারা কেবল হাবিয়া নামক জাহান্নামের দিকেই তাদেরকে পথ দেখায়। যেমনভাবে ফেরআউনের দায়িত্বশীলদের ক্ষেত্রে ঘটেছিল। তারা ফেরআউনকে ধ্বংস ও বিনাশের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। আর ফেরআউন ও তার হক্ব গ্রহণের মাঝে তারা অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল।

অন্যদিকে দীন পরিবর্তনের আশঙ্কায় জাহিলরা হক্বপন্থীদেরকে পরিত্যাগ করতো। যেমন আল্লাহ তা'আলা ফেরআউন সম্পর্কে বলেন,

{إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ} [غافر: 26]

নিশ্চয় আমি আশঙ্কা করি সে তোমাদের দীন পাল্টে দেবে অথবা সে যমিনে বিপর্যয় ছড়িয়ে দেবে *(সূরা মূ'মিন ৪০:২৬)*।

শাসকের দীনের মর্যাদাহানীর কারণেও তারা হক্বপন্থীদেরকে পরিত্যাগ করতো। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ} [الأعراف: 127]

আপনাকে ও আপনার উপাস্যগুলোকে বর্জন করে?' *(সূরা আরাফ ৭: ১২৭)*।

মূসা আলাইহিস সালাম ও তার দাওয়াতের ব্যাপারে এ দু'টি সমস্যা ফেরআউনের মাঝে বিদ্যমান ছিল। ফেরআউন মূসা আলাইহিস সালাম এর দাওয়াত কবুল করা হতে জনগণকে সতর্ক করে এবং সে প্রজাদের উপদেশের জন্য বিক্ষোপ সমাবেশ করে। দীন ও দুনিয়ার (صلاح) ছালাহ তথা শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য জনগণকে সে উপদেশ দেয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ} [غافر: 26]

সে যমিনে বিপর্যয় ছড়িয়ে দেবে *(সূরা মূ'মিন ৪০:২৬)*। যেমন ফেরআউনের অনুসারীরা বলেছিল,

{أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ} [الأعراف: 127] ،

'আপনি কি মূসা ও তার জাতিকে ছেড়ে দেবেন যাতে তারা যমীনে ফাসাদ করে (সূরা আরাফ ৭:১২৭)।

(৬৭) সৎলোকদেরকে তারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী বলে অভিহিত করতো। ফাসাদ সৃষ্টি করাই জাহিলদের নিকট তাওহীদ এবং এক আল্লাহর ইবাদত হিসাবে স্বীকৃত। আর এখানে (صلاح) ছালাহ তথা সংশোধন বলতে শিরককে বুঝানো হয়েছে। কেননা, যখন ফাসাদ সৃষ্টি হতো, তখন জাহিলরা হক্বকে বাতিল এবং বাতিলকে হক্ব মনে করতো। কে দীনকে পরিবর্তন করে পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করেছিল? জবাব হলো ফেরআউনই কুফরী ও শিরকের মাধ্যমে তাওহীদের দীনকে পরিবর্তন করেছিল।

পক্ষান্তরে মূসা আলাইহিস সালাম এমন সঠিক দীনের দিকে মানুষকে দাওয়াত দিতেন, যে দীনের জন্য আল্লাহ তা'আলা জিন ও মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন, তা মানুষের জন্য শৃঙ্খলাপূর্ণ। কেননা, শরীকহীন এক আল্লাহর ইবাদত ছাড়া পৃথিবীতে শৃঙ্খলা বজায় থাকবে না। এটাই পৃথিবীবাসীর জন্য শৃঙ্খলার মাধ্যম। অপরদিকে, শিরক, কুফরী এবং পাপাচারীতার মাধ্যমে পৃথিবীতে অরাজকতা-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।

৬৮. নিজেদেরকে এমন বিষয়ে প্রশংসা করা, যা তাদের মাঝে নেই

জাহিলদের নিকট হকের আমল আছে বলে দাবি করা। যেমন আল্লাহর বাণী:

{نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا} [البقرة: 91]

আমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে আমরা তা বিশ্বাস করি *(সূরা বাক্বারাহ ২:৯১)*।

হক্বকে পরিত্যাগ করা সত্ত্বেও তারা এ দাবি করে।

....

ব্যাখ্যা: জাহিলী সমস্যা হলো হক্বকে পরিত্যাগ করা সত্ত্বেও ইয়াহুদীদের এ দাবি করা যে, তাদের নিকট হকের আমল আছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا} [البقرة: 91]

আর যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তোমরা তার প্রতি ঈমান আন। তারা বলে, আমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে আমরা তা বিশ্বাস করি *(সূরা বাক্বারাহ ২:৯১)*।

আমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে আমরা তা বিশ্বাস করি *(সূরা বাক্বারাহ ২:৯১)*। এর অর্থ: বনী ইসরাঈল বংশের নাবীগণের মধ্যে হতে আমাদের রসূলগণের উপর যা নাযিল হয়েছে (আমরা তার উপর আমল করি)। কেননা, এ আয়াত ইয়াহুদীদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا} [البقرة: 91]

আমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে আমরা তা বিশ্বাস করি *(সূরা বাক্বারাহ ২:৯১)*।

অর্থাৎ বনী ইসরাইলের উপর যা নাযিল হয়েছে তথা তাদের রসূলগণ যা কিছু নিয়ে এসেছেন, মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিয়ে আসা বিধান তার বিরোধী না হওয়া সত্ত্বেও তারা (অন্য নাবীগণকে অস্বীকার করে)। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ}

এর বাইরে যা আছে তারা তা অস্বীকার করে *(সূরা বাক্বারাহ ২:৯১)*।

অর্থাৎ ঈসা ও মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর যা :নাযিল তা ব্যতীত (অন্যকে বিশ্বাস করে)। আল্লাহর বাণী

{وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِمَا مَعَهُمْ} [البقرة: 91]

তা সত্য, তাদের সাথে যা আছে তার সত্যায়নকারী *(সূরা বাক্বারাহ ২:৯১)*।

ঈসা আলাইহিস সালাম ও মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা তাদের নাবীগণের নিয়ে আসা হকের অনুকূল এবং তারা তাদের কিতাবে যে বিকৃতি, মিথ্যা ও ভ্রান্ত মতবাদ যোগ করেছে (তাদের দীন) তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে। এটি একটি দিক।

দ্বিতীয় দিক হলো এ কথায় (নাযিলকৃ বিষয়ে বিশ্বাস করার ব্যাপারে) তারা সত্যবাদী নয়। এর প্রমাণ হলো যে, তাদের দ্বারা পাপাচারীতা ঘটেছিল যা

আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। (তথা নাবীগণকে তারা হত্যা করেছিল)। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন,

{قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ} [البقرة:92،91]]

বল, তবে কেন তোমরা আল্লাহর নাবীদেরকে পূর্বে হত্যা করতে, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক? *(সূরা আল বাক্বারাহ ২:৯১-৯২)।*

তারা প্রত্যাখ্যাত, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দু'বার প্রত্যাখ্যান করেছেন।

প্রথমত: মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তা মূসা আলাইহিস সালাম এর নিয়ে আসা আল্লাহর একত্ব, একমাত্র তার ইবাদত করা এবং অন্যের ইবাদত না করার বিধানের বিরোধী নয়। বরং তা এসব বিষয়ের সত্যায়ণকারী।

দ্বিতীয়ত: তারা যে,নাবীগণকে বিশ্বাস করার দাবি তুলে এ ব্যাপারে তারা সত্যবাদী নয়। যেহেতু তারা বাছুর পূজা করতো এবং নাবীগণকে তারা হত্যা করেছিল। তাদের কথা:

{سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا} [البقرة: 93]

আমরা শুনলাম এবং অমান্য করলাম *(সূরা আল বাক্বারাহ ২:৯৩)।*

আল্লাহ তা'আলা তাদের নিকট থেকে যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন তারা তা পূর্ণ করেনি। আমার অথবা ইমামের মাযহাবে যা আছে আমি তার উপরই আমল করবো, মানুষের এ ধরণের কথা বলাই নিকৃষ্ট পক্ষপাতিত্ব বলে গণ্য। কেননা, নিজ অথবা অন্য ইমামের মাযহাবে যে হক্ব আছে তা অনুসরণ করা মুসলিমের উপর আবশ্যক। সে কেবল হক্বকেই গ্রহণ করবে এবং নিকৃষ্ট পক্ষপাতিত্ব করবে না।

৬৯-৭০. আল্লাহর বিধিবদ্ধ ইবাদত কম-বেশি করা

ইবাদতে বৃদ্ধি করা যেমন আশুরার দিনের কর্মকান্ড আর ইবাদতে কম করা যেমন আরাফার ময়দানে অবস্থান ত্যাগ করা।

....

ব্যাখ্যা: ইবাদতে বৃদ্ধি করা: যেমন জাহিলরা আশুরার দিনে তথা মুহাররম মাসের দশম দিনে বাড়াবাড়ি মূলক কর্মকান্ডে লিপ্ত হয় অথচ এ দিনে এক বড় ঘটনার সূত্রপাত হয়েছে, তা হলো ফেরআউন ও তার সম্প্রদায় সমুদ্রে নিমোজ্জিত হয়। অপরদিকে মূসা আলাইহিস সালাম ও তার জাতি মুক্তি লাভ করেন। আর এ দিনেই মিথ্যার বিরূদ্ধে হক্বকে সাহায্য করা হয় এবং আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা আদায় স্বরূপ মূসা আলাইহিস সালাম এ দিনে সিয়াম পালন করতেন। আর এ সিয়াম পালন করার রীতি মুসলিমদের জন্য শরী'আত সম্মত। কেননা, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় হিজরতের পর তিনি ইয়াহুদীদেরকে এ দিনে সিয়াম পালন করতে দেখে তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, এ দিনে তোমরা কেন সিয়াম পালন করো? জবাবে তারা বলে, এটি এমন দিন যে দিনে মূসা আলাইহিস সালাম ও তার জাতি মুক্তি লাভ করেন এবং ফেরআউন ও তার সম্প্রদায় ধ্বংস হয়। মূসা আলাইহিস সালাম সিয়াম পালন করতেন তাই আমরাও তার সিয়াম পালন করি। তখন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"نحن أحق بموسى منكم"

মূসা আলাইহিস সালাম এর ব্যাপারে তোমাদের চেয়ে আমরাই বেশি হক্বদার।[৪৮] অতঃপর তিনি এ সিয়াম পালনের নির্দেশ দেন এবং ইয়াহুদীদের বিপরীতে এ সিয়ামের পূর্বে (৯ম, ১০ম) অথবা পরের একদিন (১০ম, ১১শ) মোট দু'টি সিয়াম পালনের আদেশ করেন।

---

৪৮. ছ্বহীহ বুখারী হা/২০০৪,৩৯৪২,৩৯৪৩ মুসলিম হা/১১৩০।

তাই আশুরার দিনে সিয়াম পালন করা শরীয়ত সম্মত। কিন্তু জাহিলরা এ দিনে সিয়াম পালনের ব্যাপারে অতিরিক্ত কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়। তাই ইয়াহুদীরা এ দিনকে ঈদের দিন হিসাবে নির্ধারণ করে তাদের ঘড়-বাড়ি, সন্তানাদি ও স্ত্রীদেরকে সজ্জিত করে তুলে এবং দিনটিকে ঈদের দিন গণ্য করে। এভাবে তারা শরী'আতের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে। তাই আশুরার দিনে সিয়াম পালনের সাথে অতিরিক্ত কিছু করা জাহিলী কর্ম। অনুরূপভাবে রাফেযীরাও এ দিনকে শোক, মাতম ও বিলাপের দিন হিসাবে গণ্য করে অতিরিক্ত কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়। কেননা, এ দিনে হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে হত্যা করা হয়েছে।

অপরদিকে জাহিলদের ইবাদতের কমতি হলো যেমন হজ্জের ক্ষেত্রে তাদের দ্বারা যা কিছু ঘটে। জাহিলী যুগে তারা হজ্জ পালন করতো, এজন্য যে, এটা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর দীনের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু হজ্জ পালনের সময় তারা অনেক পরিবর্তন করে এবং শিরকী কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা আরাফায় অবস্থান করা বিধিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু তারা আরাফায় অবস্থান করতো না বরং মুযদালিফায় অবস্থান করতো। এটাই ইবাদতের কমতি। নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হাজ্জ পালন করতেন তারা ধারণা করতো যে, তিনি তাদের সাথে মুযদালিফায় অবস্থান করবেন। অতঃপর নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরাফা অতিক্রম করে সেখানে অবস্থান করেন। আর ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর আদর্শের উপর হজ্জ পালন করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ}[البقرة: 199]

অতঃপর তোমরা প্রত্যাবর্তন কর, যেখান থেকে মানুষেরা প্রত্যাবর্তন করে *(সূরা বাক্বারাহ ২:৯৯)*।

অর্থাৎ আরাফা হতে (প্রত্যাবর্তন করো)। মুশরিকদের মুযদালিফায় অবস্থানের ব্যাপারে তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। অনুরূপভাবে তারা তালবিয়া পাঠেও অতিরিক্ত কথা যোগ করতো, তাদের তালবিয়া হলো:

(إلا شريكاً هو لك. تملكه وما ملك)

ইল্লা শারীকান হুয়া লাকা, তামাল্লাকুহু ওয়ামা মুলক।

এ সবই হচ্ছে ইবাদতের মাঝে কমতি। এ সব কিছু জাহিলী দীনের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে যারা দীনের মাঝে অতিরিক্ত কিছু সংযোজন করে তারাও জাহিলী দীনের উপরই রয়েছে। তাই বিদ‘আত ও কুসংস্কার সবই জাহিলী দীনের অন্তর্ভুক্ত।

৭১. আল্লাহভীতির দোহাই দিয়ে আল্লাহ্র ওয়াজিব বিষয়গুলো বর্জন করা

আল্লাহ ভীতির অন্তর্ভুক্ত ওয়াজীব পরিত্যাগ করা।

....

ব্যাখ্যা: অর্থাৎ ওয়াজিব ছেড়ে দেয়ার মাধ্যমে তারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে চাইতো। যেমন আরাফায় অবস্থানের পরিবর্তে মুযদালিফায় অবস্থান করা। তারা ধারণা করতো যে, এটাই আল্লাহ ভীতি। কেননা, তারা ছিল হেরেমের অধিবাসী, তাই আরাফার দিকে তারা গমন করতো না। কারণ আরাফা হলো তাদের ইহরাম থেকে মুক্ত হওয়ার জায়গা। তাই সতর্ক হয়ে এ হক্বকে তারা বর্জন করতো। এটাও জাহিলী কর্ম। আমরা আল্লাহ তা‘আলার নিকট এ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

এরূপই সতর্কতা স্বরূপ জাহিল কর্তৃক হক্ব বর্জন করার আরো দৃষ্টান্ত হলো যে, তারা নগ্ন হয়ে কাবা তাওয়াফ করতো এবং লজ্জাস্থান ঢেকে রাখার হক্বকে তারা বর্জন করতো, যা (ঢেকে রাখা) আল্লাহ ভীতির অন্তর্ভুক্ত। তারা বলতো,

لا نطوف بثياب عصينا الله فيها

আমরা পোষাক পরিহিত অবস্থায় তাওয়াফ করবো না, তাতে আমরা আল্লাহর অবাধ্য হয়ে যাব।[৪৯]

অনুরূপ যে কেউ ইবাদতের কোন অংশ সতর্কতা স্বরূপ বর্জন করে, সে ঐ ব্যক্তির মতই যে লোকদের ইবাদত দেখা এবং ইবাদতের কথা শ্রবণের ভয়ে যাকাত দেয় না এবং জামা'আতের সাথে মসজিদে ছ্বালাত আদায় করে না। যেমন আমরা তাদের কতিপয়ের নিকট থেকে শুনে থাকি। অথবা তারা দীনি জ্ঞান অর্জন করে না অথবা লোক দেখার শঙ্কায় ইবাদতের বিভিন্ন বিষয় ছেড়ে দেয়।

৪৯. উরওয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, জাহিলী যুগে হুমস ব্যতীত মানুষেরা নগ্ন হয়ে (বাইতুল্লাহ) তাওয়াফ করতো। আর হুমস হলো কুরাইশ ও তাদের ঔরসজাত সন্তান-সন্ততি। হুমসরা লোকদের সেবা করে সওয়াবের আশায় পুরুষ পুরুষকে কাপড় দিতো এবং সে তা পরিধান করে তাওয়াফ করতো। আর স্ত্রীলোক স্ত্রীলোককে কাপড় দিতো এবং এ কাপড়ে সে তাওয়াফ করতো। হুমসরা যাকে কাপড় দিতো না সে নগ্ন হয়ে কাবা তাওয়াফ করতো....। ছ্বহীহ বুখারী হা/১৬৬৫, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৫২/১২১৯। বুখারী কিতাবুছ ছালাতে ২ নং বাবে-পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেন। নগ্ন না হয়ে কাবা তাওয়াফ করতে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদেশ করেন। ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৩৪৭।

৭২-৭৩. পবিত্র রিযিক্ব ও সাজ-সজ্জা বর্জন করে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে চাওয়া।

পবিত্র রিজিক ও পোশাকের সাজ-সজ্জা পরিহার করে ইবাদত করতে চাওয়া।

....

ব্যাখ্যা: অর্থাৎ পবিত্র রিজিক ও পোশাকের সৌন্দর্যতা পরিত্যাগ করে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে চাওয়া। খ্রিষ্টান ও তাদের সাদৃশ্য অবলম্বী ইসলামের দিকে সম্বন্ধকারী সূফীরাই এটা করে থাকে। আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের উদ্দেশ্যে তারা পবিত্র জিনিসকে বর্জন করে। তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় না এবং পবিত্র রিজিকও গ্রহণ করে না। আর পানাহার ও পোশাক-পরিচ্ছেদের ক্ষেত্রে তারা সন্ন্যাসী জীবন যাপন করে। তারা ধারণা করে, এভাবেই আল্লাহর ইবাদত করতে হয়। এ জন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} [الأعراف: 32]

বল, কে হারাম করেছে আল্লাহর সৌন্দর্যোপকরণ, যা তিনি তার বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র রিযিক? *(সূরা আরাফ ৭:৩২)*। তিনি আরোও বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} [المائدة: 87] .

হে মুমিনগণ, আল্লাহ যে সব পবিত্র বস্তু তোমাদের জন্য হালাল করেছেন, তোমরা তা হারাম করো না এবং তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না *(সূরা আল মায়েদা ৫:৮৭)*।

অনুরূপভাবে কতিপয় হালাল চতুষ্পদ জন্তুকেও তারা হারাম মনে করে। অথচ আল্লাহ তা'আলা হালাল চতুষ্পদ জন্তু খাওয়া বৈধ করেছেন। তিনি বলেন,

{أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ} [المائدة: 1]

তোমাদের জন্য গৃহপালিত চতুস্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে *(সূরা আল-মায়েদা ৫:১)*।

জাহিলরা তাদের মূর্তির জন্য কতিপয় চতুস্পদজন্তুকে হারাম করতো। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [المائدة:87] .

হে মুমিনগণ, আল্লাহ যে সব পবিত্র বস্তু তোমাদের জন্য হালাল করেছেন, তোমরা তা হারাম করো না এবং তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না *(সূরা আল-মায়েদা ৫:৮৭)*।

সুতরাং পবিত্র জিনিসকে হারাম করা বৈরাগ্যবাদী খ্রিষ্টান ও জাহিলদের দীন। আর যে হালালকে হারাম করার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করবে, সে হবে মুরতাদ। তাই যখন কেউ (হালালকে হারাম করণের বিষয়টি) দীনের প্রতি সম্বন্ধ করে মহান আল্লাহর ইবাদত বলে গণ্য করবে, তখন এটিই হবে আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যারোপ। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের জন্য পবিত্র জিনিস বর্জন করা শরী'আত সম্মত করেননি। বরং তা উপভোগ করতে বলেছেন। তিনি বলেন,

{يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً} [المؤمنون: 51] .

হে রসূলগণ, তোমরা পবিত্র ও ভাল বস্তু হতে খাও ও সৎকর্ম সম্পাদন কর। *(সূরা আল-মু'মিনূন ২৩:৫১)*।

নাবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে একটি দল এরূপ বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছিল; ফলে তিনি তাদের উপর রাগান্বিত হন।

অপরদিকে আল্লাহ প্রদত্ত সৌন্দর্যকে পরিত্যাগ করে জাহিলদের ইবাদত করা বলতে, সৌন্দর্য বর্জন করে তথা বেশ-ভূষা ছাড়াই আল্লাহর নৈকট্য

লাভ করতে চাওয়া। যেমন নগ্ন হয়ে তারা কাবা তাওয়াফ করতো। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন,

{قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ} [الأعراف: 32]

বল, কে হারাম করেছে আল্লাহর সৌন্দর্যোপকরণ *(সূরা আল-আরাফ ৭:৩২)*।

অর্থাৎ পোশাক, সৌন্দর্যতা ও পবিত্র রিজিক বর্জনের ব্যাপারে তোমরা যা কিছু কর এ ব্যাপারে কি তোমাদের কোন দলীল আছে? কেননা, কোন জিনিস হারাম করণের জন্য দলীলের প্রয়োজন হয়। আর পোশাক-পরিচ্ছেদ ও পানাহারের মৌলিকত্ব হচ্ছে (শরী'আত অনুসারে) তা হালাল। কেননা, এসব জিনিস আল্লাহ তা'আলা বান্দার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। যেমন ছ্বহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা সুন্দর, তিনি সৌন্দর্যতা পছন্দ করেন। তাই সতর্কতা স্বরূপ পোশাক বর্জন করা দীন ইসলাম নয়।

(ইসলাম চায়) পোশাকের সৌন্দর্যতা গ্রহণ ও পবিত্র রিজিক উপভোগ করতঃ মানুষ যেন আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করে। হাদীছে বর্ণিত আছে,

إن الله يحب إذا أنعم عبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه

বান্দাকে কোন নি'আমত দান করা হলে আল্লাহ তা'আলা ঐ নে'আমতের নিদর্শন প্রকাশ পাওয়া পছন্দ করেন।[৫০]

তবে এক্ষেত্রে শর্ত হলো অপব্যয় ও নিজের খেয়াল-খুশি ছাড়াই তা হতে হবে।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিনিধি দলের মোকাবেলায় বেশি করে সৌন্দর্যতা গ্রহণ করতেন।

---

৫০. হাসান: তিরমিযী, হা/২৮২৪, ছ্বহীহ জামে, হা/১৮৮৭।

৭৪. মানুষকে ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করা

কোন জ্ঞান ছাড়া মানুষকে দাও‘আত দেয়াই হচ্ছে ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান।

....

ব্যাখ্যা: ইলম-জ্ঞান ছাড়া মানুষকে আল্লাহর দিকে দা‘ওয়াত দেয়া জাহিলী কর্ম। কেননা, আল্লাহ তা‘আলা প্রমাণ, প্রজ্ঞা, সুন্দর উপদেশ ও উত্তম পন্থায় তর্কের মাধ্যমে তার পথে দা‘ওয়াত দিতে আদেশ দেন। ভ্রষ্টতার দিকে মানুষকে আহবান করা অর্থাৎ হক্বের বিরূদ্ধে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা জাহিলী কর্ম। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ} [العنكبوت: 12]

আর কাফিররা মু’মিনদেরকে বলে, তোমরা আমাদের পথ অনুসরণ কর, তাহলে আমরা তোমাদের পাপ বহন করতে পারব (সূরা আনকাবূত ২৯:১২)।

কাফিররা মানুষকে শিরকের দিকে আহ্বান করে, দলীল-প্রমাণ ব্যতিরেকেই তারা হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করণের দিকে আহবান করে, আর তারা এমন বিষয়াদির দিকে দা‘ওয়াত দেয়, যে ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলা কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি, সুতরাং তারাই ভ্রষ্ট দা‘ঈ।

আর হক্বপন্থী দা‘ঈ তারাই যারা আল্লাহ তা‘আলার নাযিলকৃত বিধান ও শরী‘আতের দিকে মানুষকে দা‘ওয়াত দেয়। বর্তমানে ভ্রষ্ট দা‘ঈ তারাই যারা মানুষকে শিরক, মাযার ও কবর পূজার দিকে আহবান করে; দীনের মধ্যে বিদ‘আতী কাজ ও নব আবিষ্কৃত বিষয়ের দিকে দা‘ওয়াত দেয়, যে বিষয়ে আল্লাহ কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। তাদের লিখনী, রচনা ও বক্তব্যের মাধ্যমে বিদ‘আত ও নব আবিষ্কৃত বিষয়ই জাগ্রত হয়। তারা মন্দের বৈধতা, ফাসেকী ও অবাধ্যতার দিকে আহবান করে, এরূপ সকল দা‘ঈ ভ্রষ্ট।

আল্লাহ তা‘আলা ঐ সব দা‘ঈ ও তাদের পদ্ধতি সম্পর্কে সতর্ক থাকতে বলেছেন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ} [آل عمران: 149]

হে মুমিনগণ, যদি তোমরা কাফিরদের আনুগত্য কর, তারা তোমাদেরকে তোমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে ফিরে যাবে *(সূরা আলে-ইমরান ৩:১৪৯)*। তিনি আরোও বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقاً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ} [آل عمران: 100]

হে মুমিনগণ, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে, তোমরা যদি তাদের একটি দলের আনুগত্য কর, তারা তোমাদের ঈমানের পর তোমাদেরকে কাফির অবস্থায় ফিরিয়ে নেবে *(সূরা আলে-ইমরান ৩:১০০)*। তিনি আরো বলেন,

{أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ} [البقرة: 221]

তারা তোমাদেরকে আগুনের দিকে আহ্বান করে আর আল্লাহ তোমাদেরকে জান্নাত দিকে আহ্বান করেন *(সূরা আল বাক্বারাহ ২:২২১)*। তিনি আরো বলেন,

{وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ} [الأنعام: 116]

আর যদি তুমি যারা যমীনে আছে তাদের অধিকাংশের আনুগত্য কর, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। তারা শুধু ধারণারই অনুসরণ করে এবং তারা শুধু অনুমানই করে *(সূরা আল আন‘আম ৬:১১৬)*।

আল্লাহ তা‘আলা বর্ণনা করেন যে, প্রাচীন ও আধুনিক উভয় যুগে ভ্রান্ত মতাদর্শের উপর কাফিররা মতভেদে লিপ্ত আছে। সর্বযুগে ও স্থানে তারা মানুষকে ভ্রষ্টতার দিকেই আহবানে তৎপর। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً} [النساء: 89]

তারা কামনা করে, যদি তোমরা কুফরী করতে যেভাবে তারা কুফরী করেছে। অতঃপর তোমরা সমান হয়ে যেতে *(সূরা আন নিসা ৪:৮৯)*।

৭৫. জেনে-বুঝে কুফরীর দিকে মানুষকে দা'ওয়াত দেয়া

জানা সত্ত্বেও কুফরীর দিকেই দা'ওয়াত দেয়া।

....

ব্যাখ্যা: এটি ভ্রষ্ট দা'ঈর আরেকটি শ্রেণীবিভাগ। যারা বাড়াবাড়ি ও বিরোধিতার উদ্দেশ্যে জেনে-বুঝে মানুষকে হক্ব থেকে বিমুখ করার দা'ওয়াত দেয়। আর প্রথম প্রকার দা'ঈ হলো যারা হক্ব না জেনে মানুষকে মিথ্যার দিকে আহবান করে। এ উভয় প্রকার দা'ঈ মানুষের জন্য বিপজ্জনক। অথচ তারা মানুষকে বলে না যে, তোমরা কুফরী কর। কেবল তাদের সাজানো পদ্ধতি তারা মানুষের কাছে প্রচার করে, যা বাহ্যিকভাবে সুন্দর মনে হলেও তা মূলতঃ কুফরী। আর ভ্রষ্ট দা'ঈরা এরূপই হয়। ইবলিশ নূহ আলাইহিস সালাম এর সম্প্রদায়ের নিকট এসে দেখলো যে, নেকলোকদের মৃত্যুতে তারা শোকাহত। সে তখন তাদের নিকট তার দীনি পদ্ধতি উপস্থাপন করে বললো, তোমরা এ সব নেকলোদের প্রতিচ্ছবি তৈরি করো, কারণ তা দেখলে যেন তাদের ইবাদতে তোমরা উদ্যমী হও, তাদের অবস্থা, সততা এবং দীন স্বরণ করতে পার। ফলে তারাও তোমাদের ইবাদতে খুশি হবে। এভাবে সে তাদেরকে উপদেশ দেয় এবং তার দীনি পদ্ধতি তুলে ধরে। আর ছবিগুলো অবশেষে মূর্তিতে পরিণত হবে; ইবলিশের এটাই ছিল ইচ্ছা।

পরে ছবিগুলোকে মূর্তি বানানো হয়। বিদ্বান এবং এ (মূর্তি নির্মাতা) সম্প্রদায় মারা গেলে মূর্খ সম্পদায়ের আগমন ঘটে। তাদের কাছে শয়তান

এসে বলে, তোমাদের পূর্বপুরুষরা ইবাদতের জন্যই এসব মূর্তি নির্মাণ করতো। এ সব মূর্তির নামেই তারা বৃষ্টি প্রার্থনা করতো। অতঃপর তারা আল্লাহ তা'আলাকে বাদ দিয়ে মূর্তিগুলোর ইবাদত করে। ঠিক এরূপই ভ্রষ্ট দা'ঈরা মানুষকে প্রকাশ্যে খারাপ কর্মের দা'ওয়াত দেয় না। বরং তারা মানুষকে সাজানো পদ্ধতির মাধ্যমে দা'ওয়াত দেয়, যা তাদের নিকট উত্তম মনে হয়। ফলে অবশেষে দা'ঈর উদ্দেশ্যে অর্জিত হয়। পথ ভ্রষ্ট দা'ঈরা মানুষকে কবর পূজার মাধ্যমে শিরকের দিকে আহবান করে, তারা মানুষকে বলে না যে, তোমরা কবর পূজা কর। বরং তারা বলে, ঐসব ব্যক্তিরাই ওলী ও সৎ। আল্লাহর নিকট তাদের মর্যাদা রয়েছে। তোমরা তাদের নৈকট্য অর্জন করবে, যাতে তারা তোমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়। আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জনে তোমাদের জন্য তারা মাধ্যম ও ওসীলা স্বরূপ। নেকলোকদের ভালবাসা ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে তাদেরকে মাধ্যম ও ওসীলা হিসাবে গ্রহণ করার পদ্ধতি নিয়ে ভ্রষ্ট দা'ঈরা মানুষের কাছে আসে। অতঃপর লোকেরা এ শয়তানী ধোঁকায় পড়ে কবর ও ওলী-আউলিয়ার ইবাদত করে, ফলে আল্লাহ তা'আলার সাথে শিরকে লিপ্ত হয়।

কুফরীর দিকে আহবানকারীরা মানুষকে বিভিন্ন পন্থায় দা'ওয়াত দেয়। তাদের মাঝে কোন আনুগত্য প্রকাশ পায় না। আর দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়া তাদেরক কেউ চিনতে পারে না। এ দু'টি বিষয় থেকে স্পষ্ট হলো ভ্রষ্ট দা'ঈ দু'প্রকার:

প্রথম: কোন ইলম-জ্ঞান ছাড়াই মানুষকে দাওয়াত দেয়।

দ্বিতীয়: জেনে-বুঝে হকের বিরূদ্ধে মানুষকে দা'ওয়াত দেয়।

প্রথম প্রকার দা'ঈ হচ্ছে ভ্রষ্ট (ضال), আর দ্বিতীয় প্রকার দাঈ হচ্ছে ফাসিক (فاسق)।

৭৬. শিরক প্রতিষ্ঠিত করতে ও হক্ব দমনে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকা

মারাত্মক ষড়যন্ত্র; যেমন নূহ আলাইহিস সালাম এর সম্প্রদায়ের কর্ম।

....

ব্যাখ্যা: গোপনীয়ভাবে কারো অপছন্দনীয় বিষয় সম্পাদন করাই ষড়যন্ত্র। এটা দু'প্রকার: (ক) ভাল ষড়যন্ত্র (খ) মন্দ ষড়যন্ত্র।

কারও বিরুদ্ধে এমন গোপন প্রতারণা করা যা তার প্রাপ্য নয় তা সম্পাদন করাই হচ্ছে খারাপ ষড়যন্ত্র। আল্লাহ তা'আলা নূহ আলাইহিস সালাম এর জাতির ব্যাপারে বলেন,

{وَمَكَرُوا مَكْراً كُبَّاراً وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدّاً وَلا سُوَاعاً وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيراً} [نوح: 22–24]

'আর তারা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করেছে।' আর তারা বলে, 'তোমরা তোমাদের উপাস্যদের বর্জন করো না; বর্জন করো না ওয়াদ, সুওয়া', ইয়াগূছ, ইয়া'উক ও নাসরকে।' বস্তুত তারা অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে, আর (হে আল্লাহ) আপনি যালিমদেরকে ভ্রষ্টতা ছাড়া আর কিছুই বাড়াবেন না *(সূরা নূহ ৭১: ২২-২৪)*।

ষড়যন্ত্রকারীরা ছল-চাতুরির মাধ্যমে মানুষের ব্যাপারে যে মারাত্মক প্রতারণায় লিপ্ত হয়, তা বৃহৎ ছলনা। এ নিকৃষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করে ভ্রষ্ট দা'ঈরা মানুষকে শিরকের দিকে আহবান করে। তাদেরকে একত্বের দা'ওয়াত দেয়া হলে, তারা এ দা'ওয়াত সম্পর্কে মানুষকে সতর্ক করে বলে, তাওহীদ পন্থীরা তোমাদের নেতা হতে চায় এবং তোমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শনের ইচ্ছা করে। এভাবে তারা নিকৃষ্ট কথাকে উত্তম ও উত্তম কথাকে মন্দ বলে মানুষের নিকট প্রচার করে। এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় ও মারাত্মক ষড়যন্ত্র যা প্রাচীন ও আধুনিক ভ্রষ্ট দা'ঈদের মাঝে বিদ্যমান, যা মানুষকে হক্ব থেকে বিমুখ করে বাতিল-মিথ্যা এবং আলো থেকে অন্ধকারের দিকে ধাবিত করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: 257]

যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদের বন্ধু, তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন। আর যারা কুফুরী করে, তাদের অভিভাবক হল তাগুত। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারে নিয়ে যায়। তারা আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে *(সূরা আল বাক্বারাহ ২:২৫৭)*। তিনি আরো বলেন,

{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّاً شَيَاطِينَ الْأِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ} [الأنعام: 112]

আর এভাবেই আমি প্রত্যেক নাবীর শত্রু করেছি মানুষ ও জিনের মধ্য থেকে শয়তানদেরকে, তারা প্রতারণার উদ্দেশ্যে একে অপরকে চাকচিক্যপূর্ণ কথার কুমন্ত্রণা দেয় এবং তোমার রব যদি চাইতেন, তবে তারা তা করত না। সুতরাং তুমি তাদেরকে ও তারা যে মিথ্যা রটায়, তা ত্যাগ কর *(সূরা আল-আন'আম ৬:১১২)*।

অর্থাৎ তুমি তাদেরকে ও তাদের মিথ্যাকে পরিত্যাগ কর। আর তাদেরকে তুমি ভ্রূক্ষেপ করবে না। এখানে ভ্রষ্ট দা'ঈদের কথা শ্রবণ করা হতে নিষেধ করা হয়েছে, তবে বাতিল-মিথ্যা দমন করার উদ্দেশ্যে তাদের কথা বুঝে নেয়া যেতে পারে।

৭৭. আদর্শহীন ব্যক্তির অনুসরণ করা

জাহিলদের নেতা হলো পাপাচারী আলিম (عالِمٌ فاجرٌ) ও মূর্খ ইবাদতকারী (عابدٌ جاهلٌ)। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ أَوَلا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ} [البقرة: 75–78]

তাদের একটি দল ছিল যারা আল্লাহর বাণী শুনত অতঃপর তা বুঝে নেয়ার পর তা তারা বিকৃত করত জেনে বুঝে। আর যখন তারা মুমিনদের সাথে সাক্ষাৎ করে, বলে আমরা ঈমান এনেছি। আর যখন একে অপরের সাথে একান্তে মিলিত হয়, বলে তোমরা কি তাদের সাথে সে কথা আলোচনা কর, যা আল্লাহ তোমাদের উপর উন্মুক্ত করেছেন, যাতে তারা এর মাধ্যমে তোমাদের রবের নিকট তোমাদের বিরূদ্ধে দলীল পেশ করে? তবে কি তোমরা বুঝ না? তারা কি জানে না যে, তারা যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে, তা আল্লাহ জানেন? *(সূরা আল-বাক্বারাহ ২:৭৫-৭৭)*।

....

ব্যাখ্যা: ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও অন্যান্য জাহিল জাতির আদর্শ ব্যক্তি হলো পাপাচারী আলিম, যারা নিজের জ্ঞান অনুযায়ী আমল করে না, যেমন ইয়াহুদী পন্ডিতগণ। আর যে বিদ্যা ছাড়াই আমল করে, সে হলো মূর্খ ইবাদতকারী। যেমন খ্রিষ্টান সংসার বিরাগীগণ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللَّهِ} [التوبة: 31]

তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পন্ডিতগণ ও সংসার-বিরাগীদের রব হিসাবে গ্রহণ করেছে *(সূরা আত-তাওবাহ ৯:৩১)*।

অর্থাৎ তারা হারামকে হালাল ও হালালকে হারামে পরিণত করে। এ ব্যাপারে জাহিলরা তাদের অনুসরণ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [البقرة: 75]

তোমরা কি এই আশা করছ যে, তারা তোমাদের প্রতি ঈমান আনবে? অথচ তাদের একটি দল ছিল যারা আল্লাহর বাণী শুনত অতঃপর তা বুঝে নেয়ার পর তা তারা বিকৃত করত জেনে বুঝে *(সূরা আল বাক্বারাহ ২:৭৫)*।

{أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ}

তোমরা কি এই আশা করছ যে, তারা তোমাদের প্রতি ঈমান আনবে? অথচ তাদের একটি দল ছিল যারা আল্লাহর বাণী শুনত অতঃপর তা বুঝে নেয়ার পর তা তারা বিকৃত করত জেনে বুঝে অর্থাৎ আল্লাহর কালামের শব্দ ও সঠিক অর্থ জানার পরও কুপ্রবৃত্তি, উদ্দেশ্যে ও আকাঙ্খা চরিতার্থ করার জন্য কালাম পরিবর্তন করে।

যেমন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে মদিনায় ইয়াহুদী ব্যভিচারীর বিচারে ইয়াহুদীরা যা চেয়েছিল (তা নিম্নরূপ)। ইয়াহুদীদের একজন পুরুষ ও একজন মহিলা ব্যভিচার করলে ইয়াহুদীরা বলল, তোমরা এ লোক অর্থাৎ মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট চল, কেননা, তারা জানতো যে, তাওরাতে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করার বিধান আছে। তারা প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করার বিচার চায় না। মুহাম্মাদ যাতে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যার চেয়ে সহজভাবে বিচার করে দেন (তারা এটা চেয়েছিল)। অতঃপর তারা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে ব্যভিচারী ও ব্যভিচারীনির বিচার চাইল।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

"ما تجدون في التوراة على من زنى؟ " وفي رواية: "ما تجدون في التوراة في شأن الرجم" قالوا: فيها أننا نُسَوِّدُ وجوههم، ونُركبهم على حمير، ونطوف بهم في الأسواق. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلام (لأنه من أحبارهم، وقد أسلم) قال: كذبوا يا رسول الله، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم التوراة، فلما أحضروها وضع ابن صوريا أصبعه على آية الرجم، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع أصبعك، فلما رفعه إذا آية الرجم تلوح في التوراة، فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما بالحجارة حتى ماتا

তোমরা তাওরাতে ব্যভিচারীর কি বিধান পেয়েছ? অন্য রেওয়ায়েতে আছে, তাওরাতে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যার বিধান সম্পর্কে কি পেয়েছ? তারা বলল, আমরা তাদেরকে অপমানিত করবো, তাদেরকে গাঁধার পিঠে চড়িয়ে বাজারে ঘুড়াবো। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্দুল্লাহ ইবনে সালামের নিকট তাদের সম্পর্কে জানতে চাইলেন। (কেননা তিনি তাদের আলেম ছিলেন, পরে ইসলাম গ্রহণ করেছেন)। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! তারাতো মিথ্যা বলেছে। তখন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাওরাত কিতাব খুঁজলেন। অতঃপর তারা তাওরাত পেশ করলো। ইবনু সুরিয়া প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা সম্পর্কীয় আয়াতের উপর তার হাত রাখলো। আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম বললেন, তোমার হাত সরাও। সে হাত সরালে দেখা গেল প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যা করা সম্পর্কে আয়াত আছে। তখন নাবী প্রস্তর নিক্ষেপে দু'জনকে হত্যার নির্দেশ দিলেন এবং তারা মারা গেল।[৫১]

এটাই হলো ইয়াহুদী আলেমদের মাধ্যমে আল্লাহর কালামকে পরিবর্তন করা। তারা আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যারোপ করতো এবং আল্লাহর বিধানকে গোপন করতো। তাদের পরিবর্তনের উদাহরণ: আল্লাহ তা'আলা সেজদারত অবস্থায় তাদেরকে দরজা দিয়ে প্রবেশের নির্দেশ দেন এবং (حطة) হিত্তাতুন তথা 'ক্ষমা কর' এ কথা বলতে বলেন। অর্থাৎ আমাদের

---

৫১. ছ্বহীহ বুখারী, হা/৩৬৩৫, ৪৫৫৬, ৬৮১৯, ৭৫৪৩, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/১৬৯৯-১৭০০।

পাপসমূহ ক্ষমা করে দাও। অতঃপর তারা (حطة) হিত্তাতুন শব্দকে (حنطة) হিনতাতুন (গম) শব্দ দ্বারা ‘ن’ নুন বর্ণ বৃদ্ধি করে পরিবর্তন করে, যা তার কালাম নয়।

আল্লাহর কিতাবের (তথ্য) কম-বেশি করা অথবা অর্থ ছাড়া অপব্যাখ্যা করাই (التحريف) তাহরিফ বা পরিবর্তন। আর শব্দ ও অর্থগত উভয় দিক থেকেই পরিবর্তন হতে পারে। আর এভাবে যারা সঠিক অর্থ ব্যতীত কুরআন-হাদীছের অপব্যাখ্যার মাধ্যমে পরিবর্তন করে, তা মূলতঃ নিজের মাযহাব প্রতিষ্ঠা অথবা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ অথবা অর্থ উপার্জনের জন্যই করে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا} [البقرة: 76]

আর যখন তারা মুমিনদের সাথে সাক্ষাৎ করে, বলে আমরা ঈমান এনেছি *(সূরা বাক্বারাহ ২:৭৬)*।

এটাই নেফাকী (কপটতা) হিসাবে গণ্য। আর নেফাকী ও মূল রচনার পরিবর্তন করা ইয়াহুদীদের রীতি। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ} [البقرة: 78] ،

আর তাদের মধ্যে আছে নিরক্ষর, তারা মিথ্যা আকাঙ্খা ব্যতীত কিতাবের কোন জ্ঞান রাখে না এবং তারা শুধুই ধারণা করে থাকে *(সূরা বাক্বরাহ ২:৭৮)*।

ঐ সবলোকই হলো মূর্খ ইবাদতকারী যারা তাওরাত পড়ে কিন্তু এর অর্থ বুঝে না। অথচ ইয়াহুদীরা তাদেরকে আলেম হিসাবে গ্রহণ করে। তারা তাওরাত পড়ে কিন্তু তার অর্থ বুঝে না। এ সত্ত্বেও ইয়াহুদীরা তাদেরকে ইমাম হিসাবে গ্রহণ করে অথচ তারা মূর্খ। তাই আমলকারী আলেম ব্যতীত কারো অনুসরণ করা বৈধ নয়। অথচ তারাই ধার্মিক বলে গণ্য। অনুরূপভাবে মূর্খ ইবাদতকারীরা তপস্যা ও ইবাদত করলেও তাদের অনুসরণ করা বৈধ নয়। কেননা, তারা সঠিক পদ্ধতি ও হেদায়াতের উপর বহাল নেই।

৭৮. আল্লাহর ভালোবাসায় বৈপরীত্য সৃষ্টি করা

শরী'আত বর্জন করা সত্ত্বেও আল্লাহকে ভালবাসার দাবি করা। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ভালবাসার আহবান জানান। তিনি বলেন,

{قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ} [آل عمران: 31]

বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস *(সূরা আলে-ইমরান ৩:৩১)*।

....

ব্যাখ্যা: আল্লাহর আদেশ অমান্য করা সত্ত্বেও ভ্রষ্ট ইয়াহুদী ও তাদের অনুসারী কর্তৃক ভালবাসার দাবি করা।

আল্লাহর ভালবাসার নিদর্শন হচ্ছে: আল্লাহর আদেশ পালন করা। যেমন কবি বলেন,

إن المحب لمن يحب مطيع

প্রেমিক অনুগত থাকে * সে ভালবাসে যাকে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} [آل عمران: 31]

বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন *(সূরা আলে-ইমরান ৩:৩১)*।

ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা বলে,

{نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ} [المائدة: 18] ،

আমরা আল্লাহর পুত্র ও তার প্রিয়জন *(সূরা আল-মায়েদা ৫:১৮)*।

আল্লাহ তা'আলার শরী'আতের বিরোধিতা করা সত্ত্বেও তারা তাকে ভালবাসার দাবি করে। তাই এ বিরোধিতা তাদের দাবি মিথ্যা তা প্রমাণ করে। আল্লাহ তা'আলার ভালবাসার দাবির উপর তাদেরকে তিনি দলীল-

প্রমাণ পেশ করার আহবান জানান। আর এ দলীল-প্রমাণই হবে মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুসরণ করা। তাদের মিথ্যা দাবির পক্ষে তারা প্রমাণ পেশ করতে পারেনি। অনুরূপভাবে সূফীরাও আল্লাহ তা'আলাকে ভালবেসে তাদের দীন প্রতিষ্ঠা করতে চায়। আর বলে, ইবাদতই ভালবাসা। তাই আমরা জাহান্নামের ভয়ে ও জান্নাতের নি'আমত লাভের আশায় আল্লাহর ইবাদত করবো না। সূফীরা আল্লাহর শরী'আতের বিরোধিতা করা সত্ত্বেও বলে, আমরা তাকে ভালবেসেই তার ইবাদত করবো। মূলতঃ তারা আল্লাহর রসূলের আনুগত্য করে না।

পীর এবং যে সব তরিকাপন্থীরা শ্রবণ ও আনুগত্যের উপর বাই'আত গ্রহণ করে জাহিলরা কেবল তাদেরই অনুসরণ করে। জাহিলদেরকে কোন বিষয়ে তারা নির্দেশ দিলে তারা সে বিষয়ের বিরোধিতা করে না। বরং জাহিলরা বলে, গোসল দানকারীর হাতে যেমন মৃত লাশ থাকে, তেমনই মুরিদ তার পীরের সাথেই থাকে। পীর সাহেব যা পছন্দ করেন তা ব্যতীত মুরিদের কোন স্বাধীনতা নেই। কোথায় তাদের রসূলের আনুগত্য? তাদের দাবিতে তারা মিথ্যুক। একারণে ঐ সব ভালবাসার দাবিদার লোকদের বিরুদ্ধে আল্লাহ তা'আলা নিম্নের আয়াতের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} [آل عمران: 31]

বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন *(সূরা আলে-ইমরান ৩:৩১)*।

সুতরাং আল্লাহর রসূলের আনুগত্য করাই আল্লাহকে ভালবাসার নিদর্শন বলে গণ্য। যার মাঝে এ গুণ পাওয়া যাবে, আল্লাহর ভালবাসার দাবিতে সে হবে সত্যবাদী। পক্ষান্তরে যার মাঝে রসূলের আনুগত্যের গুণ পাওয়া যাবে না, সে হবে মিথ্যাবাদী। আল্লাহ তা'আলা ভালবাসার দলীল-প্রমাণ ও ফলাফল উল্লেখ করেছেন। রসূলের আনুগত্য করাই ভালবাসার দলীল-প্রমাণ। আর বান্দার জন্য আল্লাহর ভালবাসা এবং তার পাপরাশি ক্ষমা করাই হলো ফলাফল। অনুরূপভাবে যারা রসূলের ভালবাসার দাবি করে অথচ তার আনুগত্য করে না এমন প্রত্যেকেই এ ফলাফল অর্জন থেকে

বঞ্চিত। রসূলের ভালবাসার দাবিদারা তাদের পুস্তিকাদিতে বিভিন্ন বিষয়ে বিকৃতভাবে লেখালেখি করে। যেমন: (তারা বলে), তোমাদের সন্তানাদিকে তোমরা রসূলের ভালবাসা শিক্ষা দাও। অথচ দেখা যায়, তারা সন্তানাদিকে বিদ‘আত ও মিলাদের হাদীছ শিক্ষা দেয়। অথচ নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদ‘আতী কর্ম নিষিদ্ধ করেছেন। সুতরাং এভাবে তারা রসূলের ভালবাসার দাবি করে অথচ বিদ‘আত ও কুসংস্কার সৃষ্টির মাধ্যমে তার ভালবাসার বিরোধিতা করে।

৭৯. মিথ্যা আকাঙ্খার উপর নির্ভর করা

জাহিল কর্তৃক মিথ্যা আস্থার উপর আকাঙ্খা পোষণ করা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى} [البقرة: 111] .

আর তারা বলে, ইয়াহূদী কিংবা নাসারা ব্যতীত অন্য কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না *(সূরা আল-বাক্বারাহ ২:১১১)*।

....

ব্যাখ্যা: ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা মিথ্যা আস্থার উপর নির্ভর করে। তারা আল্লাহর নিকট মিথ্যা আকাঙ্খা করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে উল্লেখ করেন যে, তারা বলে, আল্লাহর বাণী:

{ لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً} [البقرة: 80]

গোনা-কয়দিন ব্যতীত আগুন আমাদেরকে কখনোই স্পর্শ করবে না *(সূরা আল-বাক্বারাহ ২:৮০)*।

জাহিলদের ধারণা মতে, গো-বৎস পূজার কারণে কয়েক দিন (জাহান্নামে থাকতে হবে)। আল্লাহ তা'আলা তাদের কথা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন,

{قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْداً فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة: 80، 81]

আর তারা বলে, গোনা-কয়দিন ব্যতীত আগুন আমাদেরকে কখনোই স্পর্শ করবে না। বল, তোমরা কি আল্লাহর নিকট ওয়াদা নিয়েছ, ফলে আল্লাহ তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ করবেন না? নাকি আল্লাহর উপর এমন কিছু বলছ, যা তোমরা জান না? হাঁ, যে মন্দ উপার্জন করবে এবং তার পাপ তাকে বেষ্টন

কণ্ডে নেবে, তারাই আগুনের অধিবাসী। তারা সেখানে হবে স্থায়ী *(সূরা আল-বাক্বারাহ ২:৮০,৮১)*। তাদের কথা:

{لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَةً} [البقرة: 80]

একথাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। যেমন সূরা আলে ইমরানে তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ} [آل عمران:23– 25] ،

তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি? যাদেরকে কিতাবের অংশবিশেষ দেয়া হয়েছে, তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের দিকে আহ্বান করা হচ্ছে, যাতে তা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে। অতঃপর তাদের একদল ফিরে যাচ্ছে বিমুখ হয়ে। এর কারণ হল, তারা বলে, গুটি কয়েকদিন ব্যতীত আগুন আমাদেরকে কখনই স্পর্শ করবে না। আর তারা যা মিথ্যা রচনা করত, তা তাদেরকে তাদের দীনের ব্যাপারে প্রতারিত করেছে। সুতরাং কি অবস্থা হবে? যখন আমি তাদেরকে এমন দিনে সমবেত করব, যাতে কোন সন্দেহ নেই। আর প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিদান পূর্ণভাবে দেয়া হবে এবং তাদেরকে যুলম করা হবে না *(সূরা আলে-ইমরান ৩: ২৩-২৫)*।

তিনি আরোও বলেন,

{لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ وَلا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيّاً وَلا نَصِيراً وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيراً} [النساء: 123، 124] .

না তোমাদের আশায় এবং না কিতাবীদের আশায় (কাজ হবে)। যে মন্দকাজ করবে তাকে তার প্রতিফল দেয়া হবে। আর সে তার জন্য আল্লাহ ছাড়া কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। আর পুরুষ কিংবা

নারীর মধ্য থেকে যে নেককাজ করবে এমতাবস্থায় যে, সে মুমিন, তাহলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি খেজুরবীচির আবরণ পরিমাণ যুলম করা হবে না *(সূরা নিসা ৪:১২৩,১২৪)*।

৮০. ব্যক্তিকেন্দ্রিক বাড়াবাড়ি

নাবী ও নেকলোকদের কবরকে সেজদার জায়গা হিসাবে নির্ধারণ করা।

....

ব্যাখ্যা: আহলে কিতাব ও অন্যান্য জাতির রীতি হলো নাবী ও নেকলোকদের কবরকে মাসজিদ নির্ধারণ করা। ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান, আরবের মুশরিক এবং ইসলামের সাথে সম্পৃক্তকারী কবর পূজারীরা সর্বদাই কবরকে মাসজিদ হিসাবে নির্ধারণ করে। তবে আহলে কিতাবরাই প্রথমে কবরকে মাসজিদ নির্ধারণ করেছিল। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد"

তোমাদের পূর্ববর্তী জাতি কবরকে মাসজিদ বানাতো। সাবধান! তোমরা আমার কবরকে মাসজিদ বানাবে না।[৫২]

অর্থাৎ তারা কবরের পাশে ছ্বলাত আদায় করতো। কেননা, কবরের পাশে ছ্বলাত আদায় করা কবর পূজার মাধ্যম বলে গণ্য। যদিও ছ্বলাত আদায়কারী আল্লাহর উদ্দেশ্যে ছ্বালাত আদায় করে। ছ্বালাত আদায়কারী কবরের পাশে ছ্বলাত আদায়ের সময় মূলতঃ কবরের নিকটেই সাহায্য কামনা করে, ফরিয়াদ করে। যেমন বর্তমান কবরের নিকট কি বলা হয়? এটাই হলো জাহিল, ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান ও অন্যান্য জাতির দীন।

হাদীছে বর্ণিত আছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

উম্মে সালমা ও উম্মে হাবীবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হাবশা এলাকায় গির্জার ভিতর মূর্তি দেখে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সংবাদ দিলেন। কেননা, তারা দু'জন তাদের স্বামীর সাথে হাবশায় প্রথম হিজরত করেন।

৫২.ছ্বহীহ মুসলিম হা/৫৩২।

তারা দু'জন ঐ সৌন্দর্য মন্ডিত গির্জা ও তার ভিতরের চিত্র কর্মের বিবরণ দিলেন। তখন ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাবী বললেন,

"أولئك قوم إذا مات فيهم الرجل الصالح، أو العبد الصالح، بنوا على قبره مسجداً، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله"

ঐ সব এলাকার লোকদের মধ্যে কোন নেকলোক মারা গেলে তার কবরের উপর তারা মাসজিদ নির্মাণ করত এবং তাদের প্রতিমূর্তি তৈরি করতো। তারাই হলো আল্লাহর নিকৃষ্ট সৃষ্টি।[৫৩]

আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত ওলী ও নেকলোকদেরকে রব হিসাবে গ্রহণ করাই জাহিলী দীন। জাহিলরা ধারণা করে যে, তারা তাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে। আর আল্লাহর নিকট তাদের জন্য সুপারিশ কামনা করবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ} [يونس: 18]

আর তারা আল্লাহ ব্যতীত এমন কিছুর ইবাদত করছে, যা তাদের ক্ষতি করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না। আর তারা বলে, এরা আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী *(সূরা ইউনূস ১০:১৮)*। তিনি আরোও বলেন,

{وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى} [الزمر: 3]

জেনে রেখ! আল্লাহর জন্যই, বিশুদ্ধ ইবাদাত-আনুগত্য। আর যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করে তারা বলে, 'আমরা কেবল এজন্যই তাদের 'ইবাদত করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে *(সূরা যুমার ৩৯:৩)*।

---

৫৩. ছহীহ বুখারী হা/৪২৭,৪৩৪,১৩৪১ ছহীহ মুসলিম হা/৫২৮।

কবরবাসীরা সৃষ্টি করে, রিজিক দেয় এবং জীবন-মৃত্যু দান করে এসব বিষয়ে অবশ্য জাহিলরা তাদেরকে বিশ্বাস করে না। তবে তারা জানে না যে, এসব কিছু আল্লাহ তা'আলার সাথেই নির্দিষ্ট। আল্লাহ এবং সুপারিশকারীদের মাঝে নেকলোদেরকে তারা মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করে। তাই নেকলোকেরা জাহিলদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে এ উদ্দেশ্যে জাহিলরা তাদের বিভিন্ন ইবাদত করে। এটাই জাহিলী দীন। আর বর্তমান কবর পূজারীরা এ রীতির উপরই রয়েছে। আমরা এ থেকে আল্লাহ তা'আলার নিকট ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি।

কবরের উপর কোন কিছু নির্মাণ করা, বাতি প্রজ্জলন করা, পর্দা টাঙানো, কবরে লেখালেখি করা এবং কবর চুনকাম করা ইত্যাদি সবই গর্হিত কর্ম যা কবরবাসীর জন্য প্রকাশ্য বাড়াবাড়ি বলে গণ্য। এ কারণে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব নিষেধ করেছেন।

৮১. নাবীগণের নিদর্শন নিয়ে বাড়িবাড়ি করা

নাবীগণের নিদর্শনকে মাসজিদ হিসাবে গ্রহণ করা। যেমন উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে।

....

ব্যাখ্যা: নাবীগণের নিদর্শনকে মাসজিদ হিসাবে গ্রহণ করা জাহিলী কর্ম। অর্থাৎ নাবীগণের ছ্বলাত আদায়ের জায়গায় জাহিলরা বরকত লাভের উদ্দেশ্যে ছ্বলাত আদায় করতো। পূর্বাপর জাহিলী কর্মের পার্থক্য:

পূর্ববর্তী জাহিলরা ব্যক্তিসত্তা নিয়ে বাড়াবাড়ি করতো আর পরবর্তীরা ব্যক্তিদের কর্মের নিদর্শন নিয়ে বাড়াবাড়ি করে। এখানে (الآثار) আল-আছার শব্দটি (أثر)

আছার এর বহুবচন। আর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেখানে বসেছেন অথবা ছ্বলাত আদায় করেছেন তা আছার (ছাপ-নিদর্শন) হিসাবে পরিচিত। দেশবাসী ঐ জায়গার অনুসরণ করে সেখানে আল্লাহ তা‘আলার ইবাদত করে।

তারা ধারণা করে যে, সেখানে ছ্বলাত আদায় করা ফযীলতপূর্ণ আমল। যেমন বর্তমানে যারা হেরাগুহায় যায়, তারা সেখানে ছ্বলাত আদায় করে এবং দু‘আ-দরূদ পাঠ করে। কেননা, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওয়াত লাভের পূর্বে হেরাগুহায় ইবাদত করতেন। অথচ নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুয়াত লাভের পর সেখানে ইবাদত করেননি এবং তার কোন ছাহাবীও হেরাগুহায় ইবাদত করতে যাননি। তারা জানতেন, এটা শরী‘আত সম্মত নয়। অনুরূপভাবে জাহিলরা ছাওর গুহায় গমন করে, যেখানে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হিজরতের পূর্বে লুকিয়ে ছিলেন। তারা সেখানে ছ্বলাত আদায় করে, ভালকাজ করে এবং কখনো টাকা-পয়সাও দান করে। এসবই জাহিলী দীন।

জাহিলরা নাবীগণের নিদর্শনকে সম্মান করে। এজন্য বাই‘আতের গাছ (যে গাছ তলায় বাই‘আত হয়েছিল) তার দিকে কতিপয় লোককে যেতে দেখে উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন, তোমাদের পূর্ববর্তীরা নাবীগণের নিদর্শন অনুসরণের কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে। অতঃপর তিনি গাছটি কেটে ফেলার নির্দেশ দেন। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শরী‘আতের জন্য এসব জায়গা নির্ধারণ করেননি। তিনি শরী‘আতের জন্য কতিপয় জায়গা নির্ধারণ করেছেন। এর মধ্যে অন্যতম হলো মাকামে ইবরাহীমে ছ্বলাত আদায় করা। এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেন:

{وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة: 125] ،

তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে ছালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর *(সূরা আল-বাক্বারাহ ২:১২৫)*।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণের জন্য মাকামে ইবরাহীমে ছ্বলাত আদায় করা শরী‘আত সম্মত। পক্ষান্তরে, হেরাগুহা, ছাওরগুহা অথবা মক্কা ও মদিনার রাস্তায় বিশ্রামের জন্য বসা শরী‘আত সম্মত, তা কোন আমল বলে গণ্য নয়। কেবল প্রয়োজন অনুসারে এসব জায়গায় বসা যেতে পারে। তাই এসব (আমল ও অভ্যাসের) ব্যাপারে পার্থক্য বুঝা আবশ্যক।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সব জায়গাকে শরী‘আতের জন্য নির্ধারণ করেননি, কেবল ঐ সব জায়গা অতিক্রম করেছেন অথবা অভ্যাসগতভাবে সেখানে বসেছেন অথবা বিশ্রাম নিয়েছেন অথবা হঠাৎ ছালাতের সময়ে ঐ জায়গায় এসেছেন এবং কোন উদ্দেশ্যে ছাড়াই ছ্বলাত আদায় করেছেন, ঐ সব জায়গাকে তিনি ছ্বলাত আদায়ের জন্য নির্ধারণ করেননি। কোন উদ্দেশ্যে ছাড়াই তিনি এসব কাজ করেছেন। কেননা, ছালাতের সময় হওয়ার কারণেই তিনি ঐ জায়গায় ছ্বলাত আদায় করেছেন। ছ্বলাত আদায়ের এ স্থানসহ পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের কোন বিশেষত্ব নেই। কেননা, এসব স্থান অনুসরণ করার মাধ্যমে বরকত লাভের উদ্দেশ্যে মানুষ মূর্তি পূজার প্রচলন ঘটাতে পারে। দূর হতে ঐ সব জায়গার কল্পনা করে সেখানে ভ্রমণ করবে। পূর্ববর্তী জাতি এসব জায়গা

কেন্দ্রীক যে শিরক করেছে তারাও হয়তো তাই করবে। আবার কখনো হয়তো সেখানে ভিত্তি নির্মাণ করা হবে। বর্তমানে যারা এসব করতে চায়, তারা বলে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে স্থান অতিক্রম করেছেন অথবা তিনি যেখানে বসেছেন সেই নিদর্শনের উপর তোমরা ভিত্তি এবং স্মৃতি সৌধ নির্মাণ কর। এসবই বাতিল কথা। নেককার সালাফীরা যা করেননি আমরা তা করবো না। যদি এসব শরী'আত সম্মত হত তাহলে আমাদের আগে ছাহাবী, তাবেঈ এবং পরবর্তীগণ তা পালন করতেন।

এসব ভ্রান্ত কর্মের কারণেই জাতি ধ্বংস হয়। তাই সম্মানিত ব্যক্তি বর্গের নিদর্শন উজ্জিবীত করার মাধ্যমে মানুষ মূর্তি পূজার দিকে অগ্রসর হয়। যেমন নূহ আলাইহিস সালাম ও পূর্ববর্তী জাতির মাঝে এরূপ ঘটেছিল। আর মানুষ তাদের দীন সম্পর্কে সচেতন; এজন্য তাদের (জাহিলিয়্যাতে লিপ্ত হওয়ার) আশঙ্কা নেই এ কথা বলা যাবে না। কেননা জাহিল জাতির আর্বিভাবের পর শয়তান তাদের সামনে মূর্তিপূজাকে সৌন্দর্যময় করে তুলেছে। এ কারণে কোন ফিতনাকে বিশ্বাস করা যাবে না। যেমন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম দু'আ করেছেন,

{وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ} [إبراهيم: 35] .

আর (স্মরণ কর) যখন ইবরাহীম বলল, হে আমার রব, আপনি এ শহরকে নিরাপদ করে দিন এবং আমাকে ও আমার সন্তানদেরকে মূর্তি পূজা হতে দূরে রাখুন *(সূরা ইবরাহীম ১৪:৩৫)*।

৮২. শিরকের নানা মাধ্যম অবলম্বন করা

কবরের উপর বাতি প্রজ্বলন করা।

....

ব্যাখ্যা: কবরের উপর বাতি প্রজ্বলন: কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে কবরের উপর প্রদীপ অথবা হারিকেন অথবা তৈলস্ফটিক যা মোমবাতির মত এসবের কোনটিই রাখা বৈধ নয়। কেননা এ সবই শিরকের উপকরণ। মৃতকে দাফনের সময় আলোর প্রয়োজন হলে প্রদীপ অথবা লণ্ঠন ব্যবহার করতে পারে। তবে কবরস্থানে বাতি অথবা আলো প্রজ্বলন করে রাখা নিষেধ। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج"

কবর যিয়ারতকারী, কবরের উপর মাসজিদ নির্মাতা ও সেখানে আলো স্থাপনকারীর উপর আল্লাহ তা'আলা অভিসম্পাত করেছেন।[৫৪]

আর সুনান গ্রন্থের হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবর যিয়ারতকারীকে অভিশাপ দিয়েছেন। এ হাদীছটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহিলাদের জন্য কবর যিয়ারত করা নিষেধ। এটা কেবল পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট।

অভিশাপ কথাটি থেকে বুঝা যায় যে, মহিলাদের কবর যিয়ারত করা কাবীরাহ গুনাহ। কবরকে মাসজিদ হিসাবে গ্রহণকারীদের উপর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিশাপ করেছেন। অর্থাৎ কবরের পাশে যারা ছ্বলাত আদায়ের ইচ্ছা করে করে অথবা মাসজিদ নির্মাণ করে অথবা যারা কবরকে আলোকিত করে যা শিরকের মাধ্যম, এ সবই গর্হিত কাজ। এসবের মাধ্যমে কবরপূজা ও আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ডাকা হয়। তাই কবরে এরূপ কর্ম পরিত্যাগ করতে হবে, যেমন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

---

৫৪. আবূ দাউদ ৩/৩৬২ হা/৩২৩৬, তিরমীযি ৩/১৩৬ হা/৩২০। আবূ ঈসা বলেন, ইবনে আব্বাসের হাদীছটি হাসান। আলবানী রহ: ছহীহ জামে গ্রন্থে হাদীছটি ছহীহ সূত্রে উল্লেখ করেছেন। হা/৫১০৯।

সাল্লাম এর যুগে ছাহাবীদের কবরে এরূ করা পরিত্যাগ করা হয়। আর কবরে বাতি প্রজ্বলন ও তার উপর ভিত্তি নির্মাণ করা যাবে না। (লাশ দাফনের) পর কবর পূর্ব অবস্থায় বহাল থাকবে। আর ভূ-পৃষ্ঠ থেকে শুধুমাত্র এক বিঘত পরিমাণ কবর উঁচু করতে হয় এবং এর উপর চিহ্ন দিতে হয়, যাতে বুঝা যায় এটি কবর। এছাড়া কবরের উপর অতিরিক্ত কিছু করা যাবে না। নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী ইবনে আবী তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে বলেন,

لا تدع قبراً مشرفاً" يعني مرتفعاً: "إلا سويته"

তুমি যেখানেই কুজো অর্থাৎ উঁচু কবর দেখবে তা ছাড়বে না, মাটিতে সমান করে দিবে।[৫৫] কেননা, জাহিলরা তাদের উদ্দেশ্যে নিয়ে উঁচু কবরের প্রতি আসক্ত হয়।

কেননা জাহিলদের মাঝে খুব তাড়াতাড়ি শিরক বিস্তার লাভ করে। আর জিন ও মানুষের মধ্যে থেকে শয়তান কবর কেন্দ্রীক কর্মকান্ডকে মানুষের সামনে সৌন্দর্যময় করে তুলে এবং এর মাধ্যমে ফিতনা ছড়ায়। কবরের মাঝে যদি দৃষ্টি নন্দন কিছু না থাকে এবং নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও অন্যদের কবরের মাঝে পার্থক্য বুঝা না যায় তখনই এ কবর ফিতনা হতে অধিক দূরে বলে গণ্য হবে। আর যখন কবরকে উদ্দেশ্যে করে সম্মান করা হবে এবং তার উপর ভিত্তি স্থাপন, সাজ-সজ্জা ও বাতি প্রজ্বলন করা হবে, তখনই এটা মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করবে। জাহিলরা বলে, কবরের সম্মানের জন্য এসব বিষয় কাজে আসে। অতঃপর তারা এসবের মাধ্যমে কবর পূজা করে।

কবরের ব্যাপারে নাবী এর পথ নির্দেশনা অনুসরণ করা ওয়াজীব। যাতে কোন বাড়াবাড়ি, ভিত্তি নির্মাণ, বাতি প্রজ্বলন, কবরে লিখন, চুনকাম করাসহ আরোও অন্যান্য কর্ম কান্ড কবরের উপর না হয়। যেমন নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে কবরগুলো এসব থেকে মুক্ত ছিল।

---

৫৫. ছহীহ মুসলিম হা/৯৬৯।

৮৩. কবরকে আঁকড়ে থাকা

কবরকে উৎসবের স্থান হিসাবে গ্রহণ করা।

....

ব্যাখ্যা: (الأعياد) আল-আ'ইয়াদ শব্দটি (عيد) ঈদ (উৎসব) এর বহুবচন। যা পুনঃপুনঃ করা হয় ও ফিরে আসে সেটাই হলো ঈদ। তা দু'প্রকার:

(ক) মৌসুমি উৎসব (**عيد زماني**): যেমন ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আদ্বহা।

(খ) স্থানগত উৎসব (**عيد مكاني**): যেখানে মানুষ বছর ব্যাপী অথবা সপ্তাহ অথবা সারা মাস ধরে ইবাদতের উদ্দেশ্যে একত্রিত হয় সেটাই হলো স্থানগত উৎসব।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"لا تجعلوا قبري عيداً" يعني: مكاناً للاجتماع حوله، والعكوف حوله، والتردد عليه، "وصلوا عليّ حيث كنتم، فإن صلاتكم تبلغني"

আমার কবরকে উৎসবে পরিণত করিও না। অর্থাৎ চতুর পার্শ্বে একত্রিত হওয়া, আঁকড়ে থাকা ও শোরগোল করার জন্য কবরস্থানকে নির্ধারণ করিও না। তোমরা যেখানেই থাক আমার উপর দরূদ পাঠ কর। তোমাদের দরূদ আমার কাছে পৌঁছে।[৫৬]

তাই কবরের পাশে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দরূদ পাঠ করার কোন রীতি নেই। বরং পূর্ব অথবা পশ্চিম দিগন্তে যেখানেই থাক রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দরূদ পাঠ করবে।

---

৫৬. আবূ দাউদ, হা/২৫৪২, আলবানী রহ, হাদীছটি জামে গ্রন্থে ছহীহ সূত্রে উল্লেখ করেছেন। হা/৭৬৬২।

অর্থাৎ যে কোন জায়গা থেকে তোমরা দরূদ পাঠ কর, তার কাছে তা পৌঁছে যায়। অনর্থক বেশি বেশি কবর যিয়ারত করা ও কবরের পাশে বসা উৎসবের অন্তর্ভুক্ত। এটা শিরকের দিকে ধাবিত করে। তাই জাহিলরা নেকলোকদের কবরকে উৎসব হিসাবে গ্রহণ করে। তারা কবরের চারপাশে একত্রিত হয়ে অবস্থান করে। বর্তমানে সব জায়গা থেকে বেদুঈন ও অন্যান্যদের কবরের নিকট যিয়ারত কারীরা আসে এবং কবরের পার্শ্বে তাবু টানিয়ে বসে থাকে। সেখানে তারা পশু যবেহ করে আর অনেক দিন যাবত কবরের পার্শ্বে থেকে যায়। এটাই হলো জাহিলী দীন।

যেহেতু রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবরের পার্শ্বে একত্রিত হয়ে বসা এবং সেখানে শোরগোল করা নিষেধ; তাই অন্যের কবরের পার্শ্বে এমনটি করা কিভাবে বৈধ হতে পারে? কেননা, এটি শিরকের মাধ্যম। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো যে, সে বুওয়ানা নামক স্থানে উট কুরবানী করার মানত করেছে এ ব্যাপারে তার মতামত কি। তখন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন,

هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد." قالوا: لا، قال: "هل كان فيها عيد من أعيادهم – أي اجتماع – يجتمعون فيه؟ " قالوا: لا، قال: "أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم"

সেখানে কি জাহিলদের কোন মূর্তি আছে যার পূজা করা হয়? তারা বলল, নেই। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, সেখানে কি তাদের কোন উৎসব পালন করা হয়? অর্থাৎ জাহিলরা কি সেখানে একত্রিত হয়? তারা বলল, হয় না। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তা নাহলে তোমার মানত পূর্ণ কর। কেননা, আল্লাহর অবাধ্যতায় কোন মানত পূর্ণ করার বিধান নেই। আর আদম সন্তান যে বিষয়ের মালিক নয় তা পূর্ণ করারও নিয়ম নেই।[৫৭]

---

৫৭. ছ্বহীহ: আবূ দাউদ হা/৩৩১৩।

প্রমাণ: রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা হলো কবরে কি জাহিলদের কোন উৎসব হয়? অর্থাৎ স্থানগত উৎসব হয় কিনা? এ কথাই প্রমাণ করে যে, ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট কোন স্থান নির্ধারণ করা বৈধ নয়। তবে আল্লাহ ও তার রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নির্ধারণ করেছেন তা ব্যতীত। যেমন: মাসজিদ ও হাজ্জের নিদর্শনসমূহ, এছাড়া পৃথিবীর সব জায়গা সমান। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً

যমীনকে আমার জন্য পবিত্র ও ছ্বলাত আদায়ের উপযোগী করা হয়েছে।[৫৮]

৫৮. ছ্বহীহ বুখারী, হা/৩৩৫, ৪৩৮, ছ্বহীহ মুসলিম, হা/৫২১, ৫২২,৫২৩।

৮৪. কবরের কাছে যবেহের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে চাওয়া

কবরের নিকট যবেহ করা।

....

ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2]

তোমার রবের উদ্দেশ্যই ছ্বলাত পড় এবং রক্ত প্রবাহিত কর *(সূরা কাওছার ১০৮:২)*। তিনি আরোও বলেন,

{مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الأنعام: 161-162]

ইবরাহীমের আদর্শ ছিল একনিষ্ঠ এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। বল, নিশ্চয় আমার ছ্বলাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু আল্লাহর জন্য, যিনি জগতসমূহের রব *(সূরা আল আন'আম ৬:১৬১,১৬২)*।

সুতরা বুঝা গেল যবেহ করা আল্লাহর ইবাদত।

কবরের নিকটে যবেহ করা: কবরের সম্মানের উদ্দেশ্যে যবেহ করা বড় শিরক। আল্লাহর সম্মানার্থে শরী'আত সম্মত মনে করে কবরের নিকটে যবেহ করা বিদ'আত এবং এটা শিরকের মাধ্যম। তাই কবরের নিকটে যবেহ করা বৈধ নয়। যদিও কবরের নিকট যবেহে বিশ্বাস পোষণ করা হয় না, কেবল আল্লাহর উদ্দেশ্যেই যবেহ করা হয়, তবুও কবরের পাশে যবেহ করা যাবে না। কেননা, কবরের পাশে পশু যবেহে মানুষ অভ্যস্ত হলে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত তারা কবরের ইবাদতের দিকে ঝুকে পড়বে। অনুরূপভাবে জিনের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য তার উদ্দেশ্যে যবেহ করা অথবা তার মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণ করা শিরক।

অপরদিকে খাওয়ার উদ্দেশ্যে অথবা মেহমানকে সম্মান করা এবং আল্লাহর নাম নিয়ে পশু যবেহ করাতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা, এটা মানুষের অভ্যাস, যা (সাধরণত) ইবাদত নয়। পক্ষান্তরে, কুরবানী ও আক্বীকার পশু এবং ইবাদতের উদ্দেশ্যে যে পশু যবেহ করা হয়, তা আল্লাহ তা'আলার ইবাদত হিসাবে গণ্য। কোন সৃষ্টির সম্মান অথবা তার ইবাদতের সম্মানের উদ্দেশ্যে যবেহ করা যাবে না এবং কোন মানুষের কবরের নিকটেও যবেহ করা যাবে না। কেননা, এটা ঐ কবরের ইবাদতের দিকে ধাবিত করে।

৮৫-৮৬. সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের নিদর্শন সংরক্ষণ করা

সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের নিদর্শন সমূহের মাধ্যমে বরকত লাভ করা। যেমন দারুন নাদওয়া, যার অধিনে এর কর্তৃত্ব ছিল তাকে নিয়ে গৌরব করা। যেমনভাবে হাকিম ইবনে হিযামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল; তুমি কি কুরাইশ বংশের সম্মান বিক্রি করে দিয়েছ?! তিনি জবাবে বলেছিলেন, কেবল তাক্বওয়া না থাকলেই সম্মান চলে যায়।

....

ব্যাখ্যা: মর্যাদাবান আলেম অথবা শাসক অথবা নেতাদের নিদর্শনকে সংস্কার ও সংরক্ষনের মাধ্যমে তা উজ্জিবীত করে সেগুলোকে সম্মান করা।

এ ধরণের কর্মকান্ডই শিরকের মাধ্যম যা জাহিলী দীনের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, পরবর্তী জাতি অথবা শয়তান এসে বলে, তোমাদের পূর্বপুরুষ বরকত ও কল্যাণ লাভের উদ্দেশ্যে এসব নিদর্শন সংরক্ষন করতো। তাই আল্লাহ ব্যতীত তারা এসবের ইবাদত করেছিল। কেননা, প্রথম আর্বিভূত জাতি পরবর্তীদের জন্য এসবের ইবাদত করার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। যেমন নূহ আলাইহিস সালাম এর জাতিকে শয়তান নেকলোকদের প্রতিমূর্তি তৈরির নির্দেশ দেয়। যাতে তাদের ইবাদতে তারা উদ্যমী হয়।

অতঃপর তারা এ নিদর্শনকে ভাল সৌধ হিসাবে স্থাপন করে। কিন্তু পরবর্তীতে মূর্খ জাতি এসে এ সৌধের ইবাদত করে, এটাই জাহিলদের কর্ম, তারা সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের নিদর্শনকে সম্মান, সংরক্ষন ও সংস্কার করে। অতঃপর কালক্রমে আল্লাহ তা'আলাকে বাদ দিয়ে তাদের ইবাদত কর হয়। তাই কেউ বলতে পারবে না যে, বর্তমানে মানুষ সঠিক দীন ও তাওহীদের উপর আছে।

আমাদের বক্তব্য হলো শুধু বর্তমানের চিন্তা না করা। বরং ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করা আবশ্যক। যদিও বর্তমান সময়ের মানুষ ফিতনায় বিশ্বাসী না, তবুও ভবিষ্যত বড় কঠিন হতে পারে। তাই এসব নিদর্শনের পরিচর্যা করা বৈধ নয়। নিদর্শন পরিচর্যার মত কর্মকান্ডের কারণেই জাতি ধ্বংস হয়েছে। জাতি তাদের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের নিদর্শনকে সম্মান করে, ভবিষ্যতে তারা তাদের প্রতি মূর্তি তৈরি করবে। তাই এ বিষয়ে সতর্ক করা মুসলিমদের উপর ওয়াজীব।

একারণে শাইখ প্রমাণ স্বরূপ মক্কায় দারুন নাদওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন, যেখানে মক্কার কুরাইশ বংশের প্রধান ব্যক্তিবর্গ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ করার জন্য একত্রিত হতেন। অতঃপর ইসলামের আর্বিভাবের পরপরই জাহিলিয়্যাত দুরিভূত হয়। মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর শাসনামল পর্যন্ত দারুন নাদওয়ার অধিকার ও উপকার লাভ এবং সংগঠন পরিবর্তনের জন্য ভিত্তি পূর্বের অবস্থায় বহাল রাখা হয়। অতঃপর হাকীম ইবনে হিযামের নিকট থেকে দারুন নাদওয়া ক্রয় করা হয়। মানুষ একত্রিত হয়ে এ বিষয়ে হাকীমকে প্রশ্ন করলো, পূর্ববর্তীদের এ নিদর্শনকে আপনি কেন বিক্রয় করলেন? কেন কুরাইশদের সম্মান বিক্রি করলেন? তিনি জবাবে বলেন, তাক্বওয়া ছাড়াই সম্মান চলে গেল!। এর প্রমাণে আল্লাহর বাণীঃ

{إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: 13]

তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়া সম্পন্ন *(সূরা হুজরাত ৪৯:১৩)*।

আল্লাহ তা'আলার বাণী মোতাবেক এটাই হলো সঠিক জবাব এবং দূরদর্শিতা ও ঈমানের আলো। সুতরাং প্রমাণিত যে, প্রাচীন নিদর্শনকে সংরক্ষন করা যাবে না। কেননা, এটা পরবর্তীদেরকে শিরকের দিকে ধাবিত করবে। প্রাচীন শিরকী রীতিকে রূদ্ধ করার জন্যই দীন এসেছে।

৮৭-৯০. এ উম্মতের মধ্যে বিদ্যমান কতিপয় জাহিলী স্বভাব

(৮৭) বংশের গৌরব (الفَخْرُ بالأحساب), (৮৮) অন্যকে বংশের ব্যাপারে খোঁটা দেয়া ও নিন্দা করা (الطعن في الأنساب), (৮৯) নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করা (الاستسقاء بالأنواء) ও (৯০) মৃতের জন্য বিলাপ করে কান্নাকাটি করা (النياحة على الميت)।

....

ব্যাখ্যা: এ চারটি জাহিলী সমস্যা। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت"

আমার উম্মতের মাঝে চারটি জাহিলী সমস্যা বিদ্যমান থাকবে যা তারা বর্জন করবে না। বংশের গৌরব, অন্যকে বংশের খোঁটা দেয়া, নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করা ও মৃতের জন্য বিলাপ করে কান্নাকাটি করা।[৫৯]

---

৫৯. ছহীহ মুসলিম ৯৩৪।

৯৭. বংশের গৌরব: পূর্ব পুরুষ ও বাপদাদার মর্যাদা নিয়ে মানুষের অহংকার করা। এটাই জাহিলী দীন। কেননা, জাহিলরা মিনায় একত্রিত হয়ে আল্লাহ তা'আলার নাম স্বরণ করার পরিবর্তে পূর্বপুরুষদের মর্যাদা নিয়ে অহংকারী আলোচনা করতো। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراً} [البقرة: 200]

তারপর যখন তোমরা তোমাদের হজের কাজসমূহ শেষ করবে, তখন আল্লাহকে স্মরণ কর, যেভাবে তোমরা স্মরণ করতে তোমাদের বাপ-দাদাদেরকে, এমনকি তার চেয়ে অধিক স্মরণ। আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে যে বলে, হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়াতেই দিয়ে দিন। বস্তুত আখিরাতে তার জন্য কোন অংশ নেই *(সূরা আল-বাক্বারাহ ২:২০০)*।

তাই পূর্ব পুরুষ ও বাপদাদার যিকির (স্বরণ) নয়, আল্লাহ তা'আলার যিকির করাই আবশ্যক।

৮৮. অন্যকে বংশের খোঁটা দেয়া: এভাবে বলা যে, অমুকের কোন মূলই নেই, মূলহীন গোত্রের অমুক। এটাই হচ্ছে অন্যদেরকে নিন্দা করার অর্থ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: 13]

হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে এক নারী ও এক পুরুষ থেকে সৃষ্টি করেছি আর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি। যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়া সম্পন্ন। নিশ্চয় আল্লাহ তো সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত *(সূরা হুজরাত ৪৯:১৩)*।

তাই বংশের গৌরব নয়, কেবল তাক্বওয়ার গৌরব ধর্তব্য। তাক্বওয়া বিনষ্ট হলে বংশের গৌরব কোন কাজে আসবে না। রসূল বলেন,

"من بطّأ به عمله لم يسرع به نسبه"

যে লোককে তার আমলে পিছনে সরিয়ে দিবে তার বংশ মর্যাদা তাকে অগ্রসর করে দিবে না।[৬০]

কুরাইশ ও বনী হাশিম বংশে জন্ম গ্রহণ করা এবং রসূল এর পরিবারের সদস্য হওয়া সৎ আমল ব্যতীত কারো জন্য কাজে আসবে না। সৎআমল ও আল্লাহভীতিই কিয়ামতের দিন কাজে আসবে।

৮৯. নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করা: নক্ষত্রের উদয় ও অস্ত যাওয়ার প্রভাবে বৃষ্টি বর্ষণ হয় বলে বিশ্বাস করা। এটাই জাহিলী দীন। কেবল আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় বৃষ্টি হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ} [الشورى: 28]

আর তারা নিরাশ হয়ে পড়লে তিনিই তখন বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তাঁর রহমত ছড়িয়ে দেন *(সূরা শুরা ৪২:২৮)*।

তিনিই আল্লাহ যার ইচ্ছা, অভিপ্রায় ও হিক্বমতের কারণে বৃষ্টি বর্ষণ হয়। যেভাবে ইচ্ছা তিনি যমীনে বৃষ্টি বর্ষণ করেন অথবা যমীনের কোন জায়গায় বৃষ্টি বর্ষণ করেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوراً} [الفرقان: 50]

আর আমি তা তাদের মধ্যে বণ্টন করি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে; তারপর অধিকাংশ লোক শুধু অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করে *(সূরা ফুরক্বান ২৫:৫০)*।

তাই যে বিশ্বাস করে নক্ষত্রের উদয় অথবা অস্তে যাওয়ার প্রভাবে বৃষ্টি বর্ষণ হয়, তার এ বিশ্বাস শিরক। এজন্য তাকে তাওবা করতে হবে। আর আল্লাহ তা'আলার দিকেই বৃষ্টি বর্ষণের সম্বোধন করা ওয়াজীব।

---

৬০. ছ্বহীহ মুসলিম ২৬৯৯।

৯০. মৃতের জন্য বিলাপ করে কান্নাকাটি করা: এর দ্বারা উদ্দেশ্যে হলো মৃত্যুর সময় উৎকন্ঠিত হয়ে কর্কশভাবে উচ্চ আওয়াজ করা অথবা মৃতের ভাল কর্ম উল্লেখ করে বিলাপ করা। তাই বিলাপ করে কান্নাকাটি করা কাবীরাহ গুনাহ। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"النائحة إذا لم تتب قبل موتها، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب"

বিলাপকারী যদি মৃত্যুর পূর্বে তাওবাহ না করে তাহলে ক্বিয়ামতের দিন তাকে এভাবে উঠানো হবে যে, তার গায়ে আলকাতরার (চাদর) খসখসে চামড়ার ওড়না থাকবে।[৬১]

তাই বিলাপ করা কাবীরাহ গুনাহ যা জাহিলী কর্ম। এ জন্য ধৈর্য ধারণ ও ছাওয়াবের প্রত্যাশা করা আবশ্যক। তাই কেউ মৃতের জন্য কান্নাকাটিতে অংশ গ্রহণ করবে না। কেননা, মানুষ কান্না দমিয়ে রাখতে সক্ষম নয়। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পুত্র ইবরাহীমের ওফাতের পর তিনি কেঁদে বলেন,

"إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون"

অশ্রু প্রবাহিত হয় আর হৃদয় হয় ব্যথিত। তবে আমরা মুখে তাই বলি যা আমাদের রব পছন্দ করেন। আর হে ইবরাহীম! তোমার বিচ্ছেদে আমরা অবশ্যই শোক সন্তপ্ত।[৬২]

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا – يعني اللسان – أو يرحم"

---

৬১. ছ্বহীহ মুসলিম হা/৯৩৪।

৬২. ছ্বহীহ বুখারী হা/১৩০৩, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৩১৫।

আল্লাহ তা'আলা চোখের পানি ও অন্তরের শোক ব্যথার কারণে আযাব দিবেন না। তিনি আযাব দিবেন এর কারণে, (এ বলে) তিনি জিহ্বার দিকে ইঙ্গিত করলেন অথবা এর কারণেই তিনি দয়া করেন।[৬৩]

তাই বিপদগ্রস্থ হলে মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কথা বলবে, সে বলবে, (إنا لله وإنا إليه راجعون) ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। অর্থাৎ আমরা সবাই আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।

আর আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায় করবে। আর দু'আ করবে, আল্লাহ যেন ক্ষমা করে দেন এবং বিপদে সাহায্য করেন।

উল্লেখিত চারটি বিষয় জাহিলী কর্ম। মানুষের মাঝে এসব জাহিলী কর্ম বিদ্যমান আছে। তাই এ থেকে তাওবাহ করা আবশ্যক। হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যার মাঝে এসব কর্ম বিদ্যমান থাকবে সে কাফির বলে গণ্য হবে। এসব জাহিলী কর্মকান্ডের কিছু কুফরী আর কিছু অবাধ্যতা হিসাবে গণ্য।

৯১. সীমালঙ্ঘন করা

বাড়াবাড়ি করাই জাহিলদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা যথাযথভাবে তার বাণীতে উল্লেখ করেছেন।

....

ব্যাখ্যা: (البغي) বাড়াবাড়ি বা সীমালঙ্ঘন বলতে মানুষের জীবন-সম্পদ হরণ ও সম্মানহানী করা। জাহিলরা এ ধরণের সীমালঙ্ঘন করে নিজেদের দাম্ভিকতা প্রদর্শন করতো। এর মাধ্যমে তারা তাদের নিদর্শন ও অন্যায় কথা-কর্মের প্রশংসা করতো। ইসলাম আর্বিভাবের পর তা হারাম ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। মানুষের প্রতি ন্যায়ের আদেশ দেয়া হয়েছে। নীপিড়ীতদের জীবনের নিরাপত্তা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, যাতে

---

৬৩. ছ্বহীহ বুখারী হা/১৩০৪, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৯২৪।

সীমালঙ্ঘনকারীরা পরাভূত হয় এবং নির্যাতিতরা সাহায্য প্রাপ্ত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ) [لأعراف:33]

বল, আমার রব তো হারাম করেছেন অশ্লীল কাজ যা প্রকাশ পায় এবং যা গোপন থাকে, আর পাপ ও অন্যায়ভাবে সীমালঙ্ঘন এবং আল্লাহর সাথে তোমাদের শরীক করা, যে ব্যাপারে আল্লাহ কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহর উপরে এমন কিছু বলা যা তোমরা জান না *(সূরা আরাফ ৭:৩৩)*।

সর্বপরি অশ্লীলতা, শিরক ও জ্ঞানহীন কথা বলা সবই বাড়াবাড়ির অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} [النحل: 90] .

নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফ, সদাচার এবং নিকটাত্মীয়দের দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, মন্দ কাজ ও সীমালঙ্ঘন হতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর *(সূরা নাহাল ১৬:৯০)*।

বিদায় হজ্জের ভাষণে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

"إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ "

তোমাদের জীবন, সম্পদ ও ইজ্জত-সম্মান তোমাদের জন্য তেমনি সম্মানিত, যেমন সম্মানিত তোমাদের এ দিনটি, তোমাদের এ শহর এবং

তোমাদের এ মাস। পরে তিনি মাথা উঠিয়ে বললেন, হে আল্লাহ! আমি কি আপনার পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি?[৬৪] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً} [النساء:93]

আর যে ইচ্ছাকৃত কোন মুমিনকে হত্যা করবে, তার প্রতিদান হচ্ছে জাহান্নাম, সেখানে সে স্থায়ী হবে। আর আল্লাহ তার উপর ক্রুদ্ধ হবেন, তাকে লা'নত করবেন এবং তার জন্য বিশাল আযাব প্রস্তুত করে রাখবেন *(সূরা নিসা ৪:৯৩)*।

রবের বিধান প্রতিষ্ঠার কারণে নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে, মুসলিমদের মাঝে ভালবাসা বিস্তার লাভ করেছে। জাহিলী কর্ম-কান্ড দুরিভূত হয়েছে। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগত প্রতিপালকের জন্যই।

৯২. সত্য বা মিথ্যা নিয়ে অহংকার করা

অহংকার করা জাহিলদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যদিও তা হক্ব হয়। তাই এটা নিষেধ করা হয়েছে।

....

ব্যাখ্যা: জাহিলী সমস্যা হলো অহংকার করা যদিও তা হক্বের ব্যাপারে হয়। তারা নিজেদের ও বাপদাদার কর্ম-কান্ডের মাধ্যমে দাম্ভিকতা প্রকাশ করতো যা নিষিদ্ধ। কেননা, কর্মরীতির অহংকার আশ্চার্যবোধ এবং অন্যকে হেয় প্রতিপন্ন করতে প্রেরণা দেয় যা নিষিদ্ধ এবং তা জাহিলী কর্মের অন্তর্ভুক্ত। কোন মুসলিমের জন্য অহংকার করা বৈধ নয়। যখনই

৬৪.ছহীহ বুখারী, হা/৬৭, ১০৫, ১৭৩৯, ছহীহ মুসলিম, হা/১৬৭৯।

অহংকারপূর্ণ বিষয়ে প্রচেষ্টা ও আমল করবে তখনই তা অবহেলা বলে গণ্য হবে। আর তখন আল্লাহ তা'আলা যা ওয়াজীব করেছেন তা পালন করবে না। সুতরাং আল্লাহ, পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের হক্ব সর্বোত্তম। তাই মানুষ যখন ইহসান অথবা সৎ অথবা কল্যাণকর কাজ করে তখন কিভাবে অহংকার করতে পারে যদিও তার কাছে এসব কাজ সহজ হয়ে থাকে?

এটা সৃষ্টির মাঝে মানুষের অহংকার বুঝায়। অপরদিকে মানুষ যখন তার কর্ম নিয়ে আল্লাহর সাথে অহংকার করে তখন তা মারাত্মক আকার ধারণ করে। কেননা, সে তার কর্মের মাধ্যমে বিস্ময় প্রকাশ করে, কর্মের আধিক্য তুলে ধরে। এসব কর্মই মানুষের আমলকে বিনষ্ট করে দেয়। তাই স্পষ্ট কথা হলো বান্দার নিজের ও আল্লাহর ব্যাপারে সর্বদাই নিজেকে ছোট মনে করা আবশ্যক। আর বান্দা ও সৃষ্টির মাঝেও নিজেকে নিচু রাখা আবশ্যক। কেননা, মানুষ নিজেকে ছোট মনে করলে বিনম্রতা লাভে প্রেরণা পায়, যা অধিক কল্যাণ অর্জনে উদ্বুদ্ধ করে। পক্ষান্তরে, নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করলে এটা তাকে কল্যাণকর কাজ থেকে বিরত থাকতে প্ররোচিত করে এবং মনে করে সে চুড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এভাবে সে কল্যাণ থেকে বিরত থাকে।

মোদ্দা কথা হলো অহংকার করা কোন মুসলিমের জন্যই উচিত নয়। এটা কেবল জাহিলী কর্মই বটে।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন উল্লেখ করলেন যে, তিনি বনী আদমের নেতা তখন বললেন, কোন অহংকার করা চলবে না (**لما ذكر أنه "سيد ولد آدم– قال: "ولا فخر**)।[৬৫] তার পদ-মর্যাদায় কেউ সমান হতে

৬৫. আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر ... " أخرجه الترمذي **308/5** رقم **3160** **587/5** رقم**3624**، وقال في الموضعين: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم **1468**

পারবে না এসত্ত্বেও তিনি বললেন, কোন অহংকার করা যাবে না। তিনি নিজের অহংকারকে নাকোচ করে দিলেন। কেবল তিনি আল্লাহ তা'আলার নিআ'মত ও শুকরিয়া আদায়ের সংবাদ দিলেন, অহংকার করতে বলেননি।

৯৩. ঘৃণ্য গোঁড়ামি ও অন্ধভক্তি দেখানো

হক্ব ও বাতিল যাই হোক দলের পক্ষপাতিত্ব করা, যা জাহিলরা নিজেদের জন্য আবশ্যক করে নিয়েছে। এব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা যথাযথভাবে তার বাণী উল্লেখ করেছেন।

....

ব্যাখ্যা: ঘৃণিত পক্ষপাতিত্ব হলো অহংকার ও সীমালঙ্ঘন করতঃ বাতিল-মিথ্যাকে জানার পরও তার উপর অটল থাকা এবং ব্যক্তি অথবা গোত্রের সহযোগিতার উদ্দেশ্যে হক্ব অথবা বাতিল-মিথ্যার উপর বহাল থাকা, যা জাহিলী কর্ম।

জাহিলী কবি বলেন, (وما أنا مِنْ غزية إن غَوَيْتُ وإنْ تَرْشَدْ غزية أَرْشد ... غَوَتْ)

দেখাও যদি অভিযানের পথ* দেখাবো আমিও গোমরাহীর পথ* কেউ ভ্রষ্ট হলে, নেইকো আমি অভিযানের দলে। এব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন,

---

রতমোয়কি দিন আমি আদম সন্তানদের ইমাম (নেতা) হব, এতে অহংকার নেই। হামদের (আল্লাহ তা'আলার প্রশংসার) পতাকা আমার হাতেই থাকবে, এতেই গর্ব নেই। সে দিন আল্লাহ তা'আলা নাবী আদম আ. এবং নাবীগণের সকলেই আমার পতাকার নিচে থাকবেন। সর্ব প্রথম আমার জন্যই মাটিকে বিদীর্ণ করা হবে, এতে কোন অহংকার নেই। তিরমিযী ৫/৩০৮ হা/৩১৬০, ৫/৩৬২ হা/৩৬২৪। ছ্বহীহ জামে হা/১৪৬৮।

{وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا} [المائدة: 8]

কোন সম্প্রদায়ের প্রতি শত্রুতা যেন তোমাদেরকে কোনভাবে প্ররোচিত না করে যে, তোমরা ইনসাফ করবে না *(সূরা আল-মায়েদা ৫:৮)*।

অর্থাৎ হকের ব্যাপারে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে প্ররোচিত না করে। যদিও তারা তোমাদের শত্রু। তাই শত্রু-মিত্র সকলের ব্যাপারে ন্যায় বজায় রাখাই উদ্দেশ্যে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى} [الأنعام: 152]

আর যখন তোমরা বলবে, তখন ইনসাফ কর, যদিও সে আত্মীয় হয় *(সূরা আল-আন‘আম ৬:১৫২)*।

আত্মীয়ের সাথে অন্যায় আচরণ করবে না। ভুল হলে তা সংশোধন করে নিবে, ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না। বরং তার কল্যাণ কামনা করবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى} [الأنعام: 152]

আর যখন তোমরা বলবে, তখন ইনসাফ কর, যদিও সে আত্মীয় হয় *(সূরা আল-আন‘আম ৬:১৫২)*। আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ} [المائدة: 8] ،

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর জন্য ন্যায়ের সাথে সাক্ষদানকারী হিসাবে সদা দন্ডয়মান হও *(সূরা আল-মায়িদা ৫:৮)*। তিনি আরো বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً} [النساء: 135]

হে মুমিনগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর জন্য সাক্ষীরূপে। যদিও তা তোমাদের নিজদের কিংবা পিতা-মাতার অথবা কাছে আত্মীয়দের বিরূদ্ধে হয়। যদি সে বিত্তশালী হয় কিংবা দরিদ্র, তবে আল্লাহ উভয়ের ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে তোমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে- পেঁচিয়ে কথা বল কিংবা এড়িয়ে যাও তবে আল্লাহ তোমরা যা কর সে বিষয়ে সম্যক অবগত *(সূরা নিসা ৪:১৩৫)*।

সুতরাং নিজের ক্ষেত্রে এবং শত্রু-মিত্র সকলের সাথে ন্যায় সঙ্গত আচরণ করা মানুষের উপর আবশ্যক। কারো শত্রুতা যেন অন্যায় আচরণ ও অত্যাচারে প্ররোচিত না করে। এটাই মুসলিমের কাজ। অপরদিকে জাহিলরা তাদের সম্প্রদায়ের পক্ষপাতিত্ব করে যদিও ঐ সম্প্রদায় যালেম হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে জাহিলদের বিপরীত কর্মের আদেশ করেন এবং নিজ, আত্মীয়-স্বজন ও শত্রু-মিত্র সকলের ব্যাপারে হক্ব কথা বলার নির্দেশ দেন। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً"، قالوا: يا رسول الله، ننصره إذا كان مظلوماً، فكيف ننصره إذا كان ظالماً؟! قال: "تمنعه عن الظلم، فذلك نصره"

তুমি তোমার ভাইকে সাহায্যে কর হোক সে যালেম অথবা মাযলুম। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা মাযলুমকে সহযোগিতা করতে পারি, কিন্তু কিভাবে যালেমকে সাহায্যে করবো? তিনি বললেন, তোমরা যুলুম থেকে তাকে বিরত রাখবে। এটাই হবে তার প্রতি সাহায্যে করা।[৬৬]

সাহায্য করা অর্থ কাউকে যুলুম করা হতে বিরত রাখা। যুলুম করতে সহযোগিতা করা সাহায্য নয়। এটাই অনুসরণীয়।

৬৬. ছ্বহীহ বুখারী হা/২৪৪৩, ২৪৪৪, ৬৯৫৬।

৯৪. অন্যের অপরাধে নিরপরাধকে শাস্তি দেয়া

জাহিলদের দীনের অন্তর্ভুক্ত বিষয় হলো একজনের অপরাধে আরেকজনকে শাস্তি দেয়া। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেন,

{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [فاطر: 18]

কোন বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না *(সূরা ফাতির ৩৫:১৮)*।

....

ব্যাখ্যা: জাহিলী সমস্যা হলো তারা নিরপরাধকে পাঁকড়াও করতো অর্থাৎ অপরের অন্যায়ের কারণে তাকে শাস্তি দিতো। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে বলেন,

{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [فاطر: 18]

কোন বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না *(সূরা ফাতির ৩৫:১৮)*।

সুতরাং যে অন্যায় করেনি তাকে অন্যের অপরাধের কারণে শাস্তি দেয়া যাবে না। যদিও সে অপরাধী ভাতিজা অথবা পিতা অথবা সন্তান হয়। অপরাধীকেই শাস্তি দেয়া হবে। নিরীহকে সীমালঙ্ঘনকারীর অপরাধের কারণে শাস্তি দেয়া যাবে না। সীমালঙ্ঘনকারীর অন্যায়ের কারণে নিরপরাধকে শাস্তি দেয়া হলে তা হবে যুলুম ও অত্যাচার যা ইসলাম স্বীকৃতি দেয় না।

বর্তমানে কতিপয় গ্রাম্যলোকের অবস্থা: অন্য গোত্রের কোন সাধারণ লোকের সাথে নিজ গোত্রের কারো দ্বন্দ্ব হলে গ্রাম্যলোকেরা ঐ সাধারণ লোকের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করে না। বরং তাদের গোত্রের অধিক মর্যাদা সম্পন্ন ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করে অথবা হত্যা করে। তারা সীমা লঙ্ঘনকারীকে শাস্তি দেয় না। বরং তারা কেবল গোত্রের সম্মানিত অথবা গ্রহণযোগ্য অথবা পদ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিকে শাস্তি দেয় যা জাহিলী কর্ম। অন্যায়ের অপরাধীকেই শাস্তির জন্য

নির্দিষ্ট করা ওয়াজীব। তার নিকট থেকেই অপরাধের প্রতিশোধ নিতে হবে। এটাই ন্যায় বিচার। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194]

সুতরাং যে তোমাদের উপর আক্রমণ করেছে, তোমরা তার উপর আক্রমণ কর, যেরূপ সে তোমাদের উপর আক্রমণ করেছে *(সূরা আল-বাক্বারাহ ২:১৯৪)*।

মোদ্দা কথা: সবচেয়ে বড় মূলনীতি হলো অপরাধীর সাথেই অপরাধকে নির্দিষ্ট করতে হবে, অন্যের সাথে নয়। যদি বলা হয় যে, আল্লাহ তা'আলা ভুলের ধার্য্যকৃত ক্ষতিপূরণ নিহতের রক্তমূল্য পরিশোধকারীর উপর নির্ধারণ করেছেন। হত্যাকারীর উপর নির্ধারণ করেননি। তাহলে এ ক্ষেত্রে অন্যের পাপ আরেকজন কি বহন করে না?

জবাবে বলা হবে, এটাই ন্যায় বিচার ও সত্যের সহযোগিতা। কেননা, এটা হত্যাকারীর অনিচ্ছাকৃত ভুল। এখানে ব্যক্তিকে সাহায্যে করাই যথাযথ। মানুষ মারা গেলে আত্মীয়-স্বজনরা যেমন মৃতের সম্পদের ওয়ারীস হয়, এটিও তেমনই। অনিচ্ছাকৃত যে ভুল হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ তার পক্ষ থেকে বহন করবে। অপর দিকে ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যায়কারীর উপরই তার অন্যায়ের শাস্তি বা ক্ষতিপূরণ বর্তাবে। একারণে ক্ষতিপূরণ করতে ইচ্ছুকের উপর তা বর্তাবে না।

৯৫. কাউকে অন্যের দোষ-ত্রুটি তুলে ধরে গালমন্দ করা

অন্যকে গালি দেয়া। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একব্যক্তিকে বললেন,

"أَعَيَّرْتَهُ بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية"

তুমি তার মাকে গালি দিলে? তুমিতো এমনলোক যার মাঝে এখনও জাহিলীয়াত আছে।[৬৭]

....

ব্যাখ্যা: এটা আবূ যার রদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর কাহিনী; ইসলাম গ্রহণকারী পূর্ববর্তী মর্যাদাবান ছাহাবীদের কোন একজনের ব্যাপারে তিনি বলেছিলেন, হে কালোর বেটা! ঐ ছাহাবীর মা ছিল কালো। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা শুনে আবূ যার রদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে বললেন,

أَعَيَّرْتَهُ بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية

তুমি তার মাকে গালি দিলে?! তুমিতো এমন লোক যার মাঝে এখনও জাহিলীয়াত আছে।[৬৮]

সুতরাং কোন ব্যক্তিকে এমন বিষয়ে গালমন্দ করা যা তার মাঝে নেই, বরং অন্যের মাঝে আছে অথবা তার বংশের বদনাম করা সবই জাহিলী কর্ম। কারো মাঝে জাহিলী স্বভাবের কিছু বিদ্যমান থাকলেই কাফির হবে না।

---

৬৭. ছ্বহীহ বুখারী হা/৩০, ৬০৫০, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৬৬১।
৬৮. ছ্বহীহ বুখারী হা/৩০, ৬০৫০, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৬৬১।

৯৬. ভালকাজ করে অহংকার করা

বাইতুল্লাহর কর্তৃত্ব গ্রহণ করে অহংকার করা। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ভর্ৎসনা করে বলেন,

{مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِراً تَهْجُرُونَ} [المؤمنون:67] .

এর উপর অহঙ্কারবশে, রাত জেগে অর্থহীন গল্প-গুজব করতে করতে *(সূরা মূ'মিনূন ২৩:৬৭)*।

....

ব্যাখ্যা: জাহিলী সমস্যা হলো হারাম এলাকার অধিবাসী হয়ে পবিত্র কাবা ঘরের রক্ষণাবেক্ষণ, তত্ত্বাবধান, কাবা ঘরের দিকে আগমনকারীদের সেবা-যত্ন ও হাজীদের পানি পান করানোর কারণে জাহিলরা অহংকার করতো।

{مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ} [المؤمنون: 67]

এর উপর অহঙ্কারবশে *(সূরা মূ'মিনূন ২৩:৬৭)*।

অর্থাৎ বাইতুল্লাহর কর্তৃত্ব গ্রহণ করা, পবিত্র কাবা শরীফ ও তার দিকে আগমনকারীদের খেদমত করার মাধ্যমে জাহিলরা অন্যান্য আরববাসীর উপর অহংকার করতো। এসবই জাহিলী কর্ম। কেননা, পবিত্র কাবার খেদমত করা ইবাদত। ইবাদতের মাধ্যমে অহংকার করা মানুষের জন্য বৈধ নয়। কারণ ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ হয়, মানুষের প্রশংসা লাভ করা উদ্দেশ্যে নয়। বরং এসব ভাল কাজের সুযোগ লাভের জন্য আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করতে হয়। অহংকার ও দাম্ভিকতা প্রদর্শন করতে হয় না। নাবী-রসূল ও আসমানী কিতাব অনুসরণের পরিবর্তে জাহিলরা কাবার খেদমতের মাধ্যমে দাম্ভিকতা প্রদর্শন করতো। তারা ধারণা করতো যে, কিতাব ও নাবী-রসূলের অনুসরণের চেয়ে কাবা কেন্দ্রীক এসব আমলই তাদের জন্য যথেষ্ট।

এ কারণে জাহিলরা নিন্দনীয়; তারা কিতাব অনুসরণের পরিবর্তে কাবা ঘরের খেদমত করে পূণ্য অর্জন করতে চাইতো। তারা ধারণা করতো যে, এটাই তাদের জন্য যথেষ্ট, মূলতঃ তা জাহিলী কর্ম। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ} [التوبة: 19]

তোমরা কি হাজীদের পানি পান করান ও মাসজিদুল হারাম আবাদ করাকে ঐ ব্যক্তির মত বিবেচনা কর, যে আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এনেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে। তারা আল্লাহর নিকট বরাবর নয় *(সূরা আত-তাওবা ৯:১৯)*।

তবে হ্যাঁ, হাজীদের পানি পান করানো, মসজিদে হারাম আবাদ করা হচ্ছে সৎ আমল। কিন্তু এ কাজের মাধ্যমে অহংকার করা যাবে না। আর ধারণা করা যাবে না যে, এটাই যথেষ্ট। বরং অন্যান্য সৎ আমল করাও আবশ্যক, যা হাজীদের পানি পান করানো ও মসজিদে হারাম আবাদের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আর তা হলো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা (**الجهاد في سبيل الله**), আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করা (**والإيمان بالله**), হিজরত করা (**والهجرة**) ও সৎকাজ করা (**وأعمال جليلة**)।

মানুষ কোন সৎ আমলকে যথেষ্ট মনে করে বসে থাকতে পারে না। বিশেষত কুরআন-সুন্নাহ অনুসরণের চেয়ে অন্য আমল যথেষ্ট নয়। বর্তমানে যারা ধারণা করে যে, মক্কা মদিনায় বসবাস করা আমলের চেয়ে যথেষ্ট, তাদের কেউ বলে, হারাম এলাকায় ঘুমন্ত ব্যক্তি অন্য এলাকায় দন্ডায়মান ব্যক্তির চেয়ে ভাল। এটাই শয়তানের ধোঁকা।

৯৭. নেকলোকদের বিরোধিতা করা সত্ত্বেও তাদের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করে অহংকার করা

নাবীগণের বংশধর হওয়ার কারণে অহংকার করা। এব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ} [البقرة: 134]

সেটা এমন এক উম্মত যা বিগত হয়েছে। তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের জন্যই, *(সূরা আল-বাক্বারাহ ২:১৩৪)*।

....

ব্যাখ্যা: বনী ইসরাঈলের কর্মকান্ড হলো নাবীগণের বংশধর হওয়ার কারণে তারা অহংকার করতো, কিন্তু তাদের অনুসরণ করতো না। বিশেষত শেষ নাবী মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেও তারা অনুসরণ করতো না। অথচ তাদের উপর ওয়াজীব ছিল যে, তার অনুসরণ করা। তারা বলতো, আমরা নাবীগণের বংশধর এটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তারা তাদের অনুসরণ করতো না। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন,

{تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ} [البقرة: 134]

সেটা এমন এক উম্মত যা বিগত হয়েছে। তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের জন্যই, *(সূরা আল-বাক্বারাহ ২:১৩৪)*।

মানুষকে তার নিজের আমল দিয়েই মূল্যায়ন করা হবে; অন্যের আমল দিয়ে নয়। নাবীগণ হলেন সৃষ্টির সেরা মানুষ। কিন্তু তাদের অনুসরণ না করলে তারা তাদের বংশধরদের কোন কাজেই আসবে না। নাবীগণের আমল নাবীদের উপরই বর্তাবে আর বংশধরদের আমল তাদের নিজেদের উপরই বর্তাবে। অনুরূপভাবে যারা তাদের বাপ-দাদা ও পূর্বপুরুষদের কৃতিত্ব নিয়ে অহংকার করে তারা ধারণা করে যে, বাপ-দাদারা সৎ ও আলেম হওয়ার কারণে আমলের চেয়ে তারাই যথেষ্ট। অনুরূপভাবে

বাইতুল্লাহর অধিবাসীরাও নিজেদেরকে বাইতুল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করে ধারণা করে যে, সৎ আমলের চেয়ে বাইতুল্লাহর অধিবাসী হওয়াই যথেষ্ট। এটাই হলো তাদের দৃষ্টিভঙ্গি

অনুরূপভাবে যারা নাবীর আমল অথবা মর্যাদা অথবা ওলী-আওলীয়া ও নেকলোকদের আমলকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করে, তাদের সাথে অন্যের আমলের সম্পর্ক কি? তাদের আমল তাদের জন্যই নির্ধারিত, আমাদের আমল আমাদের জন্যই নির্ধারিত। ঐ নেকলোকদের আমল আমাদের জন্য কাজে আসবে না। কিয়ামতের দিন কেউ কারো উপকারে আসবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [البقرة:134]

،

তারা যা অর্জন করেছে তা তাদের জন্যই, আর তোমরা যা অর্জন করেছ তা তোমাদের জন্যই। আর তারা যা করত সে সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না *(সূরা আল-বাক্বারাহ ২:১৩৪)*।

নিজেদের জন্য আমল করা ব্যতীরেকেই যারা আওলীয়া, নেকলোক ও তাদের আমলকে ওসীলা হিসাবে গ্রহণ করে অথবা নেকলোক ও নাবীদের সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করা অথবা তাদের নৈকট্য লাভ করা করা যথেষ্ট মনে করে এ আয়াতের মাধ্যমে তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئاً، يا عباس عم رسول الله، يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنكم كمن الله شيئاً، يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئاً" ،

হে কুরাইশ সম্প্রদায়! তোমরা আত্ম রক্ষা কর। আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমাদের কোন উপকার করতে পারবো না। হে রসূলের চাচা আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্তালিব! আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমাদের কোন উপকার করতে পারবো না। হে সাফিয়া!

আল্লাহর রসূলের ফুফু, আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমাদের কোন উপকার করতে পারবো না। হে ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ! আমার ধন-সম্পদ থেকে যা ইচ্ছা চেয়ে নাও। আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে আমি তোমাদের কোন উপকার করতে পারবো না।[৬৯]

অতঃপর রসূল বলেন, আমি মানুষের চেয়ে আল্লাহর অধিক নৈকট্য অর্জনকারী। আমি আল্লাহর আযাব থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারবো না। তাই রসূল অথবা রসূলের নৈকট্য অথবা আওলীয়া ও নেকলোকদের নৈকট্যর দিকে সম্পৃক্ত করা অথবা তাদের মর্যাদাকে ওসীলা হিসাবে গ্রহণ করা কিয়ামতের দিন কারো কোন উপকারে আসবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন

{يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ} [الانفطار:19]

সেদিন কেউ কারো কোন কিছুর ক্ষমতা রাখবে না। আর সেদিন সকল বিষয় হবে আল্লাহর কর্তৃত্বে *(সূরা ইনফিতার ৮২:১৯)*। তিনি আরো বলেন,

{يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ} [عبس: 34- 37]

সেদিন মানুষ পালিয়ে যাবে তার ভাই থেকে, তার মা ও তার বাবা থেকে, তার স্ত্রী ও তার সন্তান-সন্ততি থেকে; সেদিন তাদের প্রত্যেকেরই একটি গুরুতর অবস্থা থাকবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে *(সূরা আবাসা ৮০:৩৪-৩৭)*।

কিয়ামতের দিন প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। এমনকি ঈসা আলাইহিস সালাম বলবেন, হে রব! আমার প্রসবকারিণী মাতা মারইয়ামের ব্যাপারে তোমার নিকট কোন সাহায্য চাচ্ছি না। আমি নিজের মুক্তির জন্যই সাহায্যে চাই।

---

৬৯. ছ্বহীহ বুখারী, হা/২৭৫৩, ৩৫২৭, ৪৭৭১, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২০৬।

৯৮. নিজেদের পেশা নিয়ে অন্যদের উপর গর্ব-অহংকার করা

কৃতিত্বের মাধ্যমে অহংকার করা। যেমন (শীত ও গ্রীষ্ম কালীন) এ দু'মৌসুমে ব্যবসা নিয়ে চাষীদের সাথে সফররত ব্যবসায়ীর অহংকার করা।

....

ব্যাখ্যা: ব্যবসায়ী তার ব্যবসা নিয়ে পেশাজীবি, কাঠ মিস্ত্রি ও কামারের সাথে দাম্ভিকতা দেখায়। আর চাকুরীজীবি তার চাকুরী নিয়ে চাকুরীহীনদের সাথে অহংকার করে। মুসলিম কখনো অন্যকে অবহেলা করে না। কোন মানুষই সাধারণভাবে কাউকে অবজ্ঞা করতে পারে না। মুসলিম কিভাবে তার পেশা নিয়ে অপরকে অবহেলা করতে পারে, তার পেশা ছাড়া কি আর পেশা নেই? এটাই জাহিলী কর্ম।

যেমন আল্লাহ তা'আলা দু'মৌসুমে ভ্রমণরত কুরাইশ ব্যবসায়ীদের কথা (সূরা কুরাইশে) উল্লেখ করেন। আল্লাহ তা'আলা সফররত দু'দল কুরাইশ ব্যবসায়ীর উপর অনুগ্রহ করেছিলেন। একটি হলো শীত কালীন সময়ে ইয়ামানের দিকে ভ্রমণরত ব্যবসায়ী দল, অপরটি গ্রীষ্ম কালীন সময়ে সিরিয়ার ব্যবসায়ী দল। সফরকারী ব্যবসায়ী হওয়ায় এ দু'দলই মানুষের প্রতি দাম্ভিকতা প্রদর্শন করতো। ফসল উৎপাদনকারী চাষীদের সাথে তারা অহংকার করতো। আর যারাই তাদের কৃতিত্ব ও চাকুরী নিয়ে অন্যদের সাথে অহংকার করবে তারাই জাহিল হিসাবে গণ্য হবে। মানুষ দাম্ভিক হতে পারে না। যাদের পেশা-কর্ম সম্মানজনক নয় এ দাম্ভিকতার কারণে তাদেরকে ছোট করা হয়। যেমন কামার ও কাঠমিস্ত্রি। এ অহমিকার বদস্বভাব কিছু মানুষের মাঝে থেকেই গেছে। এভাবে যারা মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিনকে অবহেলা করে তারাও জাহিলদের অন্তর্ভুক্ত। ইমামতির দায়িত্ব উত্তম চাকুরী, যা ছিল রসূল এর কাজ। অনুরূপভাবে মুয়াজ্জিনের দায়িত্বও উত্তম চাকুরী। সুতরাং ইমামতি ও মুয়াজ্জিনী সম্মানজনক পেশা। এ পেশা দু'টি মন্ত্রির দায়িত্ব ও সকল পেশার চেয়েও সম্মানজনক।

৯৯. দুনিয়া নিয়েই আনন্দে থাকা

জাহিলদের অন্তরে দুনিয়াই বড় বিষয়। যেমন তারা বলে, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَقَالُوا لَوْلا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ} [الزخرف:31]

তারা বলল, 'এ কুরআন কেন দু'জনপদের মধ্যকার কোন মহান ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ করা হল না? *(সূরা যুখরুফ ৪৩:৩১)*।

....

ব্যাখ্যা: জাহিলী সমস্যা হলো জাহিলদের অন্তর পার্থিব মোহে আচ্ছন্ন। যার নিকট পার্থিব চাকচিক্যই প্রধান সে জাহিলদের কাছে সম্মানিত। আর যার নিকট দুনিয়া প্রিয় নয় সে তাদের কাছে অপমানিত ও অবহেলিত। রিসালাতের ব্যাপারেও তারা কুমন্তব্য করে বলে, তা কেবল ধনীদের মাঝে থাকাই আবশ্যক, গরীবদের মাঝে নয়। অথচ তা আল্লাহর ইচ্ছাধীন বিষয়।

আর তারা বলে, আল্লাহ তা'আলা আবূ তালেবের ইয়াতিম ভাতিজা অর্থাৎ মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া রিসালাত দেয়ার মত আর কাউকে পেল না? আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَقَالُوا لَوْلا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ} [الزخرف:31]

তারা বলল, 'এই কুরআন কেন দু'জনপদের মধ্যকার কোন মহান ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ করা হল না? *(সূরা যুখরুফ ৪৩:৩১)*।

মক্কা ও তায়েফ এ দু'শহর রিসালাতের জন্য উপযোগী। মক্কার ওয়ালীদ ইবনু মুগীরাহ অথবা তায়েফের হাবীব ইবনু আমর আছ-ছাক্বাফী এ দু'জনের কোন একজন রিসালাত পাওয়ার উপযুক্ত ছিল। জাহিলদের কারো মতে, তায়েফের উরওয়া ইবনে মাসউদ রিসালাতের উপযুক্ত ছিল। জাহিলরা বলতো, এ দু'জনের কোন একজন রিসালাত পাওয়ার উপযুক্ত

ছিল। ইয়াতিম মুহাম্মাদ কে রিসালাত দেয়া হলো অথচ জাহিলদের নিকট সে রিসালাতের উপযুক্ত নয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ} [الزخرف: 32]

তারা কি তোমার রবের রহমত ভাগ-বন্টন করে? *(সূরা যূখরুফ ৪৩:৩২)*।

অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলার ক্রিয়া-কর্মে তারা সম্পৃক্ত হতে চায়। আর আল্লাহ তা‘আলার রহমতকে তারা বন্টন করতে চায়। তাই আল্লাহ তা‘আলার বন্টন নীতিকে তারা বিশ্বাস করে না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ} [الأنعام: 124]

আল্লাহ ভালো জানেন, তিনি কোথায় তাঁর রিসালাত অর্পণ করবেন *(সূরা আন‘আম ৬:১২৪)*।

১০০. আল্লাহর বিধান সংশোধন করা ও কর্তৃত্ব লাভ করতে চাওয়া

আল্লাহ তা'আলার উপর আধিপত্য বিস্তার করতে চাওয়া। যেমন পূর্বের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

ব্যাখ্যা: আল্লাহর উপর প্রভাব বিস্তার করতে চাওয়া। অর্থাৎ পরামর্শ দিতে চাওয়া। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেন,

{لَوْلا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً} [الفرقان: 32]

তার উপর পুরো কুরআন একসাথে নাযিল হলো না কেন? *(সূরা যূখরূফ ২৫:৩২)*।

তারা আল্লাহ তা'আলাকে পরামর্শ দিতে চায় আর বলে, আল্লাহ তা'আলা কেন পৃথকভাবে কুরআন নাযিল করেন, তিনি একত্রে কুরআন নাযিল করেননি কেন? জাহিলরা যা বুঝে না এবং যে বিষয়ে তাদের জ্ঞান নেই সে ব্যাপারে তারা হস্তক্ষেপ করতে চায়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা পৃথকভাবে কুরআন নাযিলের তাৎপর্য বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

{كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً} [الفرقان:33]

আর তারা তোমার কাছে যে কোন বিষয়ই নিয়ে আসুক না কেন, আমি এর সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা তোমাকে কাছে নিয়ে এসেছি *(সূরা যূখরূফ ২৫:৩২)*। তিনি আরো বলেন,

{وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلاً} [الإسراء:106]

আর কুরআন নাযিল করেছি কিছু কিছু করে, যেন তুমি তা মানুষের কাছে পাঠ করতে পার ধীরে ধীরে এবং আমি তা নাযিল করেছি পর্যায়ক্রমে *(সূরা বনী ইসরাঈল ১৭:১০৬)*।

সময়োপযুগি আমলের সহজতার জন্যও তিনি কুরআন ধীরে ধীরে নাযিল করেন। যদি তিনি কুরআন একত্রে নাযিল করতেন তাহলে মানুষ আমল করতে অপারগ হতো। অনুরূপভাবে বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি একটু একটু করে কুরআন নাযিল করেছেন। প্রত্যেক আকস্মিক ঘটনা অথবা কোন প্রেক্ষাপটে হুকুম বর্ণনার জন্য কুরআন পর্যায়ক্রমে নাযিল হয়েছে। এটাই পৃথকভাবে কুরআন নাযিলের তাৎপর্য। যুগে যুগে এরূপ অবান্তর পরামর্শের লোক বিদ্যমান রয়েছে। তারা বিধানের মূল রচনায় হস্তক্ষেপ করতে চায়। আল্লাহ ও তার রসূলের উপর অবান্তর প্রস্তাবনা তুলে ধরে বলে, যদি বিধানের মূল রচনা এরূপ হতো, যদি হাদীছ এরূপ এরূপ হতো। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [الحجرات: 1]

হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সামনে অগ্রবর্তী হয়ো না *(সূরা হুজরাত ৪৯:১)*।

তোমরা আল্লাহ ও তার রসূলের উপর প্রস্তাবনা দিবে না। বরং তোমাদের উপর আবশ্যক হলো আল্লাহর উপর ঈমান আনা এবং তিনি যা নাযিল করেছেন পরামর্শ ও প্রস্তাবনা ছাড়াই তদনুযায়ী আমল করা।

১০১. অভাবগ্রস্তদেরকে অবজ্ঞা করা

অভাবীদেরকে ঘৃণা করা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ} [الأنعام: 52]

তুমি তাড়িয়ে দিয়ো না তাদেরকে, যারা নিজ রবকে সকাল সন্ধ্যায় ডাকে *(সূরা আন‘আম ৬:৫২)*।

……………………………………………

ব্যাখ্যা: এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। জাহিলরা রসূলগণের অনুসরণ পরিত্যাগ করে। তাদের ধারণা, অভাবীরাই রসূলগণের অনুসরণ করে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ} [الشعراء:111]

তারা বলল, ‘আমরা কি তোমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করব, অথচ নিম্নশ্রেণীর লোকেরা তোমাকে অনুসরণ করছে? *(সূরা আশ-শু‘আরা ২৬:১১১)*।

অভাবী ও সমাজে যাদের কোন মর্যাদা নেই তারাই কেবল রসূলের অনুসরণ করে। এরূপ ধারণা পোষণ করাই জাহিলী দীনের রীতি। জাহিলরা অহংকার বশতঃ নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট আবেদন জানায় যে, ঐসব অভাবীরা যেন তার মজলিশে না বসে। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা আয়াত নাযিল করে বলেন,

{وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ} [الأنعام:52]

আর তুমি তাড়িয়ে দিয়ো না তাদেরকে, যারা নিজ রবকে সকাল সন্ধ্যায় ডাকে, তারা তার সন্তুষ্টি চায়। তাদের কোন হিসাব তোমার উপর নেই

এবং তোমার কোন হিসাব তাদের উপর নেই, ফলে তুমি তাদেরকে তাড়িয়ে দিবে এবং তুমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে *(সূরা আন'আম ৬:৫২)*।

নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি তাদেরকে তাড়িয়ে দিতেন, তাহলে তিনি যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হতেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الأنعام: 53،54]

আর এভাবেই আমি এককে অপর দ্বারা পরীক্ষা করেছি, যাতে তারা বলে, 'এরাই কি, আমাদের মধ্য থেকে যাদের উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন? আল্লাহ কি কৃতজ্ঞদের ব্যাপারে পূর্ণ জ্ঞাত নয়? আর যারা আমার আয়াতসমূহের উপর ঈমান আনে, যখন তারা তোমার কাছে আসে, তখন তুমি বল, 'তোমাদের উপর সালাম। তোমাদের রব তাঁর নিজের উপর লিখে নিয়েছেন দয়া, নিশ্চয় যে তোমাদের মধ্য থেকে না জেনে খারাপ কাজ করে তারপর তাওবা করে এরপরে শুধরে নেয়, তবে তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু *(সূরা আন'আম ৬: ৫৩,৫৪)*।

যে হকের অনুসরণ করে, অভাবী হলেও সে আল্লাহ তা'আলার নিকট তিনি সম্মানিত। যে ভালকাজের উপযুক্ত তার জন্য মজলিশে জায়গা করে দিতে হবে। আর যে হক্ব থেকে বিমুখ ও অহংকারী সে এ সম্মানের উপযুক্ত নয়। কেননা, সে নিজেই নিজেকে অপমানিত করেছে। তাই সে দুরিভূত, বরখাস্ত ও পরিত্যাজ্য।

১০২. নিয়্যত ও উদ্দেশ্যেকে কেন্দ্র করে ঈমানদারকে অপবাদ দেয়া

রসূলের অনুসারীরা একনিষ্ঠ নয়, দুনিয়া প্রেমীক এ কথা বলে জাহিলরা ঈমানদারদের অপবাদ দেয়। আল্লাহ তা'আলা জাহিলদের জবাবে বলেন,

{مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ} [الأنعام: 52]

তাদের কোন হিসাব তোমার উপর নেই *(সূরা আল-আন'আম ৬:৫২)*। এরূপ আরো আয়াত আছে।

....

ব্যাখ্যা: জাহিলী সমস্যা: অভাবীরা দুনিয়া উপভোগের জন্যই ঈমান এনেছে এ বলে জাহিলরা তাদেরকে অপবাদ দেয়। যেমন ফেরআউনের সম্প্রদায় মূসা আলাইহিস সালাম ও তার ভাই হারুন আলাইহিস সালামকে অপবাদ দিয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ} [المؤمنون: 24]

এতো তোমাদের মত একজন মানুষ ছাড়া কিছুই না। সে তোমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে চায় *(সূরা আল-মু'মিনূন ২৩:২৪)*।

সম্মান ও নের্তৃত্বের মোহে জাহিলরা নাবীগণকে অপবাদ দিতো। আর অভাবী মু'মিনদেরকে তারা দোষারোপ করতো এ কারণে যে, তারা নাকি রসূলের অনুসরণের মাধ্যমে ধনাঢ্যতা ও প্রাচুর্যতা অর্জন করতে চায়। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ} [الأنعام: 52]

আর তুমি তাড়িয়ে দিয়ো না তাদেরকে, যারা নিজ রবকে সকাল সন্ধ্যায় ডাকে, তারা তার সন্তুষ্টি চায় *(সূরা আল-আন'আম ৬:৫২)*।

মু'মিনরা দুনিয়া চায় জাহিলদের এ অপবাদের কথা আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেন (يُرِيدُونَ وَجْهَهُ) অর্থাৎ তারা

আল্লাহর সন্তুষ্টি চায়। অতঃপর তিনি মু'মিনদের একনিষ্ঠতাকে প্রমাণ করেছেন।

১০৩-১০৮. ঈমানের মূলনীতিসমূহ অস্বীকার করা

ফেরেস্তামন্ডলী, নাবী-রসূল ও আসমানী কিতাব সমূহকে অস্বীকার করা এবং আল্লাহর বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া, আখেরাত অবিশ্বাস করা এবং আল্লাহর সাক্ষাতকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা

……………………………………

ব্যাখ্যা: এ সব মেনে না নেয়াই জাহিলী সমস্যা। আসমানী কিতাব, নাবী-রসূল, ফেরেস্তামন্ডলী, আখেরাত ও আল্লাহর সাক্ষাতকে জাহিলরা বিশ্বাস করে না। এসব অদৃশ্য বিষয় যা তারা বিশ্বাস করে না। যারা অদৃশ্যে বিষয়ে বিশ্বাসী তারাই কেবল এসবের প্রতি ঈমান আনে। অদৃশ্যে বিশ্বাস না করার কারণেই জাহিলরা ফেরেস্তামন্ডলী, কিতাব, নাবী-রসূল ও আখেরাতের প্রতি ঈমান আনে না। এ জন্য যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস রাখে কুরআনের শুরুতেই আল্লাহ তা'আলা তাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{ ... هُدىً لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ ... } [البقرة: 2، 3]

আল্লাহ, ফেরেস্তা, আসমানী কিতাব, অহী এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান সবই অদৃশ্যে বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। আর জাহিলরা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে না। এ কারণে তারা কুফুরী করে। কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাক্ষাতকেও তারা অস্বীকার করে।

১০৯. রসূলগণ যা নিয়ে এসেছেন, তার কিছু অংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা

রসূলগণ কিয়ামত সম্পর্কে যে সংবাদ দিয়েছেন তার কিছু অংশকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করা। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ} [الكهف: 105]

তারাই সেসব লোক, যারা তাদের রবের আয়াতসমূহ এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতকে অস্বীকার করেছে *(সূরা কাহাফ ১৮:১০৫)*।

{مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} [الفاتحة: 4]

বিচার (পুনরুত্থান বা প্রতিদান) দিবসের (একমাত্র) মালিক (এবং বিচারক) *(সূরা ফাতিহা ১:৪)*।

{لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفَاعَةٌ} [البقرة: 254]

যে দিন থাকবে না কোন-বেচাকেনা, না কোন বন্ধুত্ব এবং না কোন সুপারিশ *(সূরা আল-বাক্বারাহ ২:২৫৪)*।

{إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [الزخرف: 86]

তবে তারা ব্যতিত যারা জেনেশুনে সত্য সাক্ষ্য দেয় *(সূরা যুখরুফ ৪৩:৮৬)*।

এ সকল আয়াতকে তারা মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে।

....

ব্যাখ্যা: জাহিলদের কেউ সম্পূর্ণভাবে আখেরাতকে অবিশ্বাস করে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا} [الأنعام: 29]

আর তারা বলেছিল, ‘আমাদের এ দুনিয়ার জীবন ব্যতীত কিছু নেই *(সূরা আল-আন‘আম ৬:২৯)*।

তাদের কেউ আখেরাত বিশ্বাস করে কিন্তু তাতে সংঘটিতব্য কতিপয় বিষয়কে তারা অস্বীকার করে। যেমন আখেরাতে হিসাব-নিকাশ, দাড়ি পাল্লায় আমলের ওজন ও জান্নাত-জাহান্নাম অস্বীকার করা। জাহিলদের কতিপয় এসব সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করে আবার কতিপয় আংশিক অস্বীকার করে। যারা আংশিক অবিশ্বাস করে তারা মূলতঃ সম্পূর্ণ অস্বীকারকারীর মতই। এখানে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। তারা কুরআনের কিছু অংশ বিশ্বাস করে আর কিছু অংশ বিশ্বাস করে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْناً} [الكهف: 103–105]

তাদের মাঝে কেউ আখেরাতের হিসাব-নিকাশ মিথ্যা মনে করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} [الفاتحة: 4]

বিচার (পুনরুত্থান বা প্রতিদান) দিবসের (একমাত্র) মালিক (এবং বিচারক) *(সূরা ফাতিহা ১:৪)*।

এখানে দীন বলতে হিসাব-নিকাশ ও কর্মের প্রতিফল দিবসকে বুঝানো হয়েছে। আর জাহিলরা এটাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ ... } [البقرة: 254]

হে মুমিনগণ, আমি তোমাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তা হতে ব্যয় কর, সে দিন আসার পূর্বে, যে দিন থাকবে না কোন-বেচাকেনা, না কোন বন্ধুত্ব এবং না কোন সুপারিশ। আর কাফিররাই যালিম *(সূরা আল-বাক্বারাহ ২:২৫৪)*।

আর এ দিনটিই হচ্ছে বিচার দিবস।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন

{مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [البقرة: 254]

সে দিন আসার পূর্বে, যে দিন থাকবে না কোন-বেচাকেনা, না কোন বন্ধুত্ব এবং না কোন সুপারিশ। আর কাফিররাই যালিম *(সূরা আল-বাক্বারাহ ২:২৫৪)*।

কিয়ামতের দিন কারো সৎ আমল না থাকলে তার মুক্তি লাভের কোন উপায় থাকবে না। দুনিয়াতে মানুষ প্রয়োজনীয় জিনিস বেচা-কেনা করে কিন্তু এ দিনে কোন আমল বেচা-কেনা হবে না। যেমন আল্লাহর বাণী: (وَلا خُلَّةٌ)

দুনিয়াতে কোন প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় করতে না পেলে মানুষ তার বন্ধুর শরণাপন্ন হয়, অতঃপর বন্ধুর নিকট থেকে তা গ্রহণ করে। কিন্তু কিয়ামতের দিন কোন উপকারী বন্ধু পাওয়া যাবে না। এমনকি নিজের বন্ধুও কোন কাজে আসবে না। আর কেউ কারো জন্য সুপারিশও করবে না। অবশ্য দুনিয়াতে সুপারিশ করার মাধ্যম পাওয়া যায়। কিন্তু কিয়ামতের দিন তা পাওয়া সম্ভব নয় (আল্লাহর অনুমতি ছাড়া)। যেমন আল্লাহর বাণী (وَلا شَفَاعَةٌ) সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না। কিয়ামতের দিন সুপারিশের সকল মাধ্যম ছিন্ন হয়ে গেলে আর কোন উপায় থাকবে না। কেবল সৎ আমলের মাধ্যমেই মানুষ সেদিন অগ্রগামী হবে। আর সর্বোত্তম সৎ আমল হচ্ছে, আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস করা ও শিরক থেকে বিরত থাকা। এ জন্য আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{وَلا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [الزخرف: 86]

তিনি ছাড়া যাদেরকে তারা আহবান করে তারা সুপারিশের মালিক হবে না; তবে তারা ব্যতিত যারা জেনে-বুঝে সত্য সাক্ষ্য দেয় *(আয-যুখরুফ ৪৩:৮৬)*।

আল্লাহর বাণী: {شَهِدَ بِالْحَقِّ} অর্থাৎ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে (لا إله إلا الله) এ কালিমা পাঠ করতঃ তার উপরই মৃত্যু বরণ করে, কিয়ামতের দিন তার জন্য তা যথেষ্ট হবে না। বরং এর অর্থ জানাও তার জন্য আবশ্যক। এজন্য আল্লাহ তা'আলা আয়াতাংশে বলেন, (وَهُمْ يَعْلَمُونَ) অর্থাৎ তারা এর অর্থ জানবে। তাই অর্থ বুঝা ব্যতিরেকে শুধুমাত্র কালেমা পাঠ করা যথেষ্ট নয়। আর কালেমার চাহিদা অনুসারে আমল ব্যতিত তা পাঠ করা ও অর্থ বুঝা কোনটিই যথেষ্ট নয়। আর ইলম-জ্ঞান হচ্ছে আমল করার মাধ্যম। ফলতঃ জ্ঞান না থাকলে শুধু কালেমা (لا إله إلا الله) পাঠ করা কারো জন্য কাজে আসবে না।

১১০. হক্বপন্থী দাঈ (আল্লাহর পথে আহ্বানকারী) এর সাথে শত্রুতা করা

যারা ন্যায়ের আদেশ দেয়, তাদেরকে হত্যা করা।

....

ব্যাখ্যা: ইয়াহুদীদের গর্হিত কর্ম-কান্ড হচ্ছে নাবী ও দা'ঈদেরকে হত্যা করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [آل عمران: 21]

নিশ্চয় যারা আল্লাহর আয়াতসমূহের সাথে কুফরী করে এবং অন্যায়ভাবে নাবীদেরকে হত্যা করে, আর মানুষের মধ্যে থেকে যারা ন্যায়-পরায়ণতার নির্দেশ দেয় তাদেরকে হত্যা করে, তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও *(সূরা আলে-ইমরান ৩:২১)*।

অনুরূপভাবে যারা হক্বের বিরোধিতা করে ও আল্লাহর রাস্তায় বাধা দেয় এবং হক্বপন্থী দা'ঈ, সৎকাজের আদেশদাতা ও অসৎকাজ থেকে বাধা দান কারীদেরকে হত্যা করে; তাদের ব্যাপারেই উল্লেখিত আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। আর এসব গর্হিত কাজ যারা করে, তারাই জাহিল।

১১১. বাতিল-মিথ্যা বিশ্বাস করা

জিবত ও ত্বাগুতের প্রতি বিশ্বাস রাখা।

....

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ} [النساء: 51]

তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যাদেরকে কিতাবের এক অংশ দেয়া হয়েছে? তারা জিবত ও তাগুতের প্রতি ঈমান আনে *(সূরা আন নিসা ৪:৫১)*।

জিবত হলো যাদু, কারো মতে, শয়তান। যারা আল্লাহর সীমারেখা লঙ্ঘন করে তারাই ত্বাগূত।

আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট হলো নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় হিজরতের পর ইয়াহুদীদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হন যে, তারা মুসলিমদের সাথে লড়াই করবে না। মদিনায় যারা থেকে যেতে ইচ্ছুক তাদেরকে বিতাড়িত করবে না। এ বিষয়ের উপর তারা অঙ্গীকার করলো। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার ছাহাবীদের বিপক্ষে ইয়াহুদীদের ক্ষমতা সঙ্কুচিত হলে তারা দেখলো যে, ইসলাম সাহায্য প্রাপ্ত হচ্ছে ও বিস্তার লাভ করছে, তখন ইয়াহুদীদের নেতা মক্কার কুরাইশদের কাছে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিরোধিতায় এগিয়ে আসার আহবান জানায়। আর সে তাদের কাছে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম এর বিরূদ্ধে যুদ্ধে বের হওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করে। আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করতে কুরাইশদেরকে উদ্বুদ্ধ করলেন। কুরাইশরা তাদেরকে বললো, তোমরা আহলে কিতাব; তাহলে কারা হকের উপর আছে, আমরা নাকি মুহাম্মাদ?

কুরাইশরা এটাও বললো, তোমরা তার বিরোধিতা করছো কেন? তারা জবাবে বলে, আমরা মেহমানকে সম্মান করি, আত্নীয়ের সাথে সদাচারণ করি, হাজীদেরকে পানি পান করাই এবং আরো অনেক ভাল কাজ করি। আর মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের প্রভুকে গালি দেয়, আমাদের দীনের দোষারোপ করে, আমাদের বাপ-দাদার বিরোধিতা করে এবং সে আমাদের আত্নীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে; এরূপ আরো অনেক কাজ করে। অতঃপর তারা তাদেরকে বললো, তোমরা হক্বের উপর আছো আর মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রয়েছে বাতিলের উপর। অথচ তারা জানতো, মুহাম্মাদই হক্বের উপর রয়েছে। তিনি আল্লাহর রসূল আর তারা হচ্ছে প্রতিমা-মূর্তি পূজারী।

আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে বলেন,

{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً} [النساء: 51]

তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যাদেরকে কিতাবের এক অংশ দেয়া হয়েছে? তারা জিবত ও তাগুতের প্রতি ঈমান আনে এবং কাফিরদেরকে বলে, এরা মুমিনদের তুলনায় অধিক সঠিক পথপ্রাপ্ত *(সূরা নিসা ৪:৫১)*।

তারা শুধু মন্তব্য করেছিল, তাহলে আল্লাহ তা'আলা কিভাবে বলেন,

{يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ}

আসলে বাহ্যিকতার উপর ভিত্তি করেই তারা ঈমান নামকরণ করেছিল। সুতরাং বুঝা গেল কাফিররা যে রীতির উপর বহাল আছে তার অনুকূলে কথা বলাও কুফরী; যদিও আন্তরিকভাবে তা বিশ্বাস করা না হয়।

বর্তমানে কেউ বলে, (মুরজিয়া সম্প্রদায়), অন্তরে বিশ্বাস না করা পর্যন্ত কুফরী কথা বললে, জবরদস্তি ছাড়াই কুফরী কথা উচ্চারণ করলে, কুফরী কাজ করলে, আল্লাহ ও তার রসূলকে গালি দিলে এবং যে কোন প্রকার কুফরী করলেই মুরজিয়াদের নিকট তাকে কাফির বলা যাবে না যতক্ষণ না জানা যায় তার অন্তরে কি আছে। এটাই মুরজিয়া সম্প্রদায়ের বাড়াবাড়ি মূলক কথা। আমরা এ থেকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও নিরাপত্তা কামনা করছি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা

{يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ} [النساء: 51]

তারা জিবত ও তাগুতের প্রতি ঈমান আনে *(সূরা নিসা ৪:৫১)*।

এ আয়াতাংশ দ্বারা ঐসব লোকদের দোষ বর্ণনা করেছেন, যারা বাহ্যিক দৃষ্টিতে জিবত ও ত্বাগুতের প্রতি ঈমান আনেনি, বরং আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতো তারা ভুল পথে আছে এবং মুহাম্মাদ সঠিক পথে আছেন। কিন্তু প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গ বাহ্যিকভাবে রসূলের সাথে হিংসা ও শত্রুতা বজায় রাখার জন্য তাদেরকে প্ররোচিত করতো। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কাফির বলে আখ্যা দিয়েছেন। কাউকে কাফির আখ্যা দেয়ার ব্যাপারে এটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

তাদের কথা প্রত্যাখ্যাত, যারা বলে, কুফরী কথা বললে, কুফরী কর্ম করলে, আল্লাহ ও তার রসূলকে গালি দিলেই তৎক্ষণাৎ মানুষকে কাফির বলা যাবে না, যতক্ষণ না আন্তরিকভাবে তারা তা স্বীকার করে। এ ভ্রষ্টতা থেকে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

১১২. ঈমানের উপর কুফরীকে প্রাধান্য দেওয়া

মুসলিমদের বিরূদ্ধে মুশরিকদের দীনকে গুরুত্ব দেয়া।

....

ব্যাখ্যা: ইয়াহুদীদের মাধ্যমে যা ঘটেছিল পূর্ববর্তী বিষয়ে তা উল্লেখ করা হয়েছে। এ মাস'আলার অন্তর্ভুক্ত বিষয় হচ্ছে, যারা কাফিরদের দীনকে মুসলিমদের দীনের উপর গুরুত্বারোপ করে অথবা উভয় দীনের মাঝে সমতা বিধান করতে চায়। আর ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান ও দীন ইসলামের মাঝে সমন্বয় করার জন্য কাছাকাছি ব্যাখ্যা প্রদানের অপচেষ্টা করে বলে, এসবই আসমানী দীন। তাই এসব দীনের অনুসারীদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব ও সহযোগিতা বজায় রাখা আবশ্যক।

১১৩. বাতিল গ্রহণের উদ্দেশ্যে মিথ্যার সাথে সত্যের মিশ্রণ ঘটানো

বাতিলের সাথে হক্বের মিশ্রণ।

....

ব্যাখ্যা: বাতিলের সাথে হক্বের মিশ্রণ ঘটানোই কাফির, জাহিল ইয়াহুদী-খ্রিষ্টান ও অন্যান্যদের অভ্যাস। এখানে (اللَّبْسُ) এর অর্থ হলো মিশানো। বাতিল প্রচারের উদ্দেশ্যে জাহিলরা এর সাথে হক্বের মিশ্রণ ঘটাতো। কেননা, শুধু বাতিল প্রচার করলে কেউ তা গ্রহণ করবে না। কিন্তু বাতিলের সাথে হক্ব মিশালে তা মু'মিনদেরকে ধোঁকা দেয়া যায়, যাতে এক নযরেই তারা বাতিল গ্রহণ করে বলতে পারে, এখানে হক্ব আছে। অতঃপর তারা হক্ব-বাতিল সম্পূর্ণটাই গ্রহণ করবে। মানুষ যদি হক্বকেই গ্রহণ করতো আর বাতিল প্রত্যাখ্যান করতো তাহলেই উত্তম হতো। কিন্তু হক্ব-বাতিল সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করাটাই তাদের ভুল। কোন জিনিসের বাহ্যিক অবস্থার উপর ভিত্তি না করে তা যাচাই-বাছাই ও পরখ করে গ্রহণ করা চিন্তাশীল ও

সুস্থবিবেক-বুদ্ধিসম্পন্নদের উপর আবশ্যক। তাতে হক্ব পাওয়া গেলে তা গ্রহণ করবে এবং বাতিল পেলে তা বর্জন করবে।

কাফেরেরা কখনো হক্বের আলোচনা করে, তা হক্বের প্রতি আগ্রহ ও ভালবাসার কারণে নয়। বরং বাতিল প্রচারের উদ্দেশ্যেই তারা তা করে থাকে। এ বিষয়ে সতর্ক থাকা ওয়াজীব। আরো আবশ্যক যে, বিভিন্ন বিষয়ে পর্যালোচনা করা এবং প্রকাশ্যে হক্বের চাকচিক্য দেখেই তা কবুল করার জন্য ত্বরান্বিত না হওয়া যতক্ষণ না হক্ব যাচাই-বাছাই ও পরখ করা হয়। তাতে হক্ব পাওয়া গেলে তা গ্রহণ করে বাতিলকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। বিদ্বান ও দূরদর্শীরা এটাই শিক্ষা দিয়ে থাকেন।

অপরদিকে সাধারণ, জাহিল ও কম বুদ্ধিসম্পন্নরা এসব বিষয়ে প্রতারিত হয় ও ধোঁকায় পড়ে। তাই বিদ্বানদের নিকট থেকে হক্ব জেনে নেয়া এবং তা গ্রহণের পূর্বে দূরদর্শীদের কাছে পরামর্শ চাওয়া তাদের উপর আবশ্যক; যাতে মিথ্যা-ভেজাল থেকে মুক্ত থাকা যায়।

১১৪. জেনে-বুঝে হক্ব গোপন করা

....

ব্যাখ্যা: ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান, মূর্তিপূজক ও অন্যান্য কাফির গোষ্ঠির জাহিলী নীতি হচ্ছে হক্ব জানা সত্ত্বেও তা গোপন করা। আহলে কিতাবদের (ইয়াহুদী-খ্রিষ্টান) মাঝে এ সমস্যা প্রবল। তারা হক্ব জানে অথচ তা গোপন করে। আর পার্থিব স্বার্থ লাভ অথবা মানুষের সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে তারা তা প্রচার করে না। সর্বত্তোম হক্ব গোপনের বিষয় হচ্ছে তাওরাত ও ইনজিলে বর্ণিত মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম এর গুণাবলী যা তারা জানে, তার রিসালাতের বিশুদ্ধতা এবং তিনি যা নিয়ে এসেছেন সেটাও জানে, এ সত্ত্বেও তারা তা গোপন করে এবং মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম এর রিসালাত অস্বীকার করে।

আল-কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে তাদের সম্পর্কে উল্লেখ করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ} [البقرة: 146، 147]

যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে চিনে, যেমন চিনে তাদের সন্তানদেরকে। আর নিশ্চয় তাদের মধ্য হতে একটি দল সত্যকে অবশ্যই গোপন করে, অথচ তারা জানে। সত্য তোমার রবের পক্ষ থেকে। সুতরাং তুমি কখনো সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না *(সূরা আল-বাক্বারাহ ২:১৫৬-১৫৭)*।

এ আয়াতটি বাইতুল মুকাদ্দাস হতে কেবলা পরিবর্তন করে কাবা শরীফকে কেবলা নির্ধারণ প্রসঙ্গে নাযিল হয়। তারা জানতো, অচিরেই ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর কেবলা কাবা শরীফই হবে রসুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কেবলা। এটা তাদের কিতাব থেকে জানার পরও তারা কাবা শরীফকে কেবলা মেনে নিতে অস্বীকার করে। আর এ প্রসঙ্গে তাদের জানা ইলম-জ্ঞান তারা গোপন করে। অনুরূপভাবে ইয়াহুদী-খ্রিষ্টান ছাড়াও মুসলিমদের মধ্যে যারা জেনে-বুঝে হক্ব গোপন করে, মানুষের মাঝে তা বর্ণনা করে না, তারাও ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের রীতির উপরই বহাল আছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً} [آل عمران: 187]

আর স্মরণ কর, যখন আল্লাহ কিতাবপ্রাপ্তদের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, অবশ্যই তোমরা তা মানুষের নিকট স্পষ্টভাবে বর্ণনা করবে এবং তা গোপন করবে না। কিন্তু তারা তা তাদের পেছনে ফেলে দেয় এবং তা বিক্রি করে তুচ্ছ মূল্যে *(সূরা আলে-ইমরান ৩:১৮৭)*। তিনি আরোও বলেন,

{إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} [البقرة: 159، 160]

নিশ্চয় যারা গোপন করে সু-স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ ও হেদায়াত যা আমি অবতীর্ণ করেছি, কিতাবে মানুষের জন্য তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করার পর, তাদেরকে আল্লাহ লা'নত করেন এবং লা'নতকারীগণও তাদেরকে লা'নত করে। তারা ব্যতীত, যারা তাওবা করেছে, শুধরে নিয়েছে এবং স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে। অতএব, আমি তাদের তাওবা কবুল করব। আর আমি তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু *(সূরা আল-বাক্বারাহ ২:১৫৯, ১৬০)*।

তাদের তাওবাহ কবুলের শর্ত হচ্ছে তারা যা কিছু গোপন করেছে তা বর্ণনা করা। সংক্ষিপ্ত তাওবাহ যথেষ্ট নয়। তাই হক্ব বর্ণনা করা আবশ্যক। যে হক্ব জানে তা মানুষের নিকট বর্ণনা করা তার উপর ওয়াজীব। আর তুচ্ছমূল্যে সে তা বিক্রয় করবে না। অতঃপর পার্থিব স্বার্থ লাভ অথবা মানুষের সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে সে তা গোপন করবে না। আল্লাহ আ'আলাকে ভয় করা এবং তার সন্তুষ্টি অর্জনই অধিক যুক্তিযুক্ত। সুতরাং হক্ব বর্ণনা ও তা প্রচারে সক্ষম ব্যক্তির উপর তা গোপন করা বৈধ নয়।

পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি হক্ব প্রচারে অক্ষম অথবা তা বর্ণনা করতে মারাত্মক ফিতনার আশঙ্কা করে; তা ওজর-কৈফিয়ত হিসাবে গণ্য হবে। কিন্তু হক্ব প্রচারে যার কোন প্রতিবন্ধকতা নেই, বরং উৎসাহিত হয়ে এবং কোন স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে তা গোপন করে, আল্লাহ তা'আলা এবং অভিশম্পাতকারীরা তাকে অভিশাপ দেন। এটাই হলো ইয়াহুদীদের বৈশিষ্ট্য। আর যারা কু-প্রবৃত্তির অনুসরণে হক্ব গোপন করে, মানুষের নিকট তা প্রচার করে না; এ বৈশিষ্ট্য তাদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তাদের নিকট কোন বিষয়ের বিধান জানতে চাওয়া হলে হক্ব ছাড়াই তারা জবাব দেয়। অথচ তারা সঠিক জবাব জানে। এটাকেই বলে হক্ব গোপন করা। আল্লাহ তা'আলা হক্ব বলার আদেশ দেন যদিও তা নিজের ক্ষেত্রেও হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [النساء: 135]

হে মুমিনগণ, তোমরা ন্যায়ের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর জন্য সাক্ষীরূপে। যদিও তা তোমাদের নিজদের কিংবা পিতা-মাতার অথবা কাছে আত্মীয়দের বিরূদ্ধে হয় *(সূরা আন নিসা ৪:১৩৫)*।

তাই প্রকাশ্যে ও যে কোন অবস্থায় হক্ব-সত্য প্রচার করা ওয়াজীব। সত্য সাক্ষ্য গোপন করা মারাত্মক অপরাধ। মানুষের জীবন পরিচালনা ও সঠিক পথ নির্দেশনার জন্য ওয়াজীব ইলম-বিদ্যা গোপন করাও অপরাধ। সুতরাং কোন তোষামদ ছাড়াই হক্ব-সত্য প্রচার করা ওয়াজীব-আবশ্যক।

তাই মানুষ যখন কোন বাতিল, কুসংস্কার ও শিরক দেখতে পাবে তখন নিরব থাকবে না; বরং তা প্রকাশ করে দেয়া তার উপর ওয়াজীব। আর কবর ও প্রতিমাপূজা এবং ভ্রান্ত বিদ'আত চালু করতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করবে না। যে নিরব থেকে বলে যে, মানুষের প্রতি আমার করার কিছুই নেই অথবা মানুষকে হারামে লিপ্ত হতে দেখেও চুপ থাকে, তাহলে এটাই হবে তার বিদ্যা গোপন করা এবং নসিহতের (কল্যাণ কামনা) খেয়ানত করা। নিরব থাকার জন্য আল্লাহ মানুষকে ইলম-জ্ঞান দান করেননি।

মানুষকে সতর্ক করা, প্রমাণসহ আল্লাহর দিকে আহবান করা এবং অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্যই মানুষকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

সুতরাং হক্বের ব্যাপারে আলেমদের নিরব থাকা বৈধ নয়। যেহেতু তারা হক্ব প্রচারে সক্ষম, বিশেষত ভ্রষ্টতা, শিরক, বিদ'আত ও কুসংস্কারে যখন মানুষকে লিপ্ত দেখবে তখন তারা নিরব থাকবে না। যদি তারা এক্ষেত্রে নিরব থাকে তাহলে এটাই হবে ইলম-বিদ্যা গোপন করা, যে বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদেরকে দোষারোপ করেছেন। তাই জানা সত্ত্বেও আলেম কিভাবে হক্বের বিরোধিতা করতে পারেন এবং মানুষের সন্তুষ্টি অর্জন অথবা হক্ব বিরোধী কর্ম-কান্ড চলতে দেয়া অথবা মানুষ যে

রীতির উপর বহাল আছে সেক্ষেত্রে তালমিলানোর জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে হক্বের বিরূদ্ধে ফাতওয়া দিতে পারেন কি?!

সুতরাং হক্বের অনুসরণই বাঞ্ছনীয়। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে; অধিকাংশ মানুষ বাতিলের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই তাদের সন্তুষ্টি অর্জন কাম্য নয়। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس

মানুষের ক্রোধেও যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং মানুষকে তার উপর তুষ্ট রাখেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ক্রোধে মানুষের সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর রগান্বিত হন এবং মানুষকে তার উপর ক্রোধান্বিত করেন।[৭০]

১১৫. জ্ঞান ছাড়াই আল্লাহর বিরুদ্ধে কথা বলা

ভ্রান্তনীতি হচ্ছে ইলম-জ্ঞান ছাড়াই আল্লাহ বিরূদ্ধে কথা বলা।

....

ব্যাখ্যা: ভ্রান্তনীতি অর্থাৎ ভ্রষ্ট আলেমের মূলনীতি হলো জ্ঞান ছাড়াই আল্লাহ বিরোধী কথা বলা। আর ইলম-জ্ঞান ছাড়া আল্লাহর বিরূদ্ধে কথা বলা শিরকের চেয়েও মারাত্মক। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন,

---

৭০. ছহীহ: তিরমিযী ২৪১৯, ছহীহ জামে ৬০৯৭।

{قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [الأعراف: 33]

বল, আমার রব তো হারাম করেছেন অশ্লীল কাজ-যা প্রকাশ পায় এবং যা গোপন থাকে, আর পাপ ও অন্যায়ভাবে সীমালঙ্ঘন এবং আল্লাহর সাথে তোমাদের শরীক করা, যে ব্যাপারে আল্লাহ কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি এবং আল্লাহর উপরে এমন কিছু বলা যা তোমরা জান না *(সূরা আল-আরাফ ৭:৩৩)*।

সুতরাং আল্লাহ বিরোধী কথাকে শিরকের চেয়েও মারাত্মক গণ্য করা হয়েছে। তাই ইলম-জ্ঞান ছাড়া আল্লাহ বিরোধী কথা বলা কারো জন্য বৈধ নয়। যেমন এভাবে বলা যে, আল্লাহ এটা হারাম করেছেন (যদিও তা হারাম নয়) অথবা আল্লাহ এটা বৈধ করেছেন (যদিও তা বৈধ নয়), অথবা আল্লাহ তা'আলা এটা শরী'আত সম্মত করেছেন কিন্তু তা শরী'আত সম্মত নয়। এসবই জ্ঞানহীন আল্লাহ বিরোধী কথা-বার্তা। আমরা এ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি। অথবা না জেনেই ফাতওয়া দেয়া ও শিথিলতা দেখানো যা আরো বেশি মারাত্মক। এসবই হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যারোপ। আমরা এ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ}[الزمر: 32]

তার চেয়ে অধিক যালিম আর কে? যে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে এবং তার কাছে সত্য আসার পর তা অস্বীকার করে। জাহান্নামই কি কাফিরদের আবাসস্থল নয়? *(সূরা আল যুমার ৩৯:৩২)*।

সুতরাং আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধে জ্ঞানহীন কথা বলা বৈধ নয়। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে সে ব্যাপারে অহী অবতীর্ণ না হয়ে থাকলে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অহী অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত জবাব দানে তিনি বিলম্ব করতেন। তাই কিভাবে

জ্ঞান ছাড়াই কথা বলা যায়? ভ্রষ্ট আলেমরা অনেক বিষয় গোপন করে। কারো নিকট কোন বিষয়ের স্পষ্ট ব্যাখ্যা ও কুরআন-সুন্নাহর দলীল-প্রমাণ জানা না থাকলে তার বলা উচিত; আমি জানি না। এতে তার ইলম-জ্ঞান ও সম্মানের ঘাটতি হবে না। বরং এভাবে বলার কারণে আল্লাহ তা'আলার নিকট তার সম্মান বৃদ্ধি পাবে। ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহকে চল্লিশটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি মাত্র কয়েকটির জবাব দেন। অধিকাংশ মাস'আলার ব্যাপারে তিনি বলতেন, আমি জানি না। একজন প্রশ্নকারী তাকে জিজ্ঞেস করলো, আমি অনেক দূর দেশ হতে সফর করে আপনার নিকট এসেছি; অথচ আমাকে জবাব না দিয়ে আপনি বলছেন, আমি এটা জানি না। ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ তাকে বললেন, তুমি তোমার বাহনে উঠ এবং যেখান থেকে এসেছ সেখানে চলে যাও। আর পৌঁছার পর মানুষকে বলবে, আমি ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহকে এরূপ এরূপ বিষয় জিজ্ঞেস করেছিলাম তিনি বলেছিলেন, আমি এটা জানি না। আসলে আল্লাহ ভীরু বিদ্বানগণ এরূপই হন।

কিতাব রচনায় সতর্কতা হচ্ছে কিতাব রচনার যোগ্যতা না থাকলে তা রচনা করবে না। হায়! আমরা যদি অনেক ভুল কিতাব-পুস্তিকা থেকে মুক্ত থাকতে পারতাম। আর কুরআন-সুন্নাহ অনুসারে লিখিত ছহীহ গ্রন্থ ছাড়া অন্য কিতাব না থাকতো তাহলে কতই না ভাল হতো! সমস্যা হচ্ছে ভুল কিতাবাদী অবশিষ্ট থাকবে, আর পরবর্তী অনেক প্রজন্মই এর মাধ্যমে বিভ্রান্ত হবে। এ কিতাবাদী থেকেই মানুষের কাছে বিষয় জানতে চাওয়া হবে। তাই ফাতাওয়া, কিতাবে লিপিবদ্ধ কোন বিষয়, কথা, হাদীছ ও বক্তব্যে দানে মানুষ আল্লাহকে ভয় করবে। এজন্য কোন বিষয়ে ধারণা করে দৃঢ়তার সাথে বলবে না যে, এটাই সঠিক। তা কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী হতে হবে।

১১৬. বক্তব্য একটি অপরটির বিরোধী হওয়া

হক্বকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করে স্পষ্ট দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়া। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ} [ق: 5]

বরং তারা সত্যকে অস্বীকার করেছে, যখনই তাদের কাছে সত্য এসেছে। অতএব তারা সংশয়যুক্ত বিষয়ের মধ্যে রয়েছে *(সূরা ক্বাফ ৫০:৫)*।

....

ব্যাখ্যা: এখানে দ্বন্দ্ব বলতে হক্ববিহীন কথা-বার্তা নিয়ে বিবাদ ও মতানৈক্য করা। যে হক্ব পরিত্যাগ করে, সে মিথ্যা কথা নিয়ে দ্বন্দ্ব ও বিবাদে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমে পরীক্ষায় পড়ে। কেননা, বিভিন্নভাবে ভ্রষ্টতার শাখা-প্রশাখা বিস্তারলাভ করে, আর শাখার কোন পরিসীমা নেই। পক্ষান্তরে, হক্ব হচ্ছে একটিই যার ভিন্নতা নেই এবং মতানৈক্যও নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ} [يونس: 32]

অতএব, তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রকৃত রব। অতঃপর সত্যের পর ভ্রষ্টতা ছাড়া কী থাকে? অতএব কোথায় তোমাদেরকে ফেরানো হচ্ছে? *(সূরা ইউনূছ ১০:৩২)*।

যে হক্ব বর্জন করে সে ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হয়। আর ভ্রষ্টতা হলো গোলকধাঁধা; এ থেকে আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। ভ্রষ্টরা নিজেদের মাঝে বিভিন্ন মতানৈক্যে লিপ্ত থাকে। তাদের প্রত্যেকেই ভিন্ন মতের উপর বহাল থাকে। তাদের নিকট হেদায়াত নেই; যার উপর তারা পরিচালিত হবে। কেবল তারা বিপথেই পরিচালিত হয়। কখনো বলে এটা ঠিক আবার কখনো বলে ঐটাই ঠিক।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ} [ق: 5]

বরং তারা সত্যকে অস্বীকার করেছে, যখনই তাদের কাছে সত্য এসেছে। অতএব তারা সংশয়যুক্ত বিষয়ের মধ্যে রয়েছে *(সূরা ক্বাফ ৫০:৫)*।

অর্থাৎ ভ্রষ্টতায় ডুবে থাকে। তাই বাতিলপন্থীরা নিজেদের মাঝে মতানৈক্যে লিপ্ত হয়। তারা পরস্পর শত্রুতা করে, একে অপরকে ভ্রান্ত পথ দেখায় এবং পরস্পরকে কাফির বলে আখ্যা দেয়।

পক্ষান্তরে, হক্বপন্থীরা হক্ব আঁকড়ে ধরে, নিজেদের মাঝে মতানৈক্য সৃষ্টি করে না। ইজতেহাদের ব্যাপারে যদিও মতানৈক্য হয়; তবুও পরস্পরে শত্রুতা করে না এবং বিচ্ছিন্ন হয় না। হক্ব স্পষ্ট হলে তারা সেদিকেই প্রত্যাবর্তন করে এবং নিজেদের কথা বর্জন করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} [الشورى: 10]

যে বিষয়েই তোমরা মতবিরোধ কর না কেন, তার ফায়সালা আল্লাহর কাছে; তিনিই আল্লাহ, আমার রব; তাঁরই ওপর আমি তাওয়াক্কুল করি এবং তাঁরই অভিমুখী হই *(সূরা আশ-শুরা ৪২:১০)*।

{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59]

কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রসূলের দিকে প্রত্যার্পণ কর *(সূরা নিসা ৪:৫৯)*।

চার ইমাম ও ফকীহগণের মাঝে মতানৈক্য হলেও তাদের কেউ কাউকে ভ্রষ্ট ও কাফির বলে আখ্যা দেয়নি। তাদের প্রত্যেকের দলীল অনুযায়ী তারা আমল করে। আর দলীল বিরোধী কোন বিষয় প্রকাশ পেলে তারা হক্বের দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

অপরদিকে ভ্রষ্টরা প্রত্যাবর্তনের সুযোগ কাজে লাগায় না। তাদের প্রত্যেকে কু-প্রবৃত্তির দিকেই ফিরে যায়। আর কু-প্রবৃত্তি বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে।

১১৭. আল্লাহর নাযিলকৃত আংশিক বিধানের প্রতি ঈমান আনা

....

ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া কতিপয় বিধান ছাড়াই আংশিক বিধানের প্রতি ঈমান আনা ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের রীতি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرائيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلاً مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ} [البقرة: 83، 84، 85]

আর যখন আমি বনী ইসরাঈলের অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতিত কারো ইবাদত করবে না এবং সদাচার করবে পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও মিসকীনদের সাথে। আর মানুষকে উত্তম কথা বল, ছলাত কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর। অতঃপর তোমাদের মধ্য থেকে স্বল্প সংখ্যক ব্যতীত তোমরা ফিরে গেলে। আর তোমরা (স্বীকার করে অতঃপর তা থেকে) বিমুখ হও। আর যখন আমি তোমাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম যে, তোমরা নিজদের রক্ত প্রবাহিত করবে না এবং নিজদেরকে তোমাদের গৃহসমূহ থেকে বের করবে না। অতঃপর তোমরা স্বীকার করে নিলে। আর তোমরা তার সাক্ষী। অতঃপর এই তোমরাই তো নিজদেরকে হত্যা করছ আর তোমাদের মধ্য থেকে একটি দলকে তাদের গৃহ থেকে বের করে দিচ্ছ। পাপ ও সীমালজ্ঘনের মাধ্যমে তাদের বিরূদ্ধে সহায়তা করছ। তারা যদি বন্দী হয়ে তোমাদের নিকট আসে, তোমরা মুক্তিপণ দিয়ে তাদেরকে মুক্ত কর। অথচ তাদেরকে বের করা তোমাদের

জন্য হারাম ছিল। তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখ আর কিছু অংশ অস্বীকার কর? *(সূরা আল-বাক্বারাহ ২:৮৩-৮৫)*।

কিতাবের কতিপয় বিধানের প্রতি ঈমান আনা বলতে সহজ বিধানকে গ্রহণ করা এবং আংশিক বিধান অস্বীকার করা। অর্থাৎ মানুষ হত্যা করা এবং তাদেরকে বাড়ি-ঘর থেকে বের করে দেয়াকে বৈধ মনে করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ} [البقرة: 85، 86]

সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা তা করে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ব্যতীত তাদের কী প্রতিদান হতে পারে? আর কিয়ামত দিবসে তাদেরকে কঠিনতম আযাবে নিক্ষেপ করা হবে। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে গাফিল নন। তারা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবনকে খরিদ করেছে। সুতরাং তাদের থেকে আযাবকে হালকা করা হবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না *(সূরা আল-বাক্বারাহ ২:৮৫-৮৬)*।

যারা আংশিক বিধানের প্রতি ঈমান আনে এবং আংশিক অস্বীকার করে; এটা হলো তাদের প্রতিফল। কেননা, কিতাবের পূর্ণবিধানের প্রতি ঈমান আনা ওয়াজীব। কু-প্রবৃত্তির অনুসরণে যা অনুকূল হয় তা গ্রহণ এবং কু-প্রবৃত্তি ও ইচ্ছা বিরোধী হলে তা বর্জন করা ইয়াহুদী-খ্রিষ্টান এবং যারা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কু-প্রবৃত্তি অনুযায়ী কিতাবের আংশিক গ্রহণ ও আংশিক বর্জন করে, এটা তাদেরই বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন,

{أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ} [البقرة: 87]

তবে কি তোমাদের নিকট যখনই কোন রসূল এমন কিছু নিয়ে এল, যা তোমাদের মনঃপূত নয়, তখন তোমরা অহঙ্কার করেছ, অতঃপর

(নাবীদের) একদলকে মিথ্যাবাদী বলেছে আর একদলকে হত্যা করেছে *(সূরা আল-বাক্বারাহ ২:৮৭)*।

অর্থাৎ রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের নিকট যে বিধান নিয়ে এসেছেন তা তাদের কু-প্রবৃত্তি অনুসারে হলে তারা সেটা গ্রহণ করে এবং কু-প্রবৃত্তি বিরোধী হলে বর্জন করে।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তাদের নিকট তা সহজ মনে না হলে রসূলের বিরূদ্ধে তারা অবস্থান নিত। হয়তো তাকে তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতো, আর না হয় তাকে হত্যা করতে উদ্যত হতো। আমরা এ থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এখানে মুসলিমদের জন্য উপদেশ রয়েছে, যাতে তারা ঐসব জাহিলদের মত কর্ম-কান্ডে লিপ্ত না হয়। এমনটা করলে মুসলিমরা তাদের মতই বিপদগ্রস্ত হবে।

১১৮. কতিপয় রসূলের প্রতি ঈমান আনা এবং কতিপয়ের প্রতি ঈমান না আনা

রসূলগণের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করা।

....

ব্যাখ্যাঃ কতেক রসূলকে অস্বীকার করা এবং কতিপয়ের প্রতি ঈমান আনা আহলে কিতাবদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

মূর্তিপূজক ও মুশরিকরা রসূলগণের প্রতি আদৌ ঈমান আনে না। বরং সকল রসূলকে অস্বীকার করে।

অন্যদিকে ইয়াহুদীরা ঈসা আলাইহিস সালাম ও মুহাম্মাদকে ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অস্বীকার করে। আর খ্রিষ্টানরা মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অস্বীকার করে। আর যে একজন নাবীকে

অস্বীকার করে সে মূলতঃ সকল নাবী-রসূলকেই অস্বীকার করে। কেননা, নাবী-রসূলগণের পন্থা একই এবং দীন একটিই। তারা পরস্পর ভাই ভাই। তাই একজনকে অস্বীকার করার কারণে সকলকেই অস্বীকার করা হয়। যারা রসূলকে অস্বীকার করে আর কতিপয়ের প্রতি ঈমান আনে তাদের ক্ষেত্রে দলীল-প্রমাণ একই তথা সকলকেই তারা অস্বীকার করে। সুতরাং তাদের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ} [البقرة: 136] ، {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ} [البقرة: 285]

তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা নাযিল করা হয়েছে আমাদের উপর ও যা নাযিল করা হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাদের সন্তানদের উপর এবং যা প্রদান করা হয়েছে মূসা ও ঈসাকে এবং যা প্রদান করা হয়েছে তাদের রবের পক্ষ হতে নাবীগণকে। আমরা তাদের কারো মধ্যে তারতম্য করি না। আর আমরা তাঁরই অনুগত। রসূল তার নিকট তার রবের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছে, আর মুমিনগণও। প্রত্যেকে ঈমান এনেছে আল্লাহর উপর, তার ফেরেশতাকুল, কিতাবসমূহ ও তার রসূলগণের উপর, আমরা তার রসূলগণের কারও মধ্যে তারতম্য করি না *(সূরা আল-বাক্বারাহ ২:১৩৬,২৮৫)*।

অর্থাৎ আমরা কোন রসূলের মাঝে পার্থক্য করি না। ঈমানের ছয়টি রুকনের একটি হলো সকল রসূলের প্রতি ঈমান আনা, যা হাদীছে জিবরাঈলে বর্ণিত হয়েছে। রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে যখন জিবরাঈল আলাইহিস সালাম জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে ঈমান সম্পর্কে সংবাদ দিন। তখন তিনি জবাবে বলেন,

أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره

আল্লাহ, তার ফেরেস্তামন্ডলী, আসমানী কিতাবসমূহ, তার সকল রসূল, আখেরাত এবং ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস রাখাই হলো ঈমান।[৭১]

এসব বিষয়ের আংশিকের প্রতি ঈমান আনা যথেষ্ট নয়। বরং সবগুলোর প্রতিই ঈমান আনতে হবে। এসবের কোন একটি অস্বীকার করলে সবগুলোই অস্বীকার করা হবে। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ} [الشعراء: 105]

নূহ-এর সম্প্রদায় রসূলগণকে অস্বীকার করেছিল *(সূরা আশ-শু'আরা ২৬:১০৫)*।

، {كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ} [الشعراء: 123]

'আদ জাতি রসূলগণকে অস্বীকার করেছিল *(সূরা আশ-শু'আরা ২৬:১২৩)*।

{كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ} [الشعراء: 141]

সামূদ জাতি রসুলগণকে অস্বীকার করেছিল *(সূরা আশ-শু'আরা ২৬:১৪১)*।

নূহ আলাইহিস সালাম এর জাতি ও আদ সম্প্রদায় তাদের নাবীকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করতো। তাদের নিজ নিজ নাবীকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করার কারণে মূলতঃ তারা সকল নাবী-রসূলকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করতো।

---

৭১. ছ্বহীহ বুখারী ৫০, ছ্বহীহ মুসলিম ১০।

১১৯. অজানা বিষয় নিয়ে বিতর্ক করা

যে বিষয়ে জ্ঞান নেই তা নিয়ে বিবাদ সৃষ্টি করা।

....

ব্যাখ্যা: জাহিলরা যে বিষয়ে জ্ঞান রাখে না তা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক ও মতভেদ সৃষ্টি করে। জ্ঞান ছাড়া তর্ক না করাই আবশ্যক। কোন বিষয় জানা না থাকলে নিরব থাকবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ} [يونس: 39]

বরং, তারা যে ব্যাপারে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেনি, তা তারা মিথ্যা অস্বীকার করেছে এবং এখনও এর পরিণতি তাদের কাছে আসেনি *(সূরা ইউনূস ১০:৩৯)*।

অর্থাৎ কোন বিষয়ের বাস্তব ব্যাখ্যা মূলকঃ জ্ঞান না থাকা। এ বিষয়টি দু’টি দিককে অন্তর্ভুক্ত করে:

প্রথম: মানুষ যে বিষয় জানে না সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না। আর অজ্ঞাত বিষয় অস্বীকারও করবে না। বরং বলবে, আল্লাহই অধিক অবগত। একারণে আল্লাহ তা‘আলা তার নাবী মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলেন,

{وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً} [طه: 114]

সুতরাং আল্লাহ মহান যিনি সত্যিকার অধিপতি; তোমার প্রতি ওহী সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তুমি কুরআন পাঠে তাড়াহুড়া করো না এবং তুমি বল, ‘হে আমার রব! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন’ *(সূরা ত্বা-হা ২০:১১৪)*।

কোন মানুষ নিজেকে পূর্ণজ্ঞানী দাবি করতে পারে না। মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। মানুষ যদিও অনেক জ্ঞানের অধিকারী তবুও সে কেবল সামর্থ অনুযায়ী জানতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ জ্ঞানই তার অজানা। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ} [يوسف: 76]

প্রত্যেক জ্ঞানীর উপর রয়েছে একজন মহাজ্ঞানী *(সূরা ইউসূফ ১২:৭৬)*।

আল্লাহ তা'আলাই চুড়ান্ত জ্ঞানের অধিকারী।

দ্বিতীয়: কারো জানা বিষয় মানুষ অস্বীকার করবে না। কারো নিকট থেকে নিজের অজ্ঞাত কোন বিষয় জানতে পারলে তা গ্রহণ করা মানুষের জন্য আবশ্যক। কোন মানুষকেই পূর্ণজ্ঞান দান করা হয়নি। একারণে আলেমগণ সদা সর্বদা একটি কথা পূনরাবৃত্তি করে বলেন,

من حفظ حجة على من لم يحفظ

যারা দলীল সংরক্ষণ করেনি, তাদের উপর প্রাধান্য পাবে তাদের কথা, যারা সংরক্ষণ করে ।

নাস্তিক, মুশরিক, আল্লাহর গুণাবলীকে বাতিল সাব্যস্তকারী এবং ভ্রষ্ট সম্প্রদায় তাদের অজানা বিষয়কে অস্বীকার করে। কেননা, অজানা বিষয়ে তারা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করেনি; এ জন্য তারা অদৃশ্যের প্রতি ঈমান আনে না। তাই বাতিল ক্বিয়াস তথা পরিত্যাজ্য অনুমান ভিত্তিক রীতির উপর তারা তাদের চলার পথ নির্ধারণ করেছে। ফলে তারা সঠিক পথ হারিয়েছে।

১২০. অন্যদের অনুসরণে বৈপরীত্য সৃষ্টি করা

স্পষ্ট সালাফদের (পূর্ববর্তী নেকলোক) বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও নিজেদেরকে তাদের অনুসারী দাবি করা।

....

ব্যাখ্যা: সব ইয়াহুদী-খ্রিষ্টান ও ইসলামের দিকে সম্পৃক্তকারী ভ্রষ্টদের প্রত্যেকেই দাবি করে যে, তারা পূর্ববর্তী মু'মিনদের অনুসারী। ইয়াহুদীরা দাবি করে, তারা মূসা আলাইহিস সালাম ও তার দলবলের অনুসরণ করে। আর খ্রিষ্টানদের দাবি, তারা ঈসা আলাইহিস সালাম ও তার অনুসারীদের অনুসরণ করে। আর মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভ্রষ্ট উম্মত দাবি করে, তারা পূর্ববর্তী ছাহাবী, তাবেয়ী ও তাদের অনুসারীদের অনুসরণ করে। অথচ সালাফদের রীতির উপর তারা প্রতিষ্ঠিত নয়।

যারা নিজেদেরকে সালাফী দাবি করে, তাদের এ দাবি তখনই সঠিক হবে যখন তাদের নিকট সালফে-সালেহীনদের রীতি বহাল থাকবে। যদি তাদের রীতি অনুযায়ী আমল হয়, তাহলেই তা হবে সালাফী পন্থা। অন্যাথায়, তা হবে সালাফী রীতি বিরোধী। যদিও তাদের অনুসারীরা সালাফী দাবি করে থাকে।

আজকাল প্রত্যেক ভ্রষ্ট দলই দাবি করে, তারা সালাফী মূলনীতির উপর বহাল আছে। কিন্তু তারা সালাফী পন্থার উপর বহাল নেই। কেননা, সালাফীরীতি হচ্ছে,

من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي

আমি ও আমার ছাহাবীগণের রীতির উপর যারা অটল থাকে।[৭২]

এ রীতি সংরক্ষণে রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা অনুযায়ী তারা আমল করে না। এ হাদীছের কথা অনুয়ায়ী আমল হলেই তা হবে সালাফী রীতি। আর এ কথার বিরোধী আমল হলে তা সালাফী পন্থা বলে গণ্য হবে না। যদিও বিরোধী বিষয়কে সালাফী রীতি দাবি করা হয়। দাবি উত্থাপনের মাঝে কোন শিক্ষা নেই। বাস্তবতার মাঝেই শিক্ষা আছে। অনেকেই নিজেদেরকে সালাফী দাবি করে। কিন্তু সালফে-সালেহীনদের রীতির উপর বহাল থাকা তাদের জন্য আবশ্যক। আমল যদি সালাফী রীতির অনুকূলে হয় তবেই তা হক্ব বলে গণ্য হবে। সালফে-সালেহীনদের রীতি বিরোধী হলে তা হক্ব নয়। অনুরূপভাবে যারা নিজেদেরকে চার

৭২. ীযমরিতি, হা/ ২৬৪১।

মাযহাবের সাথে সম্পৃক্ত করে চার ঈমামের আক্বীদার বিরোধিতায় লিপ্ত হয়। তাদের এ সম্পৃক্ত হওয়া সঠিক নয়। কেননা, তারা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আক্বীদার বিপরীত আমল করে।

১২১. আল্লাহর রাস্তায় বাধা দান

যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, তাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় চলতে বাধা দান করা।

....

ব্যাখ্যা: আল্লাহর রাস্তায় বাধাদান বলতে আল্লাহর দীনে প্রবেশ করা হতে মানুষকে ফিরিয়ে রাখা। পূর্ববর্তী ও বর্তমান যুগের কাফিরদের রীতি এটাই। হোক তারা ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান এবং মুশরিক। সর্বযুগে ও সর্বস্থানে জাহিলী রীতি হলো আল্লাহর রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা। ভ্রষ্ট দলগুলো বর্তমানে এ রীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

মুসলিমদেরকে ভ্রান্ত পথে পরিচালনায় তারা সদালিপ্ত। তারা বাতিল রীতির দিকে মুসলিমদেরকে ধাবিত করছে। অনুরূপভাবে মুসলিমদেরকে ইসলাম হতে বিরত রাখতে খ্রিষ্টানরাও সর্বদা অপচেষ্টায় লিপ্ত থেকে বলে, আসো, আমরা পরস্পরে নিজেদের মাঝে আলোচনা করি। তারা ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা বলে, এটাই হলো আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় বাধাদানের স্বরূপ।

আমরা কি আমাদের দীনের বিশুদ্ধতা নিয়ে সন্দেহ করি যে, তাদের বাতিল দীনের আলোচনায় বসতে হবে? আমরা আমাদের দীনের ব্যাপারে সন্দেহবাদী নই। তারা যে দীনের উপর বহাল আছে, তা বাতিল-মিথ্যা। তারা মূলতঃ সকল দীনের আলোচনা করা ও পরস্পরের দীনকে সহযোগিতার জন্য আহবান জানায়। এর মাধ্যমে তারা আল্লাহর রাস্তায়

প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এটাই তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে। বর্তমানে কাফেরেরা মুসলিদেরকে ভ্রান্ত পথে পরিচালনায় সদা তৎপর। দীন ইসলাম হতে বিমুখ করতে তারা মুসলিমদেরকে হত্যা করছে, বিতাড়িত করছে এবং তাদেরকে শাস্তি দিচ্ছে। আবার তারাই বলে, আসো আমরা পরস্পর দীনের আলোচনা করি।

মূলতঃ তারা তাদের ধর্ম ও বিশ্বাসকে উদ্দেশ্যে করেই ধর্মীয় স্বাধীনতা ও বিশ্বাসের কথা বলে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ} [الممتحنة: 2]

তারা কামনা করে যদি তোমরা কুফরি করতে! *(সূরা মুমতাহিনা ৬০:২)*।

{وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا} [البقرة: 217]

আর তারা তোমাদের সাথে লড়াই করতে থাকবে, যতক্ষণ না তোমাদেরকে তোমাদের দীন থেকে ফিরিয়ে দেয়, তারা যদি পারে *(সূরা আল-বাক্বারাহ ২:২১৭)*।

{وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً} [النساء: 89]

তারা কামনা করে, যদি তোমরা কুফরী করতে যেভাবে তারা কুফরী করেছে। অতঃপর তোমরা সমান হয়ে যেতে *(সূরা আন নিসা ৪:৮৯)*।

তারা বাতিলের সাথে হক্বের মিশ্রণ ঘটাতে এবং বাতিল দীনের সাথে হক্ব দীনের সমতা বিধান করতে চায়। কিন্তু তারা হক্ব দীনকে সাব্যস্ত করে না। বরং তারা ইসলামকে অপসারণ করতে চায়। ফলে দীন বিমুখ করতে তারা মুসলিমদের হত্যা করছে, তাদেরকে বাড়ি-ঘর হতে বিতাড়িত করছে। তারা চায়, পৃথিবীতে কোন মুসলিম যেন অবশিষ্ট না থাকে। এটাই তাদের প্রত্যাশা ও ইচ্ছা।

১২২. কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করা

কুফরী কর্ম ও কাফিরদেরকে ভালবাসা।

....

ব্যাখ্যা: জাহিলী সমস্যা হচ্ছে জাহিলরা কুফরী কর্ম ও কাফিরদেরকে ভালবাসে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বনী ইসরাঈল সম্পর্কে উল্লেখ করেন যে, তারা কাফিরদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{تَرَى كَثِيراً مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا} [المائدة: 80]

তাদের মধ্যে অনেককে তুমি দেখতে পাবে, যারা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করে *(সূরা আল-মায়েদা ৫:৮০)*।

কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা আল্লাহ তা‘আলা হারাম করেছেন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة: 51]

হে মুমিনগণ, ইয়াহূদী ও নাসারাদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে নিশ্চয় তাদেরই একজন। নিশ্চয় আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে হিদায়াত দেন না। *(সূরা আল মায়িদা ৫:৫১)*

আল্লাহ তা‘আলা ইয়াহুদীদের মত কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা স্থাপন করতে মুসলিমদেরকে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً} [آل عمران: 28]

মুমিনরা যেন মুমিনদের ব্যতীত কাফিরদেরকে বন্ধু না বানায়। আর যে কেউ এরূপ করবে, আল্লাহর সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। তবে যদি তাদের পক্ষ থেকে তোমাদের কোন ভয়ের আশঙ্কা থাকে *(সূরা আলে-ইমরান ৩:২৮)*।

এ ব্যাপারে স্পষ্ট নির্দেশ হলো কাফিরদের সাথে শত্রুতা করা, তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা, তাদের দীন থেকে মুক্ত থাকা ওয়াজীব-আবশ্যক। ইসলামে আবশ্যকীয় বিষয়ের সর্বোত্তম হচ্ছে বন্ধুত্ব ও শত্রুতা করা।[৭৩]

১২৩-১২৮: কুসংস্কারের উপর নির্ভর করা

১২৩. পাখি উড়ানো (العِيَافَة), ১২৪. দাগ দেয়া (الطَّرْقُ), ১২৫. কুলক্ষণ নির্ধারণ করা (الطِّيَرَة), ১২৬. ভাগ্য গণনা করা (الكَهَانَة), ১২৭. ত্বগূতের নিকট বিচার প্রার্থী হওয়া (التَّحَاكُمُ إلى الطَّاغُوتِ) এবং ১২৮. ঈদের দিন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া অপছন্দ করা (كَرَاهَة التَّزْوِيجِ بين العيدين)।

....

ব্যাখ্যা: পাখি উড়ানো (العِيَافَة): পাখি উড়িয়ে ভাগ্য নির্ণয় করা, অনুরূপভাবে কুলক্ষণ নির্ধারণ করা, কেননা, জাহিলরা পাখির মাধ্যমে অশুভ লক্ষণ নির্ধারণ করতো, তাদের অপছন্দনীয় আকৃতির কোন পাখি উড়ে যেতে দেখলে তারা যে স্থানে সফর করার ইচ্ছা করতো, সেখানে তারা সফর করতো না। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কেবল তার উপরই ভরসা করার আদেশ করেন। সফরে মানুষের জন্য কল্যাণ নিহিত আছে। মানুষ কোন বিষয়ে বিপদের সম্মুখীন হলে অথবা সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে

৭৩. মাকতাবাতুস সুন্নাহ প্রকাশিত, অলা (ভালবাসা) ও বারা (শত্রুতা পোষণ করা) বইটি দেখুন।

সে ছ্বলাতুল ইসতেখারাহ (صلاة الاستخارة) আদায় করে ছালাতের পর আল্লাহর নিকট দু'আ করবে, যাতে তিনি সঠিক সমাধানের পথ দেখিয়ে দেন। অনুরূপভাবে অভিজ্ঞ ও জ্ঞানীদের নিকট সমস্যার সমাধান সম্পর্কে জানবে।

(الطرق): অর্থ দাগ দেয়া, মাটিতে দাগ দেয়া। ভেলকিবাজরা বালুতে দাগ কাটে এবং বলে, অবশ্যই অমুক বিষয়ের ফলাফল অর্জিত হবে এবং তা অচিরেই ঘটবে। এটিই জাহিলী কর্ম। কেননা, এখানে অদৃশ্য বিষয়ে অবগত হওয়ার ব্যাপারে দাবি করা হয়, যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। এটা আন্দাজ ও অনুমান নির্ভর বিষয়। সংঘটিতব্য বিষয়ে তারা যা বলে, তা ফিতনা ও ধোঁকার অন্তর্ভুক্ত। তাই এসব থেকে বিরত ও দূরে থাকা ওয়াজীব।

ত্বগূতের নিকট বিচার প্রার্থনা করা

ত্বগূত হচ্ছে কুরআন-সুন্নাহ বাদ দিয়ে বিচার ফায়ছালা করা। যেমন- রচিত বিধান, মুনাফা বিধান, বেদুঈন ও পূর্ববর্তী জাতির মুনাফা নীতি অথবা কালাম শাস্ত্র ও যুক্তিবিদ্যা। জাহিলী যুগে লোকেরা ত্বগূতের নিকট বিচার ফায়ছালা কামনা করতো। এখানে (الطاغوت) আত-ত্বগূত শব্দটি (الطغيان) আত-তুগইয়ান ক্রিয়া মূল হতে উদ্ভুত। এর অর্থ হলো সীমালঙ্ঘন করা। যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান বাদ দিয়ে বিচার ফায়ছালা করে এখানে ত্বগূত দ্বারা তারাই উদ্দেশ্যে। সুতরাং কুরআন-সুন্নাহর মাধ্যমে বিচার ফায়ছালা করা মুসলিমদের উপর ওয়াজীব। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [النساء: 59]

কোন বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ কর তাহলে তা আল্লাহ ও রসূলের দিকে প্রত্যার্পণ কর যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ *(সূরা আন নিসা ৪:৫৯)*।

ঈদের দিন বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াকে অপছন্দ করা

ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিনকে নিষিদ্ধ ও অশুভ দিন মনে করা। যা জাহিলদের ধারণায়, এক প্রকার অশুভ লক্ষণ। অথচ আল্লাহ তা'আলা হাজ্জ ও উমরার ইহরাম এর অবস্থা ছাড়া সর্বদাই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া শরী'আত সম্মত করেছেন। বিবাহের সফলতা ও ব্যর্থতায় দিন-ক্ষণের কোন প্রভাব নেই। আল্লাহ তা'আলার হাতেই সবকিছুর চাবিকাঠি। আল্লাহই অধিক অবগত।

দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার পরিবারবর্গ এবং তার সকল ছাহাবীর উপর।

মাকতাবাতুস সুন্নাহ প্রকাশিত বইসমূহ

১. কালিমাতুত তাওহীদ ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ শর্ত ও তা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ
- শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায

২. আল্লাহ ও রসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন
-সংকলনে ডা. মো. মোশাররফ হোসেন

৩. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আতের আক্বীদার সংক্ষিপ্ত মূলনীতি
- ড. নাছের ইবনে আব্দুল করীম আল-আক্বল

৪. ইসলামী আক্বীদা বিষয়ক কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাস‘আলা
- শাইখ মুহাম্মাদ জামীল যাইনু

৫. আত তাওহীদ লিন্নাশিয়াহ ওয়াল মুবতাদিঈন (প্রাথমিক তাওহীদ শিক্ষা)
- ড. আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী আল আব্দুল লতীফ

৬. আক্বীদাতুত তাওহীদ (তাওহীদি বিশ্বাস ও তার পরিপন্থী বিষয়)
-ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান

৭. ছ্বহীহ আক্বীদার দিশারী - ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান

৮. শারহুল আক্বীদা আল ওয়াসিত্বীয়া -ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান

৯. আল আক্বীদা আত-ত্বহাবীয়া- ইমাম আবূ জা‘ফর আহমাদ আত-ত্বহাবী

১০. শারহুল আক্বীদা আত-ত্বহাবীয়া প্রথম খণ্ড
-ইমাম ইবনে আবীল ইয্ আল-হানাফী

১১. শারহুল আক্বীদা আত-ত্বহাবীয়া দ্বিতীয় খণ্ড
-ইমাম ইবনে আবীল ইয্ আল-হানাফী

১২. নাবী-রসূলগণের দা‘ওয়াতী মূলনীতি
- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী

১৩. মহা উপদেশ-শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া

১৪. কাবীরা গুনাহ -মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী

১৫. কাবীরা গুনাহ (সংক্ষিপ্ত) -মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী

১৬. শারহু মাসাইলিল জাহিলিয়্যাহ - ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান

১৭. আস-সিয়াসাহ আশ-শারঈয়্যাহ (শারঈ রাজনীতি)

- সংকলনে সাজ্জাদ সালাদীন

১৮. দল, সংগঠন, ইমারত ও বাই'আত সম্পর্কে বিশিষ্ট উলামায়ে কিরামের বক্তব্য - সংকলনে আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

১৯. খিলাফাত ও বাই'আত- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী

২০. যাকাত ও দান-খয়রাত- সংকলনে ডা. মো. মোশাররফ হোসেন

২১. কুরআন ও হাদীছের আলোকে - হাজ্জ, উমরা ও মদীনা যিয়ারত - শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন

২২. নতুন চাঁদের বিতর্ক সমাধান -সংকলনে ডা. মো. মোশাররফ হোসেন

২৩. সিয়াম ও রমাদ্বান- সংকলনে ডা. মো. মোশাররফ হোসেন

২৪. যাকাতুল ফিতর -শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলেহ আল উছাইমীন

২৫. ঈদ, কুরবানী ও আক্বীকা- সংকলনে ডা. মো. মোশাররফ হোসেন

২৬. রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীছের মূলনীতি জানার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম - মাওলানা মুহাম্মদ আমীন আছারী

২৭. কিতাবুল ইলম (জ্ঞানার্জন) - শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন

২৮. 'অলা' (ভালোবাসা) এবং 'বারা' (শত্রুতা পোষণ করা) - ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান